বন্দর কাশিমবাজার

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বঙ্গীয় সাহিত্যসংসদ প্রকাশনী

BANDAR COSSIMBAZAR (The Port of Cossimbazar)

A Historical essay by **Somendra Chandra Nandy**

প্রকাশক ঃ

অমরমাধব গুপ্ত

বঙ্গীয় নাট্যসংসদ প্রকাশনী

৩০২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ ১৩৮৫ / এপ্রিল ১৯৭৮

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রক ঃ

অশোক কুমার ঘোষ

জি, জি, প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২৩১/৪এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

কথা ও কাহিনী

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

শ্রীসোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দীর

পূর্ণাঙ্গ নাটক : ছায়াবিহীন
সমান্তরাল
ছারপোকা
পতঙ্গ
বিচিত্র রাগিনী
পিপাসা ছাড়িয়ে
জনক
গণ্ডার

একাঙ্ক সংকলন : সকাল সন্ধ্যার নাটক
চাঁদের হাট
সপ্তডিঙ্গা
একাঙ্ক পঞ্চদশী

পূর্ণাঙ্গ নাটক সংকলন : উদাস আত্মনেপদী ছারপোকা
বসন্ত সোহিনী পেণ্টুভটাস অলিঙ্গসুন্দর
সামুদ্রিক চতুষ্পদী

ইতিহাস : বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা

বন্দর কাশিমবাজার প্রবন্ধটি প্রথমবার লেখা হয় ১৯৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৭৪ বছরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর থেকে প্রকাশিত ইন্স্টিয়ুটের জার্ণালে এই প্রবন্ধ পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত আকারে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। তারপর অনেক জল গঙ্গানদীর প্রবাহে সমুদ্রে নেমেছে। গবেষণায় কেটেছে দীর্ঘদিন। ১২০০ পাতার কান্তবাবুর জীবন ও সময় নিয়ে লেখা বই সমাপ্ত হয়েছে। তখন বন্দর কাশিমবাজারকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার তাগিদ এল। ইতিহাসের আলোচনায় এই সুযোগ তাই আবার নেওয়া হল। বইএর আকারে 'বন্দর'কে প্রকাশ করার প্রয়োজন হল। তারই ফলশ্রুতি বর্তমান রচনা। এটি সমাপনের তারিখ ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৮৪ বা ৩১শে জুলাই, ১৯৭৭।

বাংলার ইতিহাস বিশেষ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের গবেষণার পথিকৃৎ আমার পরলোকগত শিক্ষক অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ। প্রথম প্রবন্ধ লিখে তাঁর কাছে যে উৎসাহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি তাই আমাকে বর্তমান রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নিশীথরঞ্জন রায় ক্রমাগত তাগিদে আমাকে বিব্রত করেছেন। বর্তমান রচনায় তাঁর উদ্দীপনা আমার কর্মব্যস্ততায় সঙ্গী হয়েছে। পরলোকগত আচার্যকে আমার প্রণাম জানিয়ে এবং নিশীথবাবুকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে দু-একটি কথা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে নিবেদন করি।

যদিও অষ্টাদশ শতাব্দী মাত্র দুইশত বছর ওপারের কথা কিন্তু এই সময়-সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতা প্রচণ্ড। যেখানে রাজনৈতিক ঘটনাই নানা গল্পকণিকায় আচ্ছন্ন সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পাওয়া সহজ নয়। বিশেষ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, ইংরেজী রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থাকে নিজস্ব করে নিয়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে চিরকালই বুঝি এইরকম ছিল। তা যে ছিলনা বিশ্বাস করা সহজ হয় না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়না যে প্রাক-ইংরেজ শাসনের বাংলায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী। মোগল বা মুঘল শাসনব্যবস্থার জনজীবনের সঙ্গে যে পরবর্তী যুগের কোন মিলই নাই এটা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়।

জনৈক অসাবধানী শিক্ষক বলে বসলেন, 'ইংরেজ আমলের সুরুতে

বাঙালীর দোলদুর্গোৎসব হতনা সুতরাং ইংরেজরা অতি দুষ্ট লোক ছিল।' প্রশ্ন করা হল যে সম্রাট সাহজাহান ও বাদশাহ ঔরঙ্গজীব হিন্দুদের উৎসবাদি বন্ধ করে দেবার পর কবে থেকে দোলদুর্গোৎসব আবার সুরু হয়েছিল? উত্তর নাই। আর একজন বলে উঠলেন 'আমরা সিকিউলার রাজ্য সুতরাং এই রকম প্রশ্ন করাই উচিত নয়।' বলা বাহুল্য এঁরা ইতিহাসের গবেষণাকে জুজুবুড়ীর ভয় দেখিয়ে প্রচলিত গালগল্প চালু রেখে নিজেদের অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখতে চান। এঁদের জানা নাই যে মোগল রাজত্ব ইসলামী আইনে চালিত হয়েছে। সেখানে প্রত্যক্ষ করের ভার অবিশ্বাসী-দের ওপর চাপান হয়েছে। এখানে অবিশ্বাসী মানে যাঁরা ইসলামে বিশ্বাসী নন তাঁরা সকলেই। এই আইনের ফলে হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠান পালা পার্বণের ব্যক্তিগত গণ্ডীর বাইরে যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মন্দির বা টোল সারাবার জন্য যেমন এক চতুর্থাংশ সরকারী তহবিলে জমা দিতে হত তেমনি তীর্থযাত্রায় যাবার কর ছিল। মেবারের মহারাণা রাজসিংহের জন্য আমরা জানি যে একটি করের নাম ছিল জাজিয়া। মৃতদেহ দাহ করবার যেমন কর ছিল তেমনি কোন অর্থবান হিন্দুর মৃত্যু হলেও সরকারী কর চাপত। হিন্দুর বিবাহেও কর দেবার নিয়ম ছিল, দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই করের আওতায় ছিল। বর্তমান যুগের প্রায় সব রকমের করই মোগল আমলে দেখতে পাওয়া যায়। আকবর বা জাহাঙ্গীরের মতো মহানু-ভব বাদশাহ মাঝে মাঝে এই কর নেওয়া বন্ধ করেছেন, কর তুলে দেন নাই। তাই সাহজাহান ও ঔরঙ্গজীব বাদশাহদ্বয়ের সময় জোরদার মেজাজে কর আদায় করা সম্ভব হয়েছে এবং এই কর আদায়ের জবরদস্তিতে এক শ্রেণীর নাগরিকগণ উপদ্রুত হয়েছেন। ঔরঙ্গজীব ছিলেন অত্যন্ত পারিশ্রমী ও তীক্ষ্ণধী শাসক। বস্তুতঃ মোগল সাম্রাজ্যে তাঁর মত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ শাসক আর দেখা যায় না। যার ফলে শাসনব্যবস্থা অতি সুষ্ঠুভাবে চলেছে এবং বিভিন্ন কর নিয়মিত আদায় হয়েছে। সম্ভবতঃ সেইজন্য তাঁর সময় বিক্ষোভ হয়েছে প্রচণ্ড। কিন্তু মহাবীর ছত্রপতি শিবজী ও মেবারের মহারাণা ছাড়া প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ করবার সাহস আর কারু হয় নাই। তাই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল শাসকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র বিদ্রোহ করেছে যার ফলে ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রশস্ত রাজপথ তৈরী হয়ে গেছে।

বন্দর কাশিমবাজারের সৃষ্টি মোগলকালে কিন্তু তার পরিপুষ্টি এমন একটা সময় যখন মোগল শাসনব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বিপর্যস্ত এবং ইংরেজ ক্ষমতা বর্দ্ধমান। বর্তমান প্রবন্ধে এই যুগসন্ধিকে প্রত্যক্ষ করার প্রচেষ্টা হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই রাষ্ট্রবিপ্লবের রূপ বাংলার মাটিতে কিভাবে পরিণতি লাভ করল বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলার ব্যবসায়ের স্বর্ণযুগের অবসান লক্ষ্য করা হয়েছে। ক্ষমতার লালসায় কিভাবে তৎকালীন নেতাগণ দেশের অর্থনীতিকে উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাচারে মগ্ন হলেন এবং কি ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক পতনে নিপতিত হলেন দেখাবার চেষ্টা হয়েছে।

বাঙালী ব্যবসায়ী অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। উনবিংশ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের জমিদারীতে উত্তরণও অর্থনৈতিক তাগিদেই হয়েছে। মুষ্টিমেয় সার্থক ব্যবসায়ীকুল যখন ব্যবসার ক্ষেত্র বদল করলেন তখন তাঁদের সেই শূন্যস্থান পূরণ করলেন ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোক। তাঁরা গ্রামের পোদ্দার থেকে সহরের ব্যাঙ্কার সব পদগুলিই অধিকার করলেন। এই অপূর্ব অর্থনৈতিক ইতিহাস অনুধাবনের বস্তু, ঈর্ষার নয়। জমির উর্বরতা, খাদ্য-দ্রব্যের স্বল্পমূল্য, ইংরেজ কোম্পানীর কেরাণীর নির্বোরোধী চাকরী প্রভৃতি কারণই বিংশ শতাব্দীতে কিংবদন্তী সৃষ্টি করল যে বাঙালী ব্যবসা বিমুখ। সেই অসাবধানী শিক্ষকের বক্তৃতার মতোই এটাও এক গালগল্প। ইতিহাসের বিচার এই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় না।

বন্দর কাশিমবাজারের সীমিত পরিধির মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। বস্তুতঃ বন্দরের সীমানার মধ্যে সমগ্র বাংলাকে দেখাবার প্রচেষ্টা হয়েছে। বন্দরের চুম্বকে দেশের ইতিহাসকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই ইতিহাস একান্ত স্বাভাবিক। যুগে যুগে কালে কালে যদি বাংলার বন্দরের ইতিহাস অনুধাবন করা যায় তাহলে বাংলার সত্য ইতিহাস উদ্ঘাটিত হবে। প্রথমেই স্মরণ করা যাক তাম্রলিপ্তি পোতাশ্রয়ের কথা। কোন্ কবি এই নাম দিয়েছিলেন জানা যায় না। কিন্তু তমলুকের তামালেপা রূপ আজও স্পষ্ট। কত শ্রেষ্ঠী, কত সুবিখ্যাত পরিব্রাজক, কত দার্শনিক এই পোতাশ্রয় দিয়ে আসা যাওয়া করেছেন। তাঁদের বিবৃত্তিগুলি এখনও বাংলা ভাষায় প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তাম্রলিপ্তির পর বন্দর সপ্তগ্রাম তারপর বন্দর হুগলী, পর্তুগীজ পতনে যার চরিত্র বদল হল বাদশাহী

বন্দরে। তারপর এল বন্দর কাশিমবাজার এবং সেখান থেকে উত্তরণ কলকাতা পোর্টে। কলকাতা বন্দরের ইতিহাস সম্প্রতি রচিত হয়েছে। এই পাঁচটি বন্দরের কথা জানলে বাংলার ব্যবসা ও অর্থনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব। এই বন্দরগুলির মধ্য দিয়ে কয়েক শতাব্দীর ঘটনার মূলে পৌছান যাবে।

বন্দর কাশিমবাজারে আন্তর্জাতিক ব্যববসায়ীরা মিলিত হয়েছেন। ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ, দিনেমার ও আর্মেণীয় বণিকদের এখানে দেখা যায়। দেখা যায় মোগল, আরব, গুজরাটি ও রাজস্থানী, উত্তরপ্রদেশী, বিহারী ও উড়িষ্যাবাসী বণিকদের। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিনটি ইওরোপীয় জাতির কুঠী এবং তৎসংলগ্ন কবরস্থান। এখনও দেখা যায় আর্মেণীয় গীর্জা। মহাজনটুলী, গুজরাটিটুলি নাম এখনও প্রচলিত। জৈন তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে শিব ও বিষ্ণুমন্দির, নানা শক্তিসাধনার পীঠস্থান এবং সতীদাহের ঘাট আজও সেই পুরাতন দিনের স্মৃতি বহন করে। বিভিন্ন বর্ণের সম্মিলন ক্ষেত্র হিসাবে এই বন্দর অনন্য।

আচার্য নরেন্দ্রকৃষ্ণ শিক্ষা দিতেন অর্থ জীবনধারণের সব থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু। সুতরাং জাতির অর্থনৈতিক জীবনের খবর রাখলে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করা কঠিন হয় না। বন্দর কাশিমবাজারের আলোচনায় আচার্যের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। দেখা যাবে যে, রেশম, কার্পাস ও সোরা কি ভাবে এই সময়কার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। দেখা যাবে এই ব্যবসা থেকে অর্থ অপহরণ করে জাতীয় সরকারকে ক্ষমতাসম্পন্ন করতে মোগল সাম্রাজ্যের তৎকালীন নিয়ন্ত্রাগণ কি নিদারুণভাবে ব্যর্থ হলেন। যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক নেতৃত্ব ধীরে ধীরে ইংরেজ বণিকদের কুক্ষিগত হয়ে গেল। ইংরেজ প্রভুত্বের আসল রূপ সুরু হয়েছে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রনে এবং তা পলাশীর যুদ্ধের অনেক পরে। গাছে গাছে বিশ্বাসঘাতক খুঁজে পাওয়া যাত্রা থিয়েটারের নাটকেই সীমাবদ্ধ থাকা ভাল, বুদ্ধিমান লোক সেই সব কথা বিশ্বাস করতে সুরু করলেই কেচ্ছার চূড়ান্ত।

আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ যদি অষ্টাদশ শতাব্দী সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগায় তাহলে আমার প্রচেষ্টা সামান্য সার্থকতা পেয়েছে বলে মনে করব। আনন্দের কথা এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ব্যবসা নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক

গবেষণা শুরু হয়েছে। আমার বন্ধু ডঃ পি, জে, মার্শালের ইষ্টইণ্ডিয়ান ফরচুন্স বইটিতে এই সময়কার অপূর্ব চিত্র পাওয়া যায়। বাংলার জাহাজ তৈরী শিল্প সম্পর্কেও বহু সংবাদ এই বইয়ে আছে। বোঝা যায় যে, রাজা কৃষ্ণনাথের সৈদাবাদে জাহাজ তৈরীর কারখানা খোলার প্রচেষ্টা কোন খামখেয়াল নয় বরঞ্চ সমকালীন যুগের প্রচলিত মনোভাবেরই প্রকাশ।

এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর নানা ঘটনা সম্পর্কে যত বেশী জানা যাবে ততই দেখা যাবে যে, ঘটনা ও মানুষ সম্পর্কে আমরা কত ভুল ধারণা পোষণ করি। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এই সময়কার বাংলা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অত্যন্ত ক্ষীণ। একটি ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহকে নাট্যকারগণ একজন বোকা ইংরেজসেবী সাজিয়েছেন। তাঁর আসল পরিচয় খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তিনি ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বীরভূমের আমিন ছিলেন। ওই বছরের অক্টোবর মাসে রায়রায়ানের নায়েব নিযুক্ত হন। এক মাসের মধ্যেই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও ঢাকার রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান নিযুক্ত হন। এক বছরের মধ্যে তাঁর কর্মক্ষমতায় কোম্পানী এত অভিভূত হলেন যে তাঁকে খালসা (রাজস্ব) বিভাগের কর্মকর্তার নায়েব-দেওয়ান করা হল। মাহিনা হল মাসিক এক হাজার টাকা। কোম্পানীর আমলে প্রথম বাঙালী সিভিল সার্ভেন্টের সম্মান নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাপ্য। পরে তিনি খালসার দেওয়ান হলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় চক্রান্ত করে গঙ্গাগোবিন্দকে সরাবার পর তিনি একা যে কাজ করতেন তা তুলবার জন্য ছয়জন সাহেবকে খালসা বিভাগে নিযুক্ত করতে হয়। এবার বোঝা যাবে কেন এই ভদ্রলোক অত দ্রুত কোম্পানীর কর্মে উন্নতি করেন। কর্মদক্ষতার এই উদাহরণ অতুলনীয়।

এই সময়কার বাংলার ইতিহাস নিয়ে অনেক গবেষণা বাকী আছে। সেগুলি হলে এবং জনসমক্ষে প্রচারিত হলে দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা যাবে।

এই পুস্তক প্রকাশে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

ইতি শুভ প্রথম বৈশাখ, ১৩৮৫। ১৫ এপ্রিল ১৯৭৮॥

কাশিমবাজার রাজবাটী,

৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলকাতা ৯

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সূচীপত্র

এক

বিজয়া দশমী ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ। সোনালী আলোয় আকাশ রাঙা। দুপুরের মেঘ কেটে গিয়ে যেন দিনটাকে আরো উজ্জ্বল করেছে। বৃদ্ধ শিল্পী টমাস ডানিয়েল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন এই উৎসবমুখর সন্ধ্যার আকাশের বর্ণাঢ্য তাঁকে একদিন আঁকতেই হবে। এই অপূর্ব সূর্যাস্তের ছবি যে শিল্পী আঁকবে না তার বাংলায় আসা বৃথা। বৃথা তার রূপচর্চা। বাংলার এই অপরূপ ছবি, বর্ণে গন্ধে সৌরভে দিকে দিকে ঘোষণা করছে সকল দেশের রাণী ভারতবর্ষের বাংলা সুবাই হল নন্দনকানন।

নৌকার ওপর ডানিয়েল সাহেব নড়ে চড়ে বসলেন। ছবি আঁকার কাগজ সরঞ্জাম তুলি একটু নাড়াচাড়া করলেন। সহরের মধ্যে দূরে আগিয়ে আসা ঢাকের বাদ্যি শোনা গেল। তার সঙ্গে নানা রকমের বাঁশীর আওয়াজ। বাঁশের ওপর রঙিন কাগজের পতাকা মাথায় জৌলুষের সামনের দিকটা নদীর ধারে দেখা গেল। ঢাকের আওয়াজ গলি থেকে বাইরে আসামাত্র জোর হয়ে উঠল। পেছনে দেখা গেল রূপোর কাজ করা ভেলভেটের বিরাট ছাতার তলে গণ্যমান্যজনদের। তাঁদের থেকে যাদের সম্মান একটু কম তারা তাল-পাতার বিরাট ছাতার তলে এলেন। নানা রং দিয়ে এই ছাতাগুলিকে বিচিত্র করা হয়েছে। দেখবার মতো সাজ ছত্রধরদের। তাদের বিরাট পাগড়ী আর বাহার পোষাকে তারা তাদের প্রভুদের কৌলীন্য ঘোষণা করছেন। এবার তারা নদীর ঘাটের দুই পাশে সরে দাঁড়ালেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'দুর্গা মাঈ কী জয়' হাঁক দিয়ে বাঁশের মাচায় দুর্গাপ্রতিমা বহন করে ঢুকল প্রায় ৬০ জন লোক। দুর্গা প্রতিমা দেখামাত্র একষট্টি বছরের বৃদ্ধ শিল্পী নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে উঠলেন। হাতের কাগজে পড়ল আঁচড়। প্রথম আঁচড়েই ডানিয়েল সাহেব দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রটি এঁকে ফেললেন। দ্রুত তার হাত চলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাগজের ওপর স্কেচটি ফুটে উঠল। দশপ্রহরণধারিনী দশভুজার রূপ আঁকতে দক্ষ শিল্পীর একটুকু ভুল হয় নাই। মুর্শিদাবাদের এক অখ্যাত ঘাটে নৌকার ওপর দশভুজার বিসর্জনের ছবি, ইংরেজ আমলে হিন্দুর দুর্গোৎসবের এক প্রাথমিক প্রমান হয়ে আছে।

ইংরেজ আমলে হিন্দুরা যে আবার নির্ভয়ে পূজা ও উৎসব করতে শুরু করলেন ডানিয়েল সাহেবের এই ছবিই তা সতঃসিদ্ধ করছে।

চিরকাল কিন্তু এমন ছিল না। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে আইন হল। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বহিঃপ্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। বহুমন্দির ধ্বংস করা হল। এমনকি পুরাতন হিন্দুমন্দির মেরামত করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দুদের পার্বন ও সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হল। বাদশাহ ঔরঙ্গজীব এই আইনগুলি যাতে মানা হয় তার জন্ম চরম নির্দেশ দিলেন সুবাদারদের। বারাণসীর বিশ্বনাথের মন্দির ভেঙে মসজিদ করা হল। মসজিদে রূপান্তরিত হল বেণীমাধবের মন্দির। ভারতের বিভিন্নস্থানের মন্দিরসংলগ্ন টোল ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের গৃহে সংস্কৃত চর্চা রক্ষা পেতে লাগল। মন্দিরে মন্দিরে পূজা যখন বন্ধ হয়ে গেল, সকল শ্রেণীর হিন্দুরা তাদের ঘরে ঘরে ঈশ্বর উপাসনা করতে লাগলেন। শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপূজা ও শিবলিঙ্গে শৈব সাধনাকে অব্যাহত রাখা হল। মূর্তিপূজা কিছুকালের জন্ম জনমানস থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। গ্রামে গ্রামে হিন্দু বিবাহ ও নবীনধান্য উৎসবের জন্ম সরকারী কর ধার্য্য হল। কর ধার্য্য হল চড়ক পূজার জন্ম। এমনকি মৃত্যুর পর শবদাহ করতে হলেও মোগল সরকারকে কর দেবার ব্যবস্থা বহুল প্রচারিত হল। রাজাদেশ অবজ্ঞা করে অন্নদা পূজা করার নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বাংলার সুবাদার আলিবর্দী খাঁ, মহবৎজঙ্গ কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

মোগল আমল অবসিত হলে যখন হিন্দুরা আবার প্রত্যক্ষে পূজার্চনা করবার সুযোগ পেলেন তখন সাগরপারের বিদেশীদের তাঁরা পছন্দ না করে পারলেন না। এই শ্বেতবরণ বিদেশীরা যাতে ফিরে না যায় তাই তাদের উপাসনার গীর্জার জন্ম হিন্দুরা স্বেচ্ছায় জমি দান করলেন। বিভিন্ন ক্রীস্টান সম্প্রদায়ের গীর্জাগুলি তাই গড়ে উঠল হিন্দু এলাকায়, হিন্দুদের দেওয়া জমির ওপর। মহারাজা নবকৃষ্ণ কলকাতায় বিরাট এক ভূখণ্ড দান করলেন। এখানেই গড়ে উঠল সেন্ট জেমস গীর্জা। ইংরেজ প্রভুত্ব প্রসারে মহারাজা দুর্লভরামের কীর্তি অনস্বীকার্য্য হল। আশ্চর্যের কথা মোগল সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সর্বাত্মক বিদ্রোহ কিন্তু মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। তাই সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেকার সৌহার্দ্দ দেখলে

অবাক হতে হয়। নিজ নিজ সামাজিক গণ্ডীর ভেতর হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিগণ অবস্থান করেছেন, কর্মজগতে পরস্পরকে সাহায্য করেছেন, কখনও কখনও অতি গভীরভাবে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সম্মান প্রকাশ করেছেন।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দেও এই বন্ধুত্ব অটুট যদিও মুসলমান সমাজ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে ইংরেজ সরকার তাদেরকে বিশ্বাস করেন না এবং সমস্ত কাজে হিন্দুকর্মচারীদের ওপরই বেশী নির্ভরশীল। সাধারণ লোকের কাছে তখনও দেশের গতি প্রকৃতি স্পষ্ট নয়। অযোধ্যার নবাব যেমন পতিত, তেমনি পতিত মহাদাজী সিন্ধিয়া যিনি মাত্র কয়েক বছর আগেও দিল্লীর সর্বেসর্বা এমন কি বাদশাহকে আজ্ঞাকারী। ইংরেজ শক্তির কাছে পরাজিত ব্যাঘ্রশক্তি টিপু সুলতান। তাঁর শত্রু মারাঠারাও পরাজিত, মহানায়ক কৌটিল্যস্বরূপ নানা ফাড়নীসের উপস্থিতি সত্ত্বেও। পরাজিত যশোবন্ত হোলকার যাঁর অর্জুনের মতো অজেয় পরাক্রম লোকের মুখে মুখে ফিরেছে কতশত গল্প কথিকায়।

তবুও সাধারণ লোক খুব দুঃখিত নয়। বিদেশীরা স্থাপনা করেছে সদর নিজামত ও সদর দেওয়ানী আদালত সেখানে সকলেই তাঁদের অভিযোগ নিয়ে যাবার অধিকারী। এই তো মাত্র সেদিন নবাব বংশোদ্ভূত হিঙ্গন সাহেব এক সাধারণ ব্যক্তিকে খুন করবার জন্য সাজা পেলেন সামান্য অপরাধীর মতো। কোথায় যেন একটা সন্তোষ জনসাধারনের মধ্যে বিরাজ করতে লেগেছে। মহাজনদের অত্যাচার যেন প্রশমিত। কথায় কথায় এখন আর জমি থেকে উৎখাত হতে হয় না। বাড়ী ঘরদোর জিনিষপত্র যখন তখন সুদের দায়ে আর কেউ নিয়ে যেতে পারে না। স্ত্রীলোক অপহৃত হলে সদরে ওই লালমুখো কালেকটার সাহেবের দারস্থ হওয়া যায়। তখন তার লাল মুখ সিঁদুরে রং ধরে। তিনি একজন জাঁদরেল সাহেবকে ডেকে তখুনি তদন্তের ভার দেন। চারিদিকেই যেন শান্তির ভাব। চাষা জমিদারকে নির্দিষ্ট সময় পূর্ব অবধারিত খাজনা দেয় আর সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় জমিদার তাকে ছাপা কাগজে রসিদ দেন। বাকী খাজনার দায়ে নালিশ করলে সেই রসিদ দেখালেই মুক্তি। রসিদগুলি যেন সহজ জীবনধারনের ছাড় পত্র। সংস্কৃত শিক্ষার কতো টোল গড়ে উঠেছে কতো জায়গায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দল বেঁধে জায়গায় জায়গায় বসবাস করেন। মাদ্রাসায়

মক্তবে ফারসী শেখান মৌলবীসাহেবরা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কলকাতার বড় মাদ্রাসায় পড়াবার জন্যে ডাক পান। বন্দর কাশিমবাজারে নৌকা লাগিয়ে সূর্যাস্ত দেখারও অবকাশ মেলে।

কিন্তু বন্দর কাশিমবাজার মৃত। একসময়ে জাহাজে পূর্ণ থাকত ঘাট। এখন মাত্র কয়েকটা গাদা নৌকা আর রাজাদের পুরাতন ময়ূরপঙ্খী বন্দরে বাঁধা থাকে। অধিকাংশ সময়েই নদীর খাতে জল থাকে না। পলি পড়ে নদীবক্ষ উন্নীত। তাই বর্ষার জলধারা নামলে বন্যায় দুকূল প্লাবিত হয়ে যায়। এইরকম বন্যার পর আসে মড়ক। লোক মরে বা পালিয়ে যায়। বাড়ী ঘরদোর ভেঙে পড়ে অথবা চোরে চুরি করে। এই ভাবেই কাশিম-বাজার জঙ্গলে রূপান্তরিত। বাঘের উৎপাতে সন্ধ্যার পর কেউ পথে যেতে ভরসা পায় না। মাঝে মাঝে চিতাবাঘ ছাগল মুরগী নিয়ে পালায়। বিষ্টুপুরের দহে আর কালিপুকুরের পাড়ে দেখা গেছে বিরাট ময়াল সাপ। বহরমপুরের সেনানিবাস থেকে একজন গোরা সৈনিক এসেছিল সাপ মারতে। কিন্তু তিনিও সফল হন নাই। বন্দুকের গুলি সাপের গায়ে লেগে ঠিকরে গেল। সাপ আশ্রয় নিল পুকুরের ভেতর। বর্ষায় নদীতে কুমীর আসে। বলে নাকি পদ্মা থেকে আসে। তখন ঘাটে স্নান করতে গেলেও সাবধান হতে হয়। সেই সুন্দর সহরও অন্তর্হিত।

দুই

বন্দর কাশিমবাজারের উত্থান পতনের কাহিনী এক বিয়োগান্ত রূপকথা। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরই তার উত্থান আর ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তার পতন। গঙ্গানদীর ধারার সঙ্গে জড়িত বন্দর কাশিমবাজারের ভাগ্য, বিদেশী বাণিজ্যের সঙ্গে তার উন্নতি, রেশম শিল্পের অবসানের সঙ্গে তার অপমৃত্যু।

দিল্লী থেকে পাটনা ও রাজমহল হয়ে হুগলি আসার নদীপথে কাশিমবাজারের অবস্থিতি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মা থেকে জলঙ্গী পর্য্যন্ত ভাগীরথীর অংশ কাশিমবাজার নদী নামে প্রসিদ্ধ।[১] এই সময়কার বহু মানচিত্রে এই নামই দেখা যাবে। মুকসুদাবাদ বা পরবর্তীকালের মুর্শিদাবাদ সহর পার হয়েই গঙ্গানদী অশ্বক্ষুরাকৃতিতে প্রবাহিত হত। দস্যুসমাচ্ছন্ন নদীপথ থেকে নৌকাগুলি কাশিমবাজার নদীর এই অংশে প্রবেশ করলে নিরাপত্তার নিশ্চিন্ততা অনুভব করত। অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীর নিম্নভাগে কাশিমবাজার সহরের অবস্থিতি নৌকাগুলিকে বন্দরের রূপ এবং সুবিধা দান করত। ক্রমে ব্যবসার প্রসারে বন্দর কাশিমবাজারের প্রয়োজন পরিপূর্ণরূপে গৃহীত হল। কালক্রমে কাশিমবাজার নদী বা ভাগীরথী, পদ্মা ও জলঙ্গী-এই তিন নদীর মধ্যস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ 'কাশিমবাজার দ্বীপ' নামে প্রচলিত হল। বস্তুত এই তিন নদীর বেড়াজালে আবদ্ধ অংশ থেকে স্থলপথে কোনক্রমেই পলায়ন করা যেত না। এইজন্তেই নবাব সিরাজদৌল্লা যখন পলাতক হলেন তখন কেবলমাত্র জলপথের দিকেই নজর রাখা হয়েছিল। জলপথেই সিরাজ ধৃত হন। অন্যদিকে এই ঘটনার মাত্র কয়েকমাস আগে শিকার করতে যাবার অছিলায় যখন ওয়াটস, হেস্টিংস, কোলেট ও মারিয়ট কলকাতায় পলায়ন করলেন, তখন জলপথের দিকে নজর না রাখার জন্তই নবাব সিরাজদৌল্লা তাদের ধরতে পারলেন না। তারা প্রথমে ঘোড়ায় জলঙ্গীপাড়ে অগ্রদ্বীপে এলেন এবং সেখান থেকে নৌকাযোগে কলকাতায় পলায়ন করলেন।

কাশিমবাজার নদীর এই অংশের অশ্বক্ষুরাকৃতি রূপ বন্দর কাশিমবাজার পত্তনের একমাত্র কারণ। বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলার খোসবাগের কাছে গঙ্গানদী বা ভাগীরথী পূর্ব-দক্ষিণ প্রবাহে অশ্বক্ষুরাকৃতি সৃষ্টি সুরু করে; তারপর ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং শেষ পর্য্যন্ত উত্তর ও উত্তর-

পশ্চিম প্রবাহ এই অশ্বক্ষুরাকৃতি সৃষ্টি সম্পূর্ণ করল। উত্তর প্রবাহিনী গঙ্গার উপকূলে কাশিমবাজার অবস্থিত। উত্তর-বাহিনী গঙ্গা প্রবাহ জনসাধারণের মনে বারাণসীর পূণ্য নাম স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। শত শত ভগ্ন শিবমন্দির আর এক পূণ্য শহর সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যবসার প্রসার ও বন্দরের নিরাপত্তা অনতিবিলম্বে এই শহরকে এক খ্যাতনামা গঞ্জে রূপান্তরিত করল। ধর্মের আকর্ষণ অর্থের প্রলোভনের কাছে পরাজিত হল। সেই সপ্তদশ শতাব্দীতেই ব্যবসায়ী বাঙালী দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে সমবেত হলেন। সমবেত হলেন পশ্চিম ভারতীয় গুজরাটি বণিককুল। মারোয়ায়ী মহাজন ও শ্রফগণ অচিরেই নিজেদের বাসা বাধলেন। এই সব অংশ এখনও মহাজনটুলী এবং গুজরাটিটুলী নামে প্রসিদ্ধ। বিদেশী বণিকগণ কাশিমবাজারে বসতে দেরী করলেন না। নদীর পারে শ্রেষ্ঠ জায়গাটি দখল করলেন ফরাসী বণিকগণ। কিছুদিনের মধ্যেই এই অঞ্চল ফরাসডাঙা রূপে খ্যাত হল। তারপর এলেন ওলন্দাজ বণিককুল। তারা কালিকাপুরে নিজেদের বসবাসের মস্ত ছাউনির পত্তন করলেন। ইংরেজরা এলেন সবার শেষে। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বণিকগৃহের বা ফ্যাক্টরী গঠন সর্বজন বিদিত। কিন্তু বণিক অধ্যক্ষ স্টিফেন্স সাহেবের এইখানে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হওয়ায় অনেকেই সন্দেহ করেন যে ইংরেজ কুঠীর শুরু সম্ভবত সেই সময়েই হয়েছিল।[২] ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ শুরু হতে না হতেই বন্দর কাশিমবাজারের নাম সর্বজন বিদিত হয়েছিল।

আচার্য যদুনাথ লিখেছেন যে 'মাসুমা বাজার' এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। 'মাসুমা' কথার অর্থ আচার্য জানিয়েছেন 'chaste lady'[৩] বাংলায় সম্ভবত 'সতীর বাজার' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য এই বাজার ওই মহিলা বসিয়েছিলেন না তাঁর জায়গার উপর বাজার অবস্থিত ছিল জানা যায় না। সম্ভবত এই মাসুমাবাজার নামই ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর অনেকগুলি দ্রুত সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনা এই বাজারের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। সম্রাট সাজাহান তখন দিল্লীর বাদশাহ। অর্থনৈতিক কারণেই তিনি হুগলির পর্তুগীজদের বাণিজ্যের প্রসার পছন্দ করেন নাই। পর্তুগীজ বণিকরা তখন চট্টগ্রাম ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিশেষ বোর্ণিও ও সুমাত্রার সঙ্গে প্রচুর লেনদেনের কারবারে ব্যস্ত। সম্রাটের অসন্তোষের

প্রধান কারণ হল পর্তুগীজদের রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং সরকারী খাজনা দেবার প্রস্তাব উপেক্ষা করা। নিকোলো মানুচী অবশ্য বাদশাহের এই অসন্তোষের অন্য কারণ দেখিয়েছেন। ভেনিসের এই ভদ্রলোক মাত্র সতের বছর বয়সে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন এবং সারাজীবন এদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং নানা ব্যক্তির অধীনে কাজ করে অবশেষে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরিতে দেহরক্ষা করেন। কিছুকাল ইনি সুলতান দারাসুকোর গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়কও ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর লেখা মোগল ইতিহাস (Storia do Mogor) নানা কারণে এক মূল্যবান আকরগ্রন্থ। মানুচী লিখেছেন যে শাহজাহান বাদশাহ হবার আগে একবার বেগম মমতাজ মহলকে নিয়ে হুগলি পরিভ্রমণে এসে পর্তুগীজদের হাতে অত্যন্ত লাঞ্ছিত হন। বেগম সাহেবার একাধিক পরিচারিকাকে দস্যুরা অপহরণ করে এবং স্বয়ং বেগমসহ বাদশাজাদা অতিকষ্টে রক্ষা পান। বাদশাহ হবার পর এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তাই সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কাশিম খাঁর নেতৃত্বে বাদশাহ পর্তুগীজ দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম খাঁর হুগলি অভিযান এবং পর্তুগীজদের পরাজয়ের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। মানুচী লিখেছেন যে পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ বাদশাহের আদেশে কাশিম খাঁ অনেকগুলি পর্তুগীজ মহিলাকে অপহরণ করেন।[৪] এই শুভ্রা স্ত্রীলোকগুলির রূপে কাশিম খাঁ নিজেও আকৃষ্ট হন। নিজের জন্য যে স্ত্রীলোকগুলি তিনি অপহরণ করেছিলেন তাদের পাছে বাদশাহ চেয়ে নেন তাই কাশিম খাঁ চিন্তিত হলেন। পাটনা অথবা রাজমহলে এই স্ত্রীলোকগুলিকে রাখলে পাছে বাদশাহর কর্ণগোচর হয় তাই অবশেষে অখ্যাত মাসুমাবাজারেই স্ত্রীলোকগুলিকে রাখা স্থির হল। তিনি মাসুমা বাজারে কয়েকদিন অবস্থান করে এখানেই নিজের জন্য কতকগুলি পর্তুগীজ মহিলাকে লুকিয়ে রেখে অন্যগুলি সম্রাটকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। কিন্তু কাশিম খাঁর ভাগ্য মন্দ, কারণ তিনি দিল্লী থেকে আর বাইরে আসতে পারলেন না। জ্বরে সেই বছরেই তাঁর মৃত্যু হল। উপরের ঘটনাকে উপন্যাস মনে করলেও হুগলি-বিজয়ী কাশিম খাঁ যে মাসুমা বাজারে এসেছিলেন তা প্রামাণ্য এবং কাশিম খাঁকে সম্মান দেখাবার জন্যই মাসুমাবাজারের নাম কাশিমবাজারে রূপান্তরিত হওয়া যুক্তিপূর্ণ মনে করা চলতে পারে।

কাশিম খাঁ যে কাশিমবাজারের উন্নতির সহায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হুগলি বন্দর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বন্দর কাশিমবাজারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেল। বাণিজ্যের প্রসারে হুগলি বাদশাহী বন্দরে রূপান্তর হওয়ায় সাধারণ ব্যবসায়ী বন্দর কাশিমবাজারে জমায়েত হলেন। বাংলায় তখন রপ্তানি বাণিজ্যের সম্ভার কতো। প্রচুর পরিমাণে চাল বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করতেন। এছাড়া সোরা, রেশম বস্ত্র, তাঁত বস্ত্র, ঘাসের তৈরী থান ও চাটাই জাতীয় জিনিষ, চিনি, নীল, ঘি, লঙ্কা বা মরিচ, মোম, লাক্ষা ও মাটির পুতুল বাংলার অন্যতম রপ্তানী বলে গণ্য হত।[৫] এছাড়া ছিল আফিংএর সম্ভার, কাঁচা রেশম এবং রেশমজাত নানা সামগ্রী যা খুচরা দ্রব্যাদি নামে খ্যাত হয়েছে। বাংলার ব্যবসা তখন পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিকেই প্রসারিত হয়েছিল। পূর্বে বাংলার রপ্তানি চলে যেত রেঙ্গুন, পেগু, অচিন, পেনাং, বেনকুলান, বাটাভিয়া, বালামবানগান, মালাক্কা হয়ে মাকাসার পর্য্যন্ত, চীনের ম্যাকাও ও ক্যান্টনেও যেত বাংলার দ্রব্য সামগ্রী। পশ্চিমে টাটহা, গোমব্রুন, মুসকাট, বসরা, ইসাফান, মোচা, জিড্ডা পর্য্যন্ত, আবার পাটে, মোম্বাসা হয়ে আফ্রিকা উপকুল ঘুরে চলে যেত সুদূর ইওরোপে।[৬] রেনেল সাহেব লিখেছেন যে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়েও এককোটি তেতাল্লিস লক্ষ সিক্কাটাকা বাংলার হাতে থাকত।[৭] এই টাকার মূল্য তখন চোদ্দ সিক্কা টাকায় এক মোহর আর মাত্র আট সিক্কাটাকা সমান এক স্টারলিং পাউণ্ড। বাংলার বাণিজ্যের দিগন্ত তখন সুদূর প্রসারী।

কাশিমবাজার দ্বীপ নামে ত্রিকোণাকৃতি ভূখণ্ড দৈর্ঘ্যে ছিল একশত মাইল ও প্রস্থে (সব থেকে চওড়ায়) ষাট মাইল। যেখানে পদ্মা ও ভাগীরথীতে বিচ্ছেদ হয়ে এই দ্বীপ সৃষ্টি শুরু হচ্ছে সেখানে প্রস্থ ক্ষীণতম এবং জলঙ্গীর দুই মুখে যখন ভাগীরথী ও পদ্মা যুক্ত হচ্ছে তখনই প্রস্থ স্ফীতকায় হচ্ছে। কাশিমবাজার এই ভূখণ্ডের মধ্যমণি। মুকসুদাবাদ রাজধানীতে রূপান্তরিত হবার অনেক আগে কাশিমবাজারের সুনাম এবং প্রসার। তখন থেকেই শুরু হয়েছে নানা লোকের আসা যাওয়া। বর্দ্ধমান জেলার মন্ত্রেশ্বর মৌজার সিজনা গ্রাম থেকে এলেন কালিন্দীচরণ নন্দী, বড়ছেলে সীতারামকে সঙ্গে করে। ঘোর বৈষ্ণব। গলায় কণ্ঠী। রেশমের সুতোর সঙ্গে সুতি হতো

মিশিয়ে কমদামী টেঁকসই বস্ত্র তৈরী করায় চরম পারদর্শীতার অধিকারী। বসলেন ব্যবসা খুলে কাশিমবাজারে।

হুগলিতে পর্তুগীজদের পরাজয় ইংরেজ কোম্পানীর খুব সুবিধা করে দিল। তারা মহানন্দে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের শূণ্যস্থানে আকণ্ঠ ডুব দিল। এদিকে এই কোম্পানীর ডাক্তার বুটন সাহেব, বাদশাহ শাহজাহানের কন্যার চিকিৎসা করে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য করার অধিকার আদায় করলেন। এই আদেশের সর্ত্ত অনুসারে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ কাউন্সিলের অধীনে হুগলিতে বে কাউন্সিল (Bay Council) স্থাপিত হল। ক্রমে অতি দ্রুতগতিতে ইংরেজ ব্যবসায়ী ভিতর-বাংলায় কুঠী স্থাপন করলেন। হুগলির অধীনে বালাসোর, কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা ও সিংহাইয়াতে ইংরেজ ফ্যাক্টরী গড়ে উঠল।

১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন কীন ৪০ পাউণ্ড বেতনে ফ্যাক্টর এবং পরবর্ত্তীকালের কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চারনক ২০ পাউণ্ড বেতনে তার সহকারী নিযুক্ত হন।[৮] বিভিন্ন কুঠী ঘুরে জব চারনক অবশেষে কাশিমবাজার কুঠীর প্রধান নিযুক্ত হলেন ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে। চারনকের বিষয় অনেক লেখা হয়েছে। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে এমন সাহেব কেউ দেখে নাই। সে দেশী ভাষা বলত, দেশী খানা খেত, দেশী তামাক টানতে টানতে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সাধারণ লোকের সঙ্গে খোসগল্প করত। তারা অসুস্থ হলে ওষুধ দিত সেবা করত। সেখানেই শেষ নয়, রাজদ্বারে সাধারণ লোক অভিযুক্ত হলে কাজীর দরবারে জোর সওয়াল চালাত। তার ওপর তার বিবি ছিল এদেশীয়। কথিত যে পাটনায় সতীদাহের জন্য নিয়ে যাওয়া এক রমনীকে অপহরণ করে তিনি তাকে ক্রীস্টান করে বিবাহ করেন। সাধারণ লোক তাকে ভাল-বাসলেও মোগল সরকারের তিনি হলেন চক্ষুশূল। অবশেষে সুবাদার শায়েস্তা খাঁ এক ফাঁদ পাতলেন। জব চারনক কি করে খাঁ সাহেবের চোখে ধুলো দিয়ে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে পালিয়ে গেলেন তারপর হিজলী থেকে যুদ্ধ করে কি ভাবে বিরাট মোগল ফৌজকে হারিয়ে দিয়ে বাদশাহী ইস্তা-হারের বলে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগাষ্ট কলকাতা সহরের পত্তন করলেন, সে আর এক রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল ইতিহাস।

তখন বন্দুক কামানের গুলিগোলা তৈরী করতে সোরা ছিল অত্যন্ত

প্রয়োজনীয় বস্তু। পাটনা ছিল সোরার ডিপো। এই সোরা বড় বড় নৌকায় নিয়ে আসা হত বন্দর কাশিমবাজারে। সেখানে সোরা ছোট নৌকাতে তোলা হত কারণ কাশিমবাজার থেকে হুগলির মধ্যে নাব্যতা কম। তাছাড়া জলের স্রোত যথেষ্ট জোরদার না হওয়ায় জায়গায় জায়গায় বালি জমে বাধার সৃষ্টি করত। এই পথের চলাচলের নৌকাগুলিও বিশেষ-ভাবে তৈরী করা হত। অল্প জলেও যাতে ভাসমান থাকে তাই নৌকার তলাটা চ্যাটান করা হত যাতে বালির চড়ের বাঁধা নৌকাগুলিকে না আটকাতে পারে। অনেক সময় পাটনার নৌকা এসে পড়লেও ছোট নৌকা-গুলি আসতে দেরী হলে বন্দর কাশিমবাজারে সোরা ফেলে দিয়ে পাটনার নৌকা ফিরে যেত। ক্রমে এ নিয়ম চালু হয়ে গেল এবং কাশিমবাজার সোরা রপ্তানীর কেন্দ্র হয়ে উঠল। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলির কুঠিয়ালের ওপর হুকুম জারি করলেন কোম্পানী যে প্রতি বছর পাটনার সোরা কেনার জন্য ৫০০০ পাউণ্ড ও কাশিমবাজারের রেশম কেনার জন্য ৪০০০ পাউণ্ড করে ব্যয় করতে হবে।[৯]

১৬৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলো মানুচী স্বয়ং কাশিমবাজারে আসেন। হুগলি থেকে আগ্রা যাবার পথে কাশিমবাজারে আসতে হয়েছিল। তিনি লিখেছেন :

"হুগলি থেকে যাত্রা করার তৃতীয় দিনে আমি কাশিমবাজারে উপনীত হলাম। দেখলাম এখানে উচ্চশ্রেণীর কাটা কাপড়ের জিনিষ ও প্রচুর সাদা থান তৈরী করা হয়। এই গ্রামটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং তিনটি বিলাতি জাতির ফ্যাক্টরি এখানে রয়েছে। জাতি তিনটি ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ। কাশিমবাজার থেকে আমি রাজমহলের পথ ধরলাম।"[১০]

১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ওলন্দাজ কুঠীতে ৭০০ তাঁতী সিল্ক বোনার কাজে লিপ্ত ছিল। অন্য দুই কুঠিতে তখন এত লোক ছিল না। কাশিমবাজারে প্রতি বছর তখন বাইশহাজার গাঁইট রেশমের কাটনা বা কাটাসুতো তৈরীর ক্ষমতা ছিল। প্রতি গাঁইটের ওজন ১০০ লিভার (livres)। এক লিভার আধসেরের থেকে ওজনে একটু বেশী ভারী। সমগ্র ওজন ত্রিশহাজার মনের থেকে কিছু বেশী (৩০০৭৮ মন)। রেশমের কাটা সুতো জাপান বা ওলন্দাজ দেশে যেত ছয় হাজার থেকে সাত হাজার গাঁইট। তাতারি

বণিকগণ ও মোগল সাম্রাজ্য প্রায় সমপরিমান রেশম গ্রহণ করতেন। বাকী নয় হাজার গাঁইট ওলন্দাজ ব্যবসায়ীগন দেশের ভিতরেই বিক্রয় করতেন। সাধারণত সুরাট ও আহমেদাবাদে এই সুতো থেকে বস্ত্র ও পোষাক তৈরী করা হত।[১১] ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ওলন্দাজের ব্যবসা এত উন্নতি লাভ করল যে তারা পাটনা, দৌলতগঞ্জ, ছাপরা, সিংহাইয়া ও হাজিপুরে বাণিজ্য বিস্তার করলেন এবং রেশমশিল্পের মধ্যমণি কাশিমবাজারে (কালিকাপুরে) ১৫৩০০০ টাকা খরচ করে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট প্রাসাদ তৈরী করলেন।[১২]

ফরাসী কুঠী অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীর বহিঃপ্রবাহের মুখে অবস্থিত ছিল। কুঠী স্থাপনের শ্রেষ্ঠতম জায়গা পেলেও ফরাসী ব্যবসায় সপ্তদশ শতাব্দীতেই বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে বন্ধ হয়ে যায়। ডুপ্লে সাহেব ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী কুঠীর সংস্কার ও ফরাসী ব্যবসায়ের পুনঃপত্তন করেন। ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসী ব্যবসা অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত উন্নতি করল।[১৩] রপ্তানীর জন্য ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিবছর ষাটহাজার পেটি সেরা রেশমী সুতো বা টানি ক্রয় করতে শুরু করল। এছাড়া অন্যান্য নানা জিনিষের মধ্যে রেশম ও সুতির কাটা কাপড়, শাদাগাড়া বা মোটা সুতি কাপড়ের থান প্রচুর পরিমানে রপ্তানী শুরু হল। তাঁরা চীন থেকে ফটকিরি, কর্পূর, দস্তার তৈরী জিনিষ, পারদ, চীন মাটির সামগ্রী, চীনাসিন্দুর, আর ঝুটা মুক্তা নিয়ে এসে বাংলার বাজারে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেন।[১৪] ডুপ্লে ফরাসডাঙ্গায় রাজ্যের সেরা তাঁতীদের সমাবেশ করলেন। ফরাসডাঙ্গার তাঁতের জিনিষ পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেল। ফরাসডাঙ্গার নাম শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনের মতো লোকের মুখে মুখে ঘুরে বিখ্যাত হয়ে গেল। সব থেকে আশ্চর্য ঘটনা যে ফরাসী কুঠী সম্পূর্ণ লুপ্ত, কিন্তু এখনো কয়েকঘর তাঁতী বিজয়াশেষে প্রদীপের মতো ফরাসডাঙ্গায় টিকে আছে।

ডুপ্লের আমলে ফরাসী কুঠীর কদর ছিল আলাদা। প্রতিবার বর্ষায় ডুবে যেত বলে কুঠীর রক্ষার জন্য পণ্ডিচেরী থেকে এঞ্জিনিয়ার এল। বাঁশের বেড়ার এক অপূর্ব জালবুনে কুঠীতে জল ঢোকা বন্ধ করা হল। কুঠীর চারিদিকে প্রাকার তৈরী হল। বস্তুত এই কুঠী ক্রমে এক দুর্গে পরিণত হল। প্যারিসের আরকাইভসে রক্ষিত কাগজপত্র ও নকশা আজও ডুপ্লের কীর্তির

সাক্ষ্য দিচ্ছে। ফরাসী ব্যবসা প্রসারের ফলে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক 'ইন্দ্রনারায়ন-পুত্র' বার্ষিক বহুটাকা উপায় করতেন। এই ভদ্রলোক নবাব দরবারেও ফরাসী কুঠীর প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল যে আমদানি ও রপ্তানীর কাজে তিনি শতকরা ১২ টাকা পাবেন।[১৫] কলকাতার ইংরেজ কাউন্সিল লণ্ডনের পরিচালক সমিতিকে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী জানালেন যে ফরাসীরা পাঁচখানা জাহাজ সরাসরি ইওরোপে পাঠাচ্ছে। ফরাসীদের লা ওরিয়েণ্ট বন্দরে যে সব জিনিস বাংলা থেকে পাঠান হয়েছিল তার মধ্যে দেখা যায় কাশিমবাজারের সূতি কাটা কাপড়ের থান ৩,৮৭,৮২০ খানি, ৭১টা সিল্কের রুমাল ছাড়া ৩৯টি সিল্কের ছাপান রুমাল ছিল।[১৬] ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুইএর দরবারে কাশিমবাজারে তৈরী সিল্কের বন্ধনী প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রতিদিন নূতন নূতন রংএর বন্ধনী নিয়ে রাজদরবারে আসা ফরাসী রাজপুরুষ এবং মহিলাদের অন্যতম ফ্যাসান হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং চতুর্দশ লুই এই ফ্যাসানের পৃষ্টপোষক ছিলেন। তাঁর প্রিয় সহচরী মাদাম দুবারীর চেষ্টায় এই ফ্যাসান প্রায় মহামারীর মতো ফরাসী দরবারকে আচ্ছন্ন করেছিল।

ডুপ্লে যতদিন চন্দননগরের রাজ্যপাল ছিলেন ততদিন বাংলায় ফরাসী ব্যবসা প্রসারিত হয়েছে। তিনি দাক্ষিণাত্যে চলে যাবার পর এই ব্যবসায় ভাটা পড়ে। তা সত্ত্বেও ফরাসী বিপ্লব পর্য্যন্ত ফরাসীদের বাংলায় ব্যবসা অব্যাহত থাকে।

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম যখন বাংলায় পদার্পন করে তখন তিন প্রধান বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে তারা ছিল নিকৃষ্টতম। ইংরেজ কুঠীর ক্রমবিবর্তন তাই অতীব বৈশিষ্ঠপূর্ণ। লণ্ডনের পরিচালকমণ্ডলী হুগলীর প্রতিনিধিকে ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে কাশিমবাজারে কুঠীস্থাপন অনুমোদন করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে চোদ্দ লক্ষ পাউণ্ড কেবল কাশিমবাজারে লগ্নী করবার আদেশ দেওয়া হয়। সোরা এবং রেশমের জন্য এই অর্থ বিনিয়োগ করা হয়।[১৭] তারপর থেকে নিয়মিত অর্থ বৃদ্ধি করা হতে লাগল। রেশমের রপ্তানীও বৃদ্ধি হতে থাকল। পলাশীর যুদ্ধের সময় ইংরেজরা প্রায় বত্রিশ লক্ষ টাকা কেবল রেশম ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী শুরু হতে না হতেই কাশিমবাজার ভিতর বাংলার বন্দরের

রাণী বলে আখ্যাত হতে থাকে। এই স্থান নিম্ন বাংলায় শ্রেষ্ঠতম বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে স্বীকৃত হয়। রেশম ও মশলিন শিল্পের কেন্দ্রভূমি হিসাবেই এই খ্যাতি তার প্রাপ্য হয়েছিল। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পরিব্রাজক টাভেরনিয়ার যখন কাশিমবাজারে এলেন তিনি দেখলেন কমপক্ষে কুড়ি হাজার পেটি রেশম প্রতি-বছর ইওরোপ ও অন্যান্য দেশে প্রেরিত হচ্ছে। প্রতি পেটির ওজন একমন দশ সেরের কিছু বেশী।[১৪]

ইতিমধ্যে ইংরেজ কোম্পানী কলকাতার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবকে বিলক্ষণ চটিয়েছেন। বাদশাহ হুকুম দিলেন সব বিদেশী বণিকদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিতে। তদনুযায়ী কাশিমবাজারের ইংরেজ ও ফরাসী কুঠী নবাব শায়েস্তা খাঁ দখল করলেন। মোটা অর্থ উৎকোচ দিয়ে ওলন্দাজ-গণ কুঠী রক্ষা করলেন। অবশেষে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ ঔরঙ্গজীব বিধর্মী বণিকদের শেষবারের জন্য ক্ষমা করলেন। বাদশাহর হুকুমে ক্রুদ্ধ হয়ে সুবাদার শায়েস্তা খাঁ পদত্যাগ করলেন। তার জায়গায় নুতন সুবেদার হলেন ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত নবাব ইব্রাহীম খাঁ। তিনি বিদেশীদের বাণিজ্য অধিকার ফিরিয়ে দিলেন এবং ইংরেজদের কতকগুলি বিষয়ে বিনাশুল্কে ব্যবসার আদেশ জারি করলেন। ইংরেজ ও ফরাসীরা নিজ নিজ কুঠী ফিরে পেলেন। কিন্তু বাংলার ব্যবসার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বাদশাহ থাকতেন সুদূর দিল্লীতে। তাঁর ক্রোধ হলে প্রশমিত হতে দেরি হত বটে কিন্তু সাবধানে চললে এবং মাঝে মাঝে উপঢৌকন পাঠালে বাদশাহ বিশেষ তার সাঙ্গপাঙ্গ খুশী থাকতেন। কিন্তু সুবাদার ঘরের পাশের লোক বিশেষ তার চ্যালাদের অর্থলোভ এমন প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেল যে তাদের সামলান কঠিন হয়ে পড়ল। তাদের নানা অভিযোগে ক্ষুব্ধ সুবাদারকে খুশী রাখতে হত নিত্যনৈমিত্ত। কিন্তু সেখানেও ঘটনার শেষ নয়। স্থানীয় ফৌজদারগণ প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী। তাকে খুশী না রাখলে জীবনমৃত্যু সমস্যা দেখা দিত। তেমনই ঘটনা ঘটল একদিন। কাশিমবাজারের ফৌজদার ৩০ মার্চ ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে এক আদেশ জারী করে সমস্ত বিদেশী কোম্পানীর অর্থাৎ ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ কুঠী দখল করে নিলেন। ইংরেজদের কুঠীতে তখন ভাগ্যক্রমে মাত্র পাঁচ হাজার টাকার বেশী জিনিস ছিল না। হলসে সাহেবের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে নবাবের লোকেরা তাঁকে কয়েদখানায় না নিয়ে গিয়ে কাশিমবাজার কুঠীতেই তাঁকে বন্দী করে

রেখে দেয়। কিন্তু ওলন্দাজ কুঠীর সে সৌভাগ্য হল না। তাদের কুঠীতে ছিল অনেক টাকার সম্পত্তি। কাজেই ওলন্দাজ কোম্পানীকে নবাবের কর্মচারীদের বহু টাকা ঘুষ দিতে হল। তদনুযায়ী ওলন্দাজরা অধিকাংশ জিনিষ পাটনা অভিমুখে রওনা করিয়ে দেবার পর ওলন্দাজ কুঠীর ওপর নবাবী পরোয়ানা জারি করা হল।[১৯] তখন থেকেই কিন্তু ইংরেজরা কাশিমবাজারে ব্যবসা করতে বদ্ধ পরিকর। তারা বুঝে নিয়েছিলেন যে ইওরোপ ও আমেরিকার বাজারে কাশিমবাজারের রেশমের জিনিষের যা চাহিদা তাতে আগামী পঞ্চাশ বছরে তাদের মুনাফা শতগুণ বর্দ্ধিত হবে। তাই ৬ মার্চ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দেই ইংল্যাণ্ড থেকে পরিচালক মণ্ডলী জানালেন যে আর কোথাও ব্যবসার প্রসার না করলেও কাশিমবাজার ও মালদহের কুঠী রক্ষা করে বাংলার ব্যবসাকে বৃদ্ধি করতে হবে।[২০]

শোভাসিংহের বিদ্রোহ সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হবার আগে বাংলায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সুবাদার নবাব ইব্রাহিম খাঁ আর তাঁর পুত্র সেনাপতি জবরদস্ত খাঁ শোভাসিংহের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করেও নবাবী ফৌজ শোভাসিংহের অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা করতে অপারগ হলেন। শোভাসিংহের মৃত্যুর পরও তারা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন শোভাসিংহের সহকারী মহাসিংহ তারপরই আক্রমণ করলেন হুগলিতে মোগল চৌকী। ২৫ আগষ্ট ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সুবাদারের এক বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে প্রচণ্ড ক্রোধে বিদ্রোহীরা চন্দননগরের ফরাসী ফ্যাক্টরী আক্রমণ করল। কয়েক-দিনের মধ্যেই চুঁচুড়াতে ওলন্দাজ ফ্যাক্টরী আক্রান্ত হল। নভেম্বর মাসেই সুতানুটি আক্রান্ত হল। বিরাট মোগলবাহিনী নিয়ে জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহীদের দমন করতে এলেন। কিন্তু কোথায় বিদ্রোহী দল। তারা এই সুযোগে অরক্ষিত মুকসুদাবাদ আক্রমণ করলেন। সরকারী খাজনার এক লক্ষ দশ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হল।

মহাসিংহ স্বয়ং বিদ্রোহীদের একদল নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাশিমবাজারে হানা দিলেন। নানারকম পণ্য সামগ্রীপূর্ণ বন্দর কাশিমবাজারের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে বন্দর কাশিমবাজারের যে মৃত্যু হতে পারে সেটা বুঝতে কেউ ভুল করলেন না। বন্দর কাশিমবাজারকে রক্ষা

করবার জন্য ব্যবসায়ীরা সমবেত হয়ে নিষ্কৃতির এক উপায় স্থির করলেন। তারা মহাসিংহকে কয়েক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিতে স্বীকার করলেন। কিন্তু তা সত্বে মহাসিংহ একদিন সদলে ওলন্দাজ কুঠীতে উপস্থিত হলেন। দাবী কেবল অর্থ নয়, আগামী হুগলি আক্রমণের সময় ওলন্দাজগণ সৈন্য ও গোলা দিয়ে মোগল সুবাদারকে সাহায্য করতে পারবেন না। তাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। ওলন্দাজদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আর অর্থ আদায় করে মহাসিংহ রাজমহলের পথ ধরলেন। ২৫ নভেম্বর তাঁরা রাজমহলের টাকশাল লুণ্ঠনের চেষ্টা করলেন।

মোগল সুবাদার ইব্রাহীম খাঁ বিদ্রোহীদের এই ক্ষিপ্রগতিতে হতবাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। বিদ্রোহীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিনে দিনে বৃদ্ধি হতে লাগল। সকলে মনে করলেন বাংলায় মোগলশাসন বুঝি শেষ অঙ্কে উপনীত। ইতিমধ্যে রহিম খাঁ বিদ্রোহীদের আর এক নেতা হয়েছেন এবং রহিম শাহ নাম নিয়ে তিনি নিজেকে বাংলার অধিকর্তা ঘোষণা করে চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে আরম্ভ করেছেন।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর বিদ্রোহীরা বারহাজার অশ্বারোহী আর ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য দিয়ে মুকসুদাবাদকে সুরক্ষিত করল। কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীরা তাদের কাছেই ব্যবসার অনুমতি নিয়ে নজরানা দিতে লাগলেন। মোগল শাসনের কোন চিহ্নই আর এই অঞ্চলে অবশেষ থাকল না। ইংরেজ বণিকদের অনেকগুলি আরং বিদ্রোহীরা অধিকার করে নিল এবং বিভিন্ন স্থানের ছোট ছোট আরক্ষা ঘাঁটিগুলিও দখল করল। ইংরেজ কুঠিয়ালগন বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন কিন্তু বিদ্রোহীরা তাদের আশ্বস্ত করে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে 'পতাকা' দিল এবং দস্তক আদায় করতে লাগল। নিয়মিত শুল্ক দিয়ে ওই 'পতাকা' উড়িয়ে যে হুগলি পর্য্যন্ত নিরাপদে যাওয়া যাবে এমন প্রতিশ্রুতিও কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীদের বিদ্রোহীরা দিতে ভুল করল না। নির্ভয়ে ব্যবসাবাণিজ্য চালিয়ে যাবার নির্দেশ পেয়েও কাশিমবাজারের বণিককুল অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। দুই সরকারের অধীনে বাংলার ব্যবসায়ের নাভিশ্বাস উঠল। আইন ও শৃঙ্খলার চরম অবনতি হল।

বিদ্রোহীরা প্রতিদিন ক্ষমতাশালী হতে লাগলেন। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দের

১৬ জানুয়ারী রাজমহলের টাকশালে হানা দিয়ে কুড়ি লক্ষটাকা লুঠ করল। পরের সপ্তাহেই অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারী তাঁরা আবার সদলে কাশিমবাজারে উপস্থিত হলেন। ব্যবসায়ীরা এবার চল্লিশহাজার টাকা মহাসিংহকে উপঢৌকন দিলে বিদ্রোহী প্রধান ঘোষণা করলেন যে কাশিমবাজারকে তিনি স্বয়ং রক্ষা করবেন। ব্যবসাবাণিজ্য অব্যাহত রাখার হুকুমও দেওয়া হল। কিন্তু মহাসিংহ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেন না। রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো রাজমহল লুণ্ঠন প্রত্যাগত সৈন্যবাহিনী যথেচ্ছ কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীদের ওপর লুঠপাট চালালেন। ফরাসী কুঠী অবরোধ করে চাওয়া হল চল্লিশ হাজারটাকা আর ওলন্দাজ কুঠী অবরোধের মূল্য ধরা হল নয়হাজারটাকা। এই দুই কুঠীরই সম্পদ সম্পর্কে মনে হয় বিদ্রোহীরা অজ্ঞ ছিলেন তা না হলে এত অল্প মূল্য তারা দাবী করতেন না। কিন্তু আশা তাদের বিফল হল। ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ ফনভিলসাহেব আগে থেকেই খবর পেয়ে ১৬ জানুয়ারী চন্দননগরে পলায়ন করেছেন। একজন ফরাসী ও একজন দেশীয় ভদ্রলোক সাহস করে আগিয়ে এসে ফরাসী কুঠীর অর্থহীনতার কথা ঘোষণা করলেন। চন্দননগরে পত্র দিয়ে অর্থ আনিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। ক্ষিপ্ত সৈন্যদল তাদের দুজনকে বেঁধে কষাঘাত করল। তাতে মনের ক্ষোভ মিটলেও অর্থ প্রাপ্তি হল না। অন্যদিকে ওলন্দাজরা সমস্ত জানলা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করলেন। মাত্র বার বা চোদ্দজন কর্মচারী ভেতরে থাকায় তাদের খাদ্যকষ্ট হল না। তারা অবরোধকেও প্রত্যাহত করলেন। দেশীয় বণিকগণ এই বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাহস দেখে অবাক হয়ে গেল।

ইওরোপীয় বণিকদের কাছে যুদ্ধ না করে পরাজয় প্রমাণ করল যে বিদ্রোহীদের সাফল্যের দিন অবসিত। মে মাসে মোগল ফৌজদার মহম্মদ ইউসুফ রাজমহলে বিদ্রোহীদের হঠাৎ আক্রমণ করে পরাজিত করলেন। সে খবর কাশিমবাজারে পৌছান মাত্র বিদ্রোহীরা সেখান থেকে পলায়ন করল। জুন মাসে সেনাপতি জবরদস্ত খাঁর হাতে বিদ্রোহীবাহিনী বিধ্বস্ত হল। অবশেষে তারা বর্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দুই মোগলবাহিনী দুই দিক থেকেই তাদের আক্রমণ করলেন। চন্দ্রকোণার যুদ্ধে রহিমশাহ হত হলেন। সম্ভবত মহাসিংহও এই যুদ্ধে নিহত হন, কারণ এরপর তার কোন চিহ্ন পাওয়া

যায় না।[২১] বিদ্রোহীদের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল মুর্শিদকুলি খাঁ দেওয়ান নিযুক্ত হবার পর তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হবার আগেই বাংলা থেকে বিদ্রোহীদের দুঃস্বপ্ন সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে।

১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ হাদি, শাহজাদা মহম্মদ আজিমুদ্দিনের দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। মহম্মদ হাদি উপাধি পেয়েছিলেন করতলব খাঁ আর তার প্রভু, আজিম-উশ-সান উপাধিতেই পরিচিতি লাভ করেন। শাহাজাদা ছিলেন সুবাদার আর করতলব তার অধীনস্থ দেওয়ান। উভয়ের সম্পর্ক কিন্তু মধুর ছিল না। প্রায়ই গোলমাল হত। অবশেষে বাদশাহ ঔরঙ্গজীব করতলব খাঁর কাজে খুশী হলেন। তাকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে ডেকে পাঠিয়ে তাকে মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধিতে ভূষিত করলেন। কাজের সুবিধার জন্য করতলব খাঁ প্রস্তাব করলেন দেওয়ানের দপ্তর মকসুদাবাদে স্থানান্তর করা হোক। বাদশাহ সানন্দে সম্মতি দিলেন আর সম্মতি দিলেন মুকসুদাবাদের নাম বদল করে তাকে মুর্শিদাবাদ নামে প্রচার করার আবদারিতে। তদনুযায়ী ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদ সহরকে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্রে রূপান্তরিত করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সুবাদারের পদে উন্নীত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাসুবার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হল।[২২]

বন্দর কাশিমবাজারের মাত্র তিনমাইলের মধ্যে বাংলার রাজধানী উঠে আসায় অতি সহজেই এই সহরের গুরুত্ব প্রচণ্ড ভাবেই বৃদ্ধি পেল। ব্যবসার প্রসারে কাশিমবাজারের মর্য্যাদা বেড়ে গেল। রাজধানীর বন্দর হওয়ায় তার সম্মান ও প্রতিপত্তি অগ্রগণ্য হল। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নৈকট্য কাশিমবাজারের পরিবেশ বৃদ্ধি করল। বহু প্রাসাদ ও অট্টালিকায় এই তিনমাইল পথ সহজেই আচ্ছাদিত হয়ে গেল। কাশিমবাজার রাজধানীর অংশ বিশেষরূপে গণ্য হল।

বিদেশী কুঠিগুলির রূপান্তর লক্ষণীয়। এখন আর কেবল ব্যবসা নয়, এগুলি রাজনীতির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল। দিনেমার ও আর্মেনীয় বণিককুল কুঠি স্থাপন না করলেও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আর্মেনীয় বণিকগণ ব্যক্তিগতভাবে বসবাস শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাদের চেষ্টায় বিরাট আর্মানী গীর্জা স্থাপিত হল। প্রত্যেক কুঠির প্রধানরা নূতন

মর্য্যাদায় ভূষিত হলেন। প্রধান কুঠিয়াল নির্বাচন, বিদেশী কোম্পানীগণের এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল। উইলিয়াম বাগডেন ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাবকে ত্রিশ হাজার টাকা উপঢৌকন দিয়ে ইংরেজ কুঠির আমূল সংস্কারের আদেশ চেয়ে নিলেন। এই সময় কুঠি ও ইংরেজ অধিকৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হল। আইন ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধির চিহ্ন দেখে ফরাসী ও ওলন্দাজ কোম্পানীগণও নিজেদের কুঠিগুলি নানা আসবাবপত্রে নূতন করে সজ্জিত করলেন। সব বিদেশী কুঠিয়ালরাই যে কোন মুহূর্তে তাঁদের কুঠিতে নবাব মুর্শিদকুলিকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের দাক্ষিণাত্যে মৃত্যু হল ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃনাশা সংগ্রাম। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বাদশাহর প্রতি আনুগত্য অক্ষুন্ন রাখলেন। কিন্তু বাদশাহ বদল, হয়ে দাঁড়াল দিল্লীর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষমতা দখল করে বাদশাহীকে তামাশায় রূপান্তরিত করলেন। এইসব কারণেই দিল্লীর প্রভাব কমে গেল এবং বাংলার সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ প্রায় স্বাধীন নবাবের মতো বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁর বংশধরগণ তাকে অনুসরণ করে সুবাদার যেমন হয়েছেন তেমনি প্রায় স্বেচ্ছাচারী নৃপতির মতো ব্যবহার করেছেন। সময়ে রাজস্ব পেলেই দিল্লী খুশী হতেন তাই একমাত্র নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো ছাড়া আনুগত্যের অন্য চিহ্ন বিরল হয়ে গেছে। বাংলা সুবায় এসময় শান্তি বিরাজ করেছিল বলেই এই সময়ে ব্যবসায় প্রচুর অর্থ লগ্নিকৃত হয়। পরবর্তী ষাট বছর রাজনীতির উজ্জ্বল আলোয় মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার আলোকিত হয়ে উঠল। কাশিমবাজার ধীরে ধীরে হয়ে উঠল নানারকম রাজনৈতিক ফন্দিবাজি, ষড়যন্ত্র ও পরামর্শের কেন্দ্রস্থল। নবাবী দৃষ্টি থেকে সামান্য দূরে নানা ব্যবসায়িক কাজের ছুতোয় কাশিমবাজার আলোচনার চমৎকার জায়গা হয়ে উঠল। জগৎশেঠগণ কাশিমবাজারের মহাজনটুলিতে এক বাড়ী তৈরী করলেন। মধুগড়ের পাড়ের জৈন-তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মন্দির নূতন মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। সব থেকে আশ্চর্য্য বিষয় যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুই সম্প্রদায়ই এই মন্দিরটি নিয়মিত ব্যবহার করতেন। গুজরাঠী শৈব বণিকগণ একাধিক শিব মন্দির গঙ্গার পাড়ে স্থাপনা করলেন। শাক্ত সাধকগণ দুর্গা ও কালী-মন্দির স্থাপনা করলেন। বৈষ্ণবগণ কোন মন্দির তৈরী করলেন না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় তাদের প্রতি গৃহে কৃষ্ণনাম, ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তনের কেন্দ্রস্থল হয়ে গেছে। কালিকাপুরের কাছে সুন্দর এক মসজিদ স্থাপিত হল। সকল ধর্ম সম্প্রদায়গণ নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে লাগলেন। নিজের একমাত্র পুত্রকে হিন্দুরমনী ধর্ষনের শাস্তি স্বরূপ প্রাণদণ্ড দিয়ে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ 'জেন্দাপীর' নামে আখ্যায়িত হলেন।

আশ্চর্য্য হতে হয় বৈকী। মাত্র ৬০ বছরের মধ্যে কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসে নয় ভারতবর্ষের ইতিহাসেও কি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হল। দুই যুদ্ধের মধ্যে এ এক অবিশ্বাস্য পরিণাম। যুগসন্ধির এক অপরূপ ছবি। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু এবং জজৌর রণাঙ্গনে বাদশাহ পুত্রদের যুদ্ধ, অন্যদিকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার প্রাঙ্গনে দিল্লীর বাদশাহ, অযোধ্যার নবাব ও মীরকাশিমের মিলিত শৌর্য্যের প্রতিপক্ষ ইংরেজ কোম্পানীর মুষ্টিমেয় সেনা-বাহিনী। অথচ সূর্য্যাস্তের শেষশিখা তিলক পরিয়ে দিল বিদেশী বণিকদের। ক্রমে স্বাধীন ভারতবর্ষ হয়ে গেল তাদের বিজিত সাম্রাজ্য। মাত্র ষাটটা বছরের মধ্যে আকাশ বাতাস সবই বদলে গেল। বদলে গেল দেশের নদী নালা খাল, বদলে গেল গ্রাম, নগর, গঞ্জ। সবই বদলালো যুগ পরিবর্তনে। খাওয়া দাওয়া, পোষাক আষাক থেকে ফলফুল তরিতরকারি পর্য্যন্ত এই বদল পৌঁছে গেল। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ভারত যেন এক অন্যদেশ, অন্যচেতনা, অন্যসংস্কার। ষাট বছরে এত বড় পরিবর্তন কল্পনা করাও কঠিন। তখনকার বাংলা সুবার অন্তর্গত ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের অংশ বিশেষ। আসাম বলে কোন দেশ ছিল না। আসামের অংশ বাংলার মধ্যে ছিল। বৃহৎ-বঙ্গের পরিধি ছিল বর্তমানের বাংলাদেশের সমগ্র, তাছাড়া মণিপুর, শ্রীহট্ট, মানভূম, সাঁওতালপরগণা হয়ে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত, মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখা থেকে তখনকার উড়িষ্যা শুরু হত আর চলে যেত বিজয়পত্তন (ভিজাগাপট্টম্ পর্য্যন্ত)। বিহার, বারাণসী পার হয়ে গঙ্গা ও সারং নদীর সংগম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিধিগুলিও পরিবর্তিত হয়েছে।

বাংলার এই ষাট বছরের শাসন ক্ষমতা বুঝতে হলে মুর্শিদকুলি খাঁর শাসন ব্যবস্থাকে বুঝতে হবে। তার শাসন ব্যবস্থা বোঝা যাবে যখন মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে জগৎশেঠদের সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে। রাজস্থানের নাগর শহরের অধিবাসী হীরানন্দ সাহ পাটনায় ব্যবসা করতে আসেন ১৬৫২

খ্রীষ্টাব্দে। তাঁরই বংশধর শেঠ মানিকচাঁদ ঢাকা থেকে মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদে আসেন। একসঙ্গে আসার কারণ যে নবাবের সঙ্গে শেঠের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব তা বলাই বাহুল্য। শেঠ মানিকচাঁদ, নবাব-আবাসের দুই মাইলের মধ্যে গঙ্গাতীরে মহিমাপুরে নিজের বাসস্থান তৈরী করলেন। শেঠ মানিকচাঁদের বংশধররাই ইতিহাসে জগৎশেঠ বংশ নামে বিখ্যাত। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে কিন্তু শেঠরা টাকশাল বসিয়ে টাকা তৈরীর একছত্র অধিকার পান নাই। এই সময়েই তাঁরা নবাবীছাপের অধিকারী হন। শেঠ মানিকচাঁদ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী গিয়ে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করেন এবং তারপরই বাদশাহ ফরুখশিয়র, মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলা সুবা অর্থাৎ বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান ও সুবাদার নিযুক্ত করেন। বাদশাহ মানিকচাঁদকেও শেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলায় কায়েমী শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শেঠ মানিকচাঁদের সাহায্য ছাড়া যে মুর্শিদকুলি খাঁ করতে পারতেন না একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে শেঠ মানিকচাঁদের মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং দত্তক পুত্র শেঠ ফতেচাঁদ পিতার নির্দিষ্ট পথেই ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকেন। নবাব মুর্শিদকুলির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক নিবিড় ছিল। বাদশাহ মহম্মদ শাহকে সৈন্যবাহিনীর বেতন দেবার জন্য শেঠ ফতেচাঁদ এক কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। তার অব্যবহিত পরেই ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদ শাহ শেঠ ফতেচাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি এই বংশের জ্যেষ্ঠ বংশধরগণ জগৎশেঠ নামে প্রসিদ্ধ। সম্মান আরো এলো। বাংলা সুবায় পায়ে সোনার গহনা পরার অধিকার ছিল কেবলমাত্র বাংলার নবাবের ও জগৎশেঠ বংশের। সব দিয়ে, এমন কি শাসনব্যবস্থা পরিচালনাতেও জগৎশেঠ বংশকে বাংলার নবাবের অংশীদার বলে স্বীকার করা হল। এই জন্য দেখি বাংলায় সুশাসন প্রবর্তনের জন্য জগৎশেঠদের উদ্বেগ। এই উদ্বেগ অনধিকারী অর্থলোভী ব্যবসায়ীর নয়, দেশের ও দশের শুভ কামনার অধিকারী শাসনযন্ত্রের ছোট অংশীদারের। অংশ ছোট হলেও দায়িত্বে বড়ই ছিলেন এরা বলতে হবে, কারণ বাংলার নবাবের অর্থের প্রয়োজন হলেই জগৎশেঠের দ্বারস্থ হতেন। রাজস্ব পাঠাতে হবে দিল্লীতে, ডাক পড়ে জগৎশেঠের। সৈন্যবাহিনী দীর্ঘদিন অর্থাভাবে চঞ্চল, তখনও ডাক পড়ে জগৎশেঠের। যতদিন না বাংলার নবাবরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জগৎশেঠদের কাছে টাকা ধার করেছেন ততদিন উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্র সৃষ্টি হয় নাই।

জগৎশেঠের ছিল সর্বভারতীয় ব্যবসা। জগৎশেঠের হুণ্ডি আফগানিস্থানের কাবুল থেকে পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে সুমাত্রা পর্য্যন্ত অবাধে যাতায়াত করত। সেদিক থেকে বাংলার নবাবের তুলনায় জগৎশেঠের ব্যবসা বিশেষ ছোট ছিল না। জগৎশেঠ বংশ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আর্থিক সম্পদে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেলেও পরিচয়ে তাঁদের স্থান ছিল নবাব ও নবাব-বংশধরদের পরেই।[২৩]

নবাব ও জগৎশেঠ মিলে বাংলার প্রশসানকে চমৎকার চালালেন। ভারতের অন্যত্র যে অরাজকতা বিরাজ করছিল সুবাবাংলায় তার চিহ্নমাত্র ছিল না। এমনকি রাজা সীতারামের মতো বিদ্রোহীকে মুর্শিদকুলি খাঁ এমন নৃশংসভাবে প্রাণদণ্ড দিলেন যে নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার আর কারু সাহস থাকল না। ভূষণার সীতারাম দমনের কীর্তিকথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। নবাবের সৃষ্ট 'বৈকুণ্ঠ' ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ত্রাসের সঞ্চার করল। সরকার প্রাপ্য অর্থ সময়ে দেবার অভ্যাস করতে হল। পরগণা বিভাগের পুনর্বিন্যাস হল। আগে সুবা বাংলা ১৩৫০ টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ তাকে ১৬৬৯ টি পরগণায় বিভক্ত করেন। তাঁর সময়ে চাকলা বিভাগ এবং প্রতি চাকলার সুনির্দিষ্ট জমা ও বার্ষিক হস্তবুদ 'জমা-কামেল তুমারী' নামে অভিহিত হয়। জনসাধারণ নির্ভয়ে দিনে অথবা রাত্রে স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে একস্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াত করতে পারতেন! শান্তি শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। রাত্রে অর্গল বন্ধ না করে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারতেন সকলে। এ অবস্থা মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর আর কখন ফিরে আসে নাই।

স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করলেও মুর্শিদকুলি খাঁকে প্রায়ই দিল্লীর 'নজরানা'র তাগিদ মেটাতে হত। বাদশাহ বদল দিল্লীতে তখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। নূতন বাদশাহর অর্থের প্রয়োজন হলেই সুবাদারদের নজরানা পাঠাবার হুকুম এলেই কাশিমবাজারের বিদেশী কোম্পানীদের কাছে সেই টাকা আদায় করতেন। ক্রমে এই রীতিটা চালু হয়ে গেল। দিল্লীর আদেশ এলেই নবাবের হুকুমনামা জারি হত। কোন বিদেশী কোম্পানী টাকা দিতে অস্বীকার করলেই নবাবী ক্রোধ তাদের সহ্য করতে হত। কাজেই বাদশাহী সমন এলেই নবাবের কর্মচারীদের কাশিমবাজারের কুঠিগুলিতে যাতায়াত বৃদ্ধি পেত। অর্থের পরিমাণ স্থির হলে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে সেই

অর্থ জগৎশেঠের গদীতে জমা দিয়ে রসিদ নেবার ব্যবস্থা ছিল। তারপর এই রসিদ খানিই হত তার ব্যবসায়ের ছাড়পত্র। প্রয়োজনীয় অর্থ সময়ে সংগ্রহ করতে না পারলে ওই জগৎশেঠের কাছেই আবার চড়া সুদে টাকা ধার নিতে হত। জগৎশেঠ এইভাবে একাধারে বেসরকারী ব্যাঙ্ক ও সরকারী টেজারী রূপে কাজ চালাতেন।

তিনদল বিদেশী বণিকের মধ্যে ইংরেজরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের হালচাল একটু বেশী বুঝতে চেষ্টা করলেন। মোগল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ কর্মচারী অর্থের জন্য যে কোন কাজ করতে অপারগ নন এটা বুঝতে খুব সময় গেল না। বিশেষ কলকাতার পত্তন করে (২৪ আগষ্ট ১৬৯০) ইংরেজ কোম্পানী স্পষ্ট বুঝতে পারল যে এক সুবাদারের দেওয়া সনদ অন্য এক সুবাদারের হুকুমে নাকচ হয়ে যেতে পারে। নবাব ইব্রাহীম খাঁর দেওয়া অধিকার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বাতিল করে দিতে পারেন। কিন্তু এক বাদশাহর দেওয়া অধিকার আর এক বাদশাহের ফারমান পেলে অনেক বেশী জোরদার হতে পারে। কাজেই পাকা বন্দোবস্তের একমাত্র উপায় দিল্লীর হুকুমনামা, বাদশাহী ফারমান সংগ্রহ করা। চেষ্টা শুরু হল এবং ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'হাসব-উল-হুকুম' নামে বাদশাহী আদেশ কলকাতার ইংরেজ কাউন্সেলের হস্তগত হল। এই হুকুমে ইংরেজ কোম্পানীর ব্যবসা করার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে, উপরন্তু তাদের বাধা দিতে বা আঘাত হানতে বারণ করা হয়েছে। এই আদেশের পুরোদস্তুর সদ্ব্যবহার করার জন্য বাদশাহের কাছ থেকে আরো সুবিধা আদায় করা হল। বাংলায় বাণিজ্যের ও শুল্ক আদায়ের অধিকার পাওয়া গেল। কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের অধিকার বাদশাহী স্বীকৃত পেল। হুগলি, কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা, মালদা, রাজমহল, রাধানগর ও বালাসোরে স্থাপিত কুঠিগুলির নামও বাদশাহী দপ্তরে লিখিত হল। এতদিন যা ছিল নবাবী অনুমতির দয়ার প্রত্যাশী, এখন থেকে হয়ে গেল বাদশাহী হুকুমে হকদার। কিন্তু ফারমান দরকার। লিখিত অনুমতি পত্র না থাকলে হুকুম বিস্মরণে বাদশাহী কর্মচারীদের খ্যাতি সুবিদিত। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ফারমানের জন্য সুরমান সাহেব প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে দিল্লী যাত্রা করলেন। এই কর্ম 'সুরমান দৌত্য' নামে ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। অবশেষে বার্ষিক মাত্র তিন-

হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানী বাংলা সুবায় বিনা শুল্কে ব্যবসায়ের অনুমতি পেলেন।[২৪] এই অনুমতি পত্র নিয়েই ভবিষ্যতের যত ঝগড়ার সূত্রপাত শুরু হয়। লেখা ছিল ইংরেজ কোম্পানী সরকারী রাজস্বর জন্য রক্ষিত বিশেষ বস্তুগুলি ছাড়া অন্য সব সামগ্রীতে বাণিজ্যের অধিকারী হলেন। নবাব মীরকাশিম দাবি করলেন সরকারী রক্ষিত বস্তুগুলি কেবল পান সুপারি আর নুন নয়, যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যাদি ও দৈনিক প্রয়োজনের দ্রব্য সম্ভার। গোলমাল বাধল। মীরকাশিম রাজ্যচ্যুত হলেন। ইংরেজ কোম্পানী নিযুক্ত হলেন বাদশাহের দেওয়ান। এটা অবশ্য ১৭৬১-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। ১৭১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাবী হুকুম অমান্য করার সাহস ইংরেজ কোম্পানীর হয় নাই। তাঁরা বাদশাহী ফরমানের বলে কলকাতার জমিদার হয়েই খুশী হলেন।[২৫] ডিহি কলকাতা, গোবিন্দপুর আর সুতানুটি নিয়ে সহর কলকাতার পত্তন হল। সেটা হল ইংরেজদের সহর। বাংলার নবাবের টাকশাল ব্যবহারের মৌখিক অনুমতির জন্য ইংরেজ কোম্পানী পচিশহাজার টাকা নজরানা দিতে স্বীকার করল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কুড়ি বাক্স সোনারূপা কাশিমবাজারে পাঠান হল। উদ্দেশ্য এইগুলি টাকায় ও মোহরে রূপান্তরিত করা। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ দিল্লীর এই হুকুম মানতে রাজী হলেন না। নবাবের টাকশালের দারোগা রঘুনন্দনের সুপারিশে ইংরেজ কোম্পানীর এই অধিকার বাতিল করে দেওয়া হল।[২৬] মুর্শিদকুলি ইংরেজদের দিল্লী যাওয়ার ব্যাপারটা ভাল ভাবে মোটেই নিলেন না। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে তাদের কাছে মোটা নজরানা চাওয়া হল। ইংরেজ কোম্পানী অর্থ দিতে অস্বীকার করায় ইংরেজ কুঠি অবরোধ করে তাদের গোমস্তা ও উকিলদের বন্দী করা হল। ফলে ইংরেজ কুঠির বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল। অবশেষে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মধ্যস্থতায় সৈন্য অপসারণ করা হল, গোমস্তা উকিল ছাড়া পেলেন। ইংরেজ কোম্পানী নবাবকে নজরানা দিয়ে খুশী করলেন। মূল্যস্বরূপ কোম্পানীর সমুদয় রূপা প্রতি 'ডুকাটুনে' তিন পাই লোকসানে জগৎশেঠকে বিক্রি করতে ইংরেজ কোম্পানী বাধ্য হলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই জগৎশেঠের সঙ্গে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা হল এবং জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ক্রমে নবাব দরবারে ইংরেজ কোম্পানীর মাতব্বর হলেন।[২৭] কিন্তু তাহলেই বা কি। বছর শেষ হবার আগেই আবার নবাবী নজরানার দাবী এল। এবার ইংরেজ ও ওলন্দাজ কুঠির দুজন উকিলই গ্রেপ্তার হলেন।

ইংরেজ কুঠির সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্টেন বোরল্যাস জগৎশেঠের সঙ্গে দেখা করে নবাবী কীর্তির তীব্র প্রতিবাদ আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে এলেন। অবস্থা বেশ গোলমেলে হয়ে উঠল। অসন্তোষের ঘূর্ণিবাতাস কাশিমবাজারের পথে পথে ধুলো উড়িয়ে চতুর্দিক অস্পষ্ট করে দিল।

১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাবী কর্মচারী আবদুল রহিম কলকাতার উন্নতির জন্য ইংরেজদের কাছে চুয়াল্লিশ হাজার টাকা অতিরিক্ত খাজনা দাবী করল। কলকাতা কাউন্সিল এই অতিরিক্ত খাজনা দিতে অস্বীকার করলেন। আবার কাশিমবাজার কুঠিতে সৈন্য এল এবং দেশীয় বণিকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হল না। অবশেষে জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় এবং কাশিমবাজারের নূতন কুঠিয়াল ষ্টিভেনসন সাহেবের চেষ্টায় ইংরেজ কোম্পানী নবাবকে কুড়ি হাজার টাকা নজরানা দিতে স্বীকার করল। নবাবও আশ্বাস দিলেন এবং এক পরোয়ানা জারি করলেন যে ভবিষ্যতে অন্যায়ভাবে কোন অতিরিক্ত কর বা খাজনা ধার্য্য হবে না। ১৪ই মার্চ বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হলে সে মাসে প্রতিশ্রুত নজরানা নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।[২৮] নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর এটাই শেষ প্রাপ্তিযোগ! ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন তাঁর মৃত্যু হল। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল। কাশিমবাজারের অনতিদূরে কাটরায় তাঁর সমাধি ও মসজিদ আজও এক মহৎ শাসনকর্তার স্মৃতিবহন করছে।

সেই বর্দ্ধমান থেকে আগত ব্যবসায়ী কালিন্দীচরণ গত হয়েছেন। তার জ্যেষ্ঠপুত্র সীতারাম নন্দী কাশিমবাজারে ব্যবসায় করে ভাল ফল পেয়েছেন। রেশম ও পান সুপারির দাদনের ব্যবসা করে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও অল্প-দিনেই পরলোকের ডাক শুনলেন। তার একমাত্র পুত্র রাধাকৃষ্ণ পিতৃ ব্যবসায় চালিয়ে যেতে লাগলেন। কালে তিনি চোদ্দ কাঠা জমি ক্রয় করে সেখানে তিনটি খড়ের ঘর স্থাপনা করলেন। চুনাখালি পরগণার শ্রীপুর গ্রামে তার বাসস্থান। দুটি ঘরে তিনি থাকেন অন্য ঘরটি তার কর্মস্থান এখানেই তিনি রেশম, সুপারি, নারকেল, গুবাকজাতীয় বস্তু ও সুতি সুতোর ব্যবসা করেন। এছাড়া চাল, ঘি, নুন ও অন্যান্য দৈনিক ব্যবহারের বস্তু ও তার দোকানে পাওয়া যেত। আর পাওয়া যেত ঘুড়ি। অবকাশ সময়ে তিনি ঘুড়ি উড়াতে নিজেও খুব ভালবাসতেন। এ বিষয়ে তার এতই পারদর্শিতা ছিল যে সবাই

তাকে এ বিষয়ে 'খলিফা' বলত।[২৯] ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে তার চার পুত্র জন্মেছেন, কৃষ্ণকান্ত (আনুমানিক ১৭২০), জয়রাম (আনুমানিক ১৭২২), কৃষ্ণচন্দ্র (আনুঃ ১৭২৪), ও নৃসিংহচরণ (আনুঃ ১৭২৬)। দীর্ঘকাল পরে তাঁর কনিষ্ঠ-পুত্র গোকুলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন (আনুঃ ১৭৪৫)।

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের এই শান্তিরূপ বাংলার ব্যবসায়িক উন্নতিতে সাহায্য করল। কাশিমবাজার বন্দরের সব সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করে এক সম্পদশালী গঞ্জে রূপান্তরিত হয়ে গেল। রাজনৈতিক উত্তাপ তার ব্যবসায়কে যেমন বৃদ্ধি করল তেমনি আর্থিক লেনদেনও উন্নতি পেল। কাশিমবাজারের 'বন্দরের রাণী' নাম সার্থক হল।

তিন

মুর্শিদকুলিখাঁ তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে নবাব মনোনীত করেন। নবাবের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নবাব-জামাতা ও সরফরাজ খাঁর পিতা, উড়িষ্যার শাসনকর্তা সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ রাজধানীতে সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। সরফরাজ তার জন্মদাতার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া থেকে বিরত হলেন। কাজেই বিনা বাধায় নবাব জামাতা, সুজাউদ্দৌল্লা আসাদ জঙ্গ নাম গ্রহণ করে নবাবী তক্তে আরোহন করলেন। সুজাউদ্দৌল্লার নবাবীর বার বছর রাজনৈতিক প্রস্তুতির বছর বলা যেতে পারে। নবাব উড়িষ্যা থেকে আসার সময় তার অন্যতম সহকারী হাজী আহমদ খাঁ ও তাঁর ভ্রাতা আলিবর্দি খাঁকে সঙ্গে আনলেন। এরা পারশ্যদেশীয় যুদ্ধব্যবসায়ী, জাতিতে আরব। এদের পিতামহ দিল্লীতে এক তুর্কী রমনীকে বিবাহ করেন এবং বাদশাহের ফরমানে ছোটখাটো মনসবদার হয়ে বসেন। এঁদের পিতা মির্জা মহম্মদ, বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের তৃতীয় ও প্রিয়তম পুত্র আজম শাহর দরবারে চাকুরী করতেন। সেইখানেই এই দুই ভাইয়ের কর্মে প্রথম নিয়োগ। মির্জা আহম্মদ যিনি পরে হাজীআহমদ নামে খ্যাত হলেন, তাঁর ওপর ছিল বাদশাহ-পুত্রের রন্ধনশালার তদারকির ভার। মির্জা মহম্মদ আলি যিনি পরে আলিবর্দি খাঁ নামে খ্যাত হন দেখতেন ফিলখানা (হাতিশালা) ও জারদোর্জখানা (জরীর কাজের দর্জীশালা)। সুযোদ্ধা ও সাহসী বলে দুই ভাইএরই খ্যাতি ছিল। বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হলে জজো রণক্ষেত্রে দুই ভাই আজমশাহের পক্ষে লড়াই করেছেন। আজমশাহের পলায়ন ও মৃত্যুর পর এঁরাও নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পলায়ন করলেন। মির্জা আহম্মদ সপরিবারে মক্কায় পলায়ন করলেন। মির্জা মহম্মদ আলি নানা জায়গা ঘুরে দাক্ষিণাত্যের পথে কটকে সপরিবারে উপনীত হলে নবাব সুজাউদ্দিন তাকে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরীতে বহাল করেন। মির্জা মহম্মদের বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আলিবর্দি খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন। এদিকে মক্কা ফেরৎ হাজী আহমদও কটকে এসে সুজাউ-দৌল্লার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করলেন। এমনকি তার তিন পুত্র মহম্মদ রেজা, আগা মহম্মদ সৈয়দ ও মির্জা মহম্মদ হাসিম যথাক্রমে ত্রিশটাকা, কুড়িটাকা, ও দশটাকা মাসিক বেতনে নবাব সরকারে চাকুরী শুরু করলেন। তখন হাজি-

আহমদের বেতন ছিল মাসিক পঞ্চাশ তঙ্কা।[১] নবাব সুজাউদ্দিন সুযোগ্য শাসনকর্তা ছিলেন বটে কিন্তু নারীলালসা তাঁর চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল। কথিত আছে হাজী আহমদ নবাবের লালসায় ইন্ধন যুগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই নবাব দরবারে নিজেদের কায়েমী আসন করে নিলেন।

দিল্লী থেকে ফরমান এসে গেল। সুজাউদৌল্লা সুবাদার নিযুক্ত হলেন। নূতন নবাবের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে এলেন হাজী আহমদ আর আলিবর্দি খাঁ। ইতিমধ্যে স্বঘরের অভাবে হাজী আহমদের তিনছেলের সঙ্গে আলিবর্দির তিন কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে। এঁদের বৈমাত্রেয় ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহিত হয়েছেন এঁদেরই অনুগত এক বীর যুবক, যিনি মীরজাফর নামে পরিচিত। সুজাউদৌল্লার মন্ত্রীপরিষদে দেওয়ান আলমচাঁদের সঙ্গে এবার যুক্ত হলেন হাজী আহমদ। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রধান উপদেষ্টার পদে অব্যাহত থাকলেন। নূতন পদ পেলেন আলিবর্দী খাঁ। তিনি আকবরনগর বা রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হলেন। হাজী আহমদের পুত্ররা ভাল ভাল পদ পেলেন। মহম্মদ রেজার নাম হল নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ তিনি হলেন বক্সী। সৈন্য বাহিনীকে বেতন দেবার ভার থাকল তার ওপর। আগা মহম্মদ সৈয়দের নাম হল সৈয়দ আহমদ খাঁ তিনি ফক্কর কোণ্ডি বা রংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত হলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম হল জৈনুদ্দিন আহমদ খাঁ তাকে বিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সম্রাজ্য সুশাসনের জন্য নবাব তার পুত্র সরফরাজ খাঁকে পাটনায় নায়েব দেওয়ান ও নিজাম হতে বললেন বটে কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নবাবমহিষী জিন্নতউন্নেসা ও সরফরাজ খাঁ সমস্বরে আপত্তি করলে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দীকে ওই পদ দেওয়া হল। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তিনি তখন থেকেই 'নবাব আলিবর্দী খাঁ' নামে পরিচিত হলেন। রাজমহলের ফৌজদারের শূন্য পদে জৈনুদ্দিন আহমদ খাঁ নিযুক্ত হলেন।[২]

মুর্শিদকুলি খাঁ প্রবর্তিত শাসন দেশে শান্তি স্থাপনা করেছিল। সুজাউ-দৌল্লা তাই প্রথমেই অর্থকরী পদগুলিতে নিজের আত্মীয় স্বজন নিয়োগ করলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ নামেমাত্র দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ তকী খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খাঁ নামে ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। এই সময় থেকেই বৈদ্য রাজবল্লভের উন্নতির সূত্রপাত। নৌ বিভাগের সামান্য করণিকের পদ

থেকে রাজবল্লভ মুরাদ আলি খাঁর পেশকার নিযুক্ত হলেন। এই মুরাদ আলিই সরফরাজ কন্যাকে বিবাহ করার পর দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খাঁ নাম গ্রহণ করেন। রাজবল্লভ তার সঙ্গে ঢাকা চলে গেলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বাংলার আয় বৃদ্ধি পায়। নবাব সুজাউদৌল্লা বার্ষিক এককোটি পঁচিশলক্ষটাকা দিল্লীতে রাজস্ব বাবদ পাঠাতেন। এগার বছর আট মাস ও তের দিনের রাজত্বে তিনি মোট রাজস্ব পাঠান দিল্লীতে চৌদ্দ কোটি বাষট্টি-লক্ষ আটাত্তরহাজার পাঁচশো আঠাশ সিক্কাটাকা। নবাব মুর্শিদকুলি নিজে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন কিন্তু নবাব সুজাউদৌল্লা তাঁর কুশলী সভাসদগনের ওপর নির্ভর করতেন। স্বভাবতই তাদের ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। বিশেষ মন্ত্রণা পরিষদের সভ্যদের ক্ষমতা তথা হাজী আহমদের ক্ষমতা এবং বিহার ও উড়িষ্যার শাসকদের ক্ষমতা আকাশচুম্বি হয়ে উঠল।[৩] অন্য দিকে নবাব এবং তার পুত্র বিলাসে মগ্ন। স্ত্রীদেহসম্ভোগলালসার পরিতৃপ্তিতে সাম্রাজ্য সম্পর্কে সব ভাবনা চিন্তা মন থেকে বিসর্জন দিলেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের মৃত্যু আগ্নেয়গিরির উৎসমুখ খুলে দিল।

সুজাউদৌল্লার শাসনের বার বছরে অনেক অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। হাজী আহমদের মধ্যস্থতায় ওলন্দাজ বণিকগণ পঞ্চান্ন হাজার টাকা নজরানার বিনিময়ে বাংলা সুবায় বাণিজ্যের পরোয়ানা লাভ করলেন ৬ জুলাই ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। আলমচাঁদের মধ্যস্থতায় ইংরেজ বণিকগণ চল্লিশ হাজার টাকায় ওই পারোয়ানা পেলেন। কিন্তু নবাব সন্তুষ্ট হলেন না তিনি দুইলক্ষ টাকা নজরানা দাবী করলেন। অনাদায়ে কোম্পানীর সোরা ভর্তি নৌকাগুলো আজিমগঞ্জে আটক করা হল।[৪]

নবাবী আমলাদের উৎকোচে বশীভূত করেও কিন্তু এবার ইংরেজ কোম্পানী রক্ষা পেল না। বড় ওমরাহদেরও উপঢৌকন দেওয়া হল। কিন্তু নবাব এবার একরোখা। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব পলাশীতে সৈন্য সমাবেশ করে কাশিম-বাজারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ করলেন। কাশিমবাজার কুঠির প্রধান হিউ বারকারকে সরিয়ে টমাস ব্র্যাডিডলকে প্রধান করা হল। ১৩ সেপ্টেম্বর ব্র্যাডিডল নবাবের সঙ্গে দেখা করে তাকে শান্ত করলেন।[৫] নবাবী হুকুমে ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আরকটে ও মাদ্রাজে প্রস্তুত টাকার দাম কমিয়ে দেওয়া হল, উদ্দেশ্য ইংরেজদের শায়েস্তা করা। কারণ আরকট ও মাদ্রাজ তখন ইংরেজ-

দের দখলে। সেখানে প্রস্তুত টাকাও তাদের হেফাজতে তৈরী। অবশেষে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ বাক্স রূপা জগৎশেঠকে বিক্রি করে কোম্পানী আবার জগৎশেঠের সুনজরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করলেন।[৬]

জগৎশেঠের সঙ্গে কোম্পানীর মনোমালিন্যের অনেক কারণ ঘটেছে। কোম্পানী জগৎশেঠের কাছে নিয়মিত টাকা ধার করত। দেখা গেল কোম্পানীর গোমস্তা জগৎশেঠের কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে আসতেন তাই থেকে কোম্পানীর কর্মচারীরা বিশেষ সাহেবরাও টাকা ধার করতেন। তারা টাকা শোধ করতেন না ফলে গোমস্তাও সময় মতো জগৎশেঠকে টাকা শোধ করতে পারতেন না। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য কোম্পানীর সাহেবরা টাকা নিতেন। অবশেষে হাজী আহমদ জানিয়ে দিলেন যে জগৎশেঠের সঙ্গে গোলমাল করার মানে স্বয়ং নবাবের সঙ্গেই গোলমাল করা। জগৎশেঠ আরো চটে গেলেন যখন দেখলেন যে ইংরেজরা তাঁকে ছেড়ে দেওয়ান আলমচাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এই গোলমাল ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে বেশ প্রবল আকার ধারণ করে। ১৫ এপ্রিল কুঠির প্রধান স্ট্যাকহাউস জানালেন কলকাতার কাউন্সিলকে যে গোমস্তা নিরুদ্দেশ, ফলে কোম্পানীর [illegible] বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। নূতন ব্যবসায়ীদের দাদন দেবার উপায় নাই [illegible] জগৎশেঠ টাকা দিতে অস্বীকার করেছে। এই গোমস্তা মারফৎ তিনি [illegible] কোম্পানীকে দুইলক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছেন, সেই অর্থ ফেরৎ না পেলে কোম্পানীকে আর তিনি ধার দেবেন না। ইংরেজ কোম্পানী নানাভাবে এই অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করল। এমনকি একসময় নবাব পুত্র সরফরাজ খাঁকে নানা উপহারে খুশী করবার চেষ্টা চলল। অবশেষে ২২ অক্টোবর জগৎশেঠের সঙ্গে বোঝাপড়া হল। নানা সর্তের মধ্যে এক সর্ত হল পুরাতন গোমস্তাকে বদল করা চলবে না। ইংরেজরা তাতে স্বীকৃত হলে জগৎশেঠ জানালেন যে ইংরেজ কোম্পানীর গোমস্তার কাছে তাঁর আর কোন দাবীদাওয়া নাই। যা কিছু দাবী তা ইংরেজ কোম্পানীর কাছে এবং তা শোধ করবার প্রতিশ্রুতিও ইংরেজ কোম্পানী দিয়েছেন। জগৎশেঠ আবার কোম্পানীর মাতব্বর হলেন এবং তারই চেষ্টায় ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাবের সঙ্গে গোলমাল মিটে গেল।[৭]

কাশিমবাজার থেকে রেশমের সুতো রপ্তানীকে ইংরেজ কোম্পানী চিরকালই খুব মর্য্যাদা দিয়েছে। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নিয়মিত পঞ্চাশ ষাটখানি

জাহাজ কাশিমবাজার থেকে নিয়মিত রেশম সম্ভার নিয়ে যাতায়াত করত।[৮] এই সময়কার ব্যবসার বিবরণী ইংল্যাণ্ডের কাস্টমস্ হাউসে রক্ষিত আছে। সেখান থেকে ১৭২৭ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেশম রপ্তানীর চিত্র পাওয়া যায়।[৯] দেখা যাচ্ছে যে, রপ্তানীর পরিমাণ—

১৭২৭—১,৩৪,৯১৯ পাউণ্ড	১৭৩৪—১,৫১,৬২৬⅔ পাউণ্ড
১৭২৮—১,৮৩,৯৯৬⅔ ”	১৭৩৫—১,৯১,৫৮৭ ”
১৭২৯— ৮২,৮২১⅔ ”	১৭৩৬—১,১২,৬২৪ ”
১৭৩০—১,২৭,৩৬১⅔	১৭৩৭—১,৫২,৬৬৪ ”
১৭৩১— ৭৮,৫৬১⅔ ”	১৭৩৮—১,৩৫,৫৮৪ ”
১৭৩২—১,০৮,৯৬৪⅔ ”	১৭৩৯—১,৬০,৫৯৯ ”
১৭৩৩—১,৭৬,১০৮⅔ ”	১৭৪০—১,২৬,৭৫৫⅔ ”

এই সময়ে কাশিমবাজারের কাঁচা রেশমের দাম তিন টাকা থেকে সাত টাকার মধ্যে ছিল। সোয়া দুগজ বহরে বাহাত্তর হাত থানের প্রতি একশত বার হাতের দাম ছিল পনের হাজার টাকা। কিন্তু ভাল রেশম হলে দাম সাংঘাতিক বর্দ্ধিত হত। উদাহরণ হল যে ওই সোয়া দুগজ বহরেই ছত্রিশ হাত থানের প্রতি ছাপ্পান্ন হাতের মূল্য হয়ে যেত ছিয়াত্তর হাজার টাকা।[১০] দেখা যাচ্ছে যে ভাল রেশমের থান পাবার জন্য বিদেশী বণিকগণ যে কোন দাম দিতে স্বীকৃত ছিলেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারের কেবল ইংরেজ ফ্যাক্টরী থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে রেশম যোগান দেবার জন্যে অগ্রিম দেওয়া হয় সাত-লক্ষ একানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ সিক্কা টাকা। এক সিক্কা টাকা ছিল ১·০৮ চলতি টাকার সমান।[১১] দুহাত বহরে দশ হাত লম্বা ঢাকাই মসলিনের দাম ছিল চারশত টাকা, জামদানীর দাম দুইশত পঞ্চাশ টাকা।[১২] রেশমের কাপড় ভাল কি মন্দ বোঝবার জন্য তখন কোন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। তাই সহজ সমাধান হল ইংরেজ কোম্পানী কলকাতা ও কাশিমবাজারে মাসিক দশটাকা মাহিনায় দুইজন ধোপাকে রেখেছিলেন। তারা জল আর পাথরে পিটিয়ে বোনার ত্রুটি প্রকাশ করে দিত। রদ্দি কাপড় বাদ দেওয়া হত। কলকাতার সভাসুন্দরের নাম ছিল বৃন্দাবন।[১৩] সে বেশ অর্থবান হয়েছিল। তার বংশধররা জমিদার হয়েও 'ধোপা' উপাধি প্রথমে রেখেছিলেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সেটা বদল করেন। ধোপা যে খুব ভাল মাসিক

মাহিনা পেত তা প্রমাণ করতে হলে দেখাতে হবে যে ইংরেজ কোম্পানীতে তখন রাজমিস্ত্রি, মাঝি ও নাপিত প্রত্যেকে তিনটাকা করে পেত, ছুতোর পেত এক আনা কম এদের থেকে। দারোয়ান ও পিওনদের নির্দিষ্ট ছিল আড়াই টাকা করে মাস মাইনে। আর মশালচী, মালী বা সাধারণ ভৃত্য পেত দুই টাকা করে। এত কম মাইনে দেখে আশ্চর্য হবার কারণ নাই। দেশী লোকেদের কাছে এরা আরো কম মাইনে পেতেন। তখন এক টাকায় সাত মণ কুড়ি সের মোটা চাল পাওয়া যেত। সরু বা মিহি চাল ছিল তিন রকমের, টাকায় পাঁচ মন পঁচিশ সের, চারমণ পঁচিশ সের আর চার মণ পনের সের।[১৪] সব থেকে সেরা বাঁশফুল চালের দাম ছিল টাকায় একমণ দশ সের। একশ বছর পরে কিন্তু চালের দামই সব কিছুকে আক্রা করে দিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে টাকায় মাত্র বাইশ সের চাল পাওয়া যেত।

রেশমের ব্যবসা সম্পর্কে বলতে গেলেই ব্যবসায়ীদের কথাও বলতে হবে। বিদেশী কুঠিয়ালদের ঘিরে সর্বত্র বাঙালী হিন্দু ব্যবসায়ীরাই রেশমের যোগান দিতেন। এদের জোর কলকাতা থেকে ঢাকা পর্য্যন্ত এমন ছিল যে অহিন্দু বা নিম্নজাতের লোকদের এরা ঢুকতে দিতেন না। সরকারী ব্যবসায় মুসলমানদের দেখা যায় কিন্তু বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায় ছিল বাঙালী হিন্দুর একচ্ছত্র আধিপত্য। এমনকি গুজরাটি ও মারোয়ারি ব্যবসায়ীগণ হয় বাঙালী রেখে বেনামে ইন্দ্রজিতের মতো মেঘের আড়ালে থাকতেন নয়তো বাংলা শিখে বাঙালী হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে মিশে যেতেন। তাদের চালচলন বা কথায় ধরা কঠিন ছিল তারা কোথাকার লোক। এইভাবে ভারতের নানা জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা এসে কাশিমবাজারের ব্যবসায়ী সমাজে মিশে গেল। দীর্ঘদিন পরে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর অর্থাৎ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের পরে যখন বাঙালী ব্যবসায়ীদের দাপট কমে গেল তখন সর্বভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ক্রমে নিজেদের প্রকাশিত করলেন। তখন ধনেজনেগরবে তাঁরা মহাজন হয়েছেন। হিরানন্দ শাহু সম্ভবত মারোয়াড়ী বা গুজরাঠি যদিও বিহারী হবার সম্ভাবনাও থাকছে। ব্রজপাণ্ডা সম্ভবত উড়িষ্যাবাসী ছিলেন। উদয়চরণ ও গোরাচাঁদ শা সম্ভবত গুজরাটি ছিলেন। কিন্তু এই চারজনই ছিলেন লক্ষপতি শেঠ। সবাই ছিলেন ব্যাঙ্কার, তাদের হুণ্ডি ও তমসুকের ব্যবসা ছিল সুদূর প্রসারী।

কাশিমবাজারে যারা ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে রেশমের ব্যবসা করতেন তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে যে বাঙালী বণিকগণ দুইটি বড় সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই বিভাগ সম্পূর্ণ জাতিবাচক। একদলের নাম ছিল 'শর্মা' অর্থাৎ এরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত এই দলের প্রভাব মোটেই কম ছিল না। অন্য দলের নাম 'কাঠমা'। এ পদবী এখন অপ্রচলিত হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে খুবই সাধারণ ছিল। আজও কাশিমবাজারের সন্নিকটে 'কাঠমাপাড়া' এদের বাসস্থান নির্ণয় করে। কাঠমারা জাতিতে তাঁতী কাজেই বস্ত্র ব্যবসায়ে তাদের জন্মগত অধিকার তার ওপর কলকাতা, চন্দননগর ও শ্রীরামপুরের তাঁতী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাদের ক্ষমতাকে বহুগুণ বর্দ্ধিত করেছিল। বিশেষ কলকাতার শেঠ বসাক প্রভৃতি তাঁতী বণিকগণের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র থাকায় তাঁরা বাংলার বিরাট তাঁতী ব্যবসায়ীকুলের এক অংশ বলে গণ্য হতেন। অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ সংখ্যায় কম ছিলেন। তাঁরা এদের কোন এক দলে যোগ দিতেন। কেউ কেউ দুই দলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করতেন। এই দুই সম্প্রদায়ের ক্ষমতার লড়াইএ প্রথম পর্বে শর্মারা জয়ী হলেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে কান্ত শর্মা ইংরেজ কোম্পানীর গোমস্তা নিযুক্ত হলেন। তখন গোমস্তার কাজ খুবই লাভজনক ছিল। কেনাবেচা হলেই গোমস্তা তাঁর দস্তরি পেতেন। তাছাড়া স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে কাকে গ্রহণ করা হবে বা হবে না এই গোমস্তাই ঠিক করতেন। অনেক সময়েই কোম্পানীর খাতায় নাম তুলতে হলে গোমস্তাকে খুশী রাখতে হত। গোমস্তা তাই সহজেই নিজ আত্মীয়স্বজনদের ব্যবসায়ী সাজিয়ে নিজেই বেনামায় ব্যবসা করতেন। নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের ছাড়া আর কাউকে কোম্পানীর ঘরে ঢুকতেই দিতেন না। গোমস্তা হতে হলে তাকে তার আগে ভাল ব্যবসায়ী হতে হত। বেশ বড় ধরণের বণিক, যার যথেষ্ট যোগাযোগ আছে, সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান আছে, তাকেই কেবল কোম্পানীর গোমস্তার পদ দেওয়া হত।

দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সব বণিকই ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যবসা করবার চেষ্টা করতেন এবং বিপদে পড়তেন। কিন্তু গোমস্তাদের ক্ষেত্রে এই বিপদ সাংঘাতিক রূপ নিত কারণ কোম্পানীর ব্যবসায়কে ঠিক মতো চালানোর

দায়িত্ব ছিল তার। ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য টাকা ধার দিয়ে তিনি যেমন বিপদে পড়তেন, তেমনি অসুবিধায় পড়তেন তাদের কাছে টাকা ধার করে বা ধারে তাদের কাছ থেকে রেশম কিনে। যখন টাকার টান পড়ত তখন হিসাব মেলাতে না পারলে তাকেই জবাবদিহি করতে হত। গোমস্তা কান্ত শর্মার কপালে এমনই এক লাঞ্ছনা লেখা ছিল। দশ বছরের ওপর গোমস্তাগিরি করার পর কান্ত শর্মার নামে অভিযোগ উঠল। কলকাতার কোম্পানী কুঠির গোমস্তা বিষ্ণুদাস শেঠ ছিলেন কাঠমাদের আত্মীয়। এই সুযোগ তিনি অবহেলা করলেন না। কাগজপত্র দিয়ে প্রমাণ করলেন কান্ত শর্মার হিসাবে গরমিল। ৯ সেপ্টেম্বর ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ কান্ত শর্মা বরখাস্ত হলেন। ১৭ই নভেম্বর তার জিনিষপত্র নিলাম করে বিক্রি করা হল। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তাকে বন্দী করা হল ডিসেম্বর মাসে। বলা হল কোম্পানীর সমুদয় ঋণ পরিশোধ না করলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না।[১৫] কান্তশর্মার বিপদের শেষ থাকল না। কাঠমাদের প্ররোচনায় তার মজুত জিনিষপত্র কেউ কিনতে রাজি হলনা। তাঁর বাড়ীর মেয়েছেলেরা নয়ছয় দামে মজুত দ্রব্যগুলি বিক্রয় করে অর্থ নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় কান্ত জেল থেকে ছাড়া পেলেন ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২ আগষ্ট, ওই বছর ২২ নভেম্বর মৃত্যু তাকে চিরশান্তি দান করল।[১৬] এমন বিয়োগান্ত ঘটনাপ্রবাহ কদাচিৎ চোখে পড়ে।

কান্তশর্মার ঘটনায় ব্যতিব্যস্ত বণিকগণ দেখতে পেলেন না যে কান্তর পতন ও মৃত্যু কাঠমাদের অভিপ্রায়ে ঘটেছে। কাঠমারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি-দের বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে তাদের বিরোধিতার ফল কতো সাংঘাতিক হতে পারে। অন্যদিকে তারা কোম্পানীর কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মে কোম্পানীর খাতায় একজন 'বাজার সরকার' নিযুক্ত করা হল। নাম না থাকলেও এই ক্ষমতাশালী কাঠমা বণিকের নাম জানতে কষ্ট হয় না।[১৭] কয়েক মাসের মধ্যেই 'বাজার সরকার' কথার জায়গায় 'গোমস্তা' লেখা হতে থাকল। জানা গেল যে স্বনামখ্যাত বলিচরণ কাঠমা এইপদে নিযুক্ত হয়েছেন। ইংরেজীতে তিনি 'বালিকাঠমা' নামেই পরিচিত।

এদিকে দ্বন্দ্ব চলছে দেখে গুজরাটি বণিকরা আর এপথে চললেন না।

তারা এই সুযোগে রংপুরে গিয়ে সেখানকার তামাম রেশমের একচ্ছত্র ক্রেতা হয়ে বসলেন। দাদন ও সুদের পরিমান দুই প্রচণ্ড বাড়িয়ে দেওয়া হল। রেশমের জন্য এত বেশী দাদন এর আগে কেউ দেবার কথা কল্পনাও করে নাই। কিন্তু সময় মতো জিনিষ দিতে না পারলে সুদের হারও যা করা হল তাও কেউ কখনও শোনে নাই। বস্তুত রংপুর রেশম সম্পূর্ণভাবে গুজরাটি বণিকদের করায়ত্ত হয়ে গেল। এমনকি তার নামও পাল্টে গেল। রংপুর রেশমের কথা আর কেউ শুনল না, তার নাম হয়ে গেল গুজরাটি রেশম এবং এই সময় থেকে ওই নামেই তার পরিচিতি হল। এত প্রসিদ্ধি লাভ করল এই রেশম যে কোম্পানীর পরিচালকগণ তাগিদ দিতে লাগলেন যে যত বেশী গুজরাটি রেশম পাঠান সম্ভব যেন পাঠান হয় কারণ সব রেশমের মধ্যে এইটাই সব থেকে লাভজনক।[১৮]

তিন বছর কাটতে না কাটতেই বলিচরণের সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হল। কারণ যে অর্থ, তা বলাইবাহুল্য। বলিচরণ দেখলেন যে সুশাসনে দেশ শান্ত। বিদেশী কোম্পানীদের ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছে। চারিদিকে ব্যবসা-য়ীরা রেশমদ্রব্যাদি তৈরী করছেন। ফলে আমদানী বাড়ছে। পরস্পরের সঙ্গে রেশারেশিতে দামও স্থির হয়ে আছে। ফলে তার আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি হচ্ছে না। কোন রকমে যদি একটা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা যায় তাহলে তিনি ওই 'মালই' চড়া দামে কোম্পানীকে বিক্রী করবেন, ফলে লাভ দস্তুরী দুই বেশী আসবে। দেখা গেল সাহেবদের 'বন্ধনী'র টান খুব বেশী। এই 'বন্ধনী' হল খুব বড় চৌক সিল্কের কাপড়, কখন ছাপা, কখন সাদা বা রঙিন। এইগুলি তৎকালীন মহিলাগণ বক্ষবন্ধনীরূপে ব্যবহার করার জন্য বন্ধনী নামের সৃষ্টি হয়েছে, সাহেবরাও সেই নামই ত্রুটিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতেন, বলতেন 'ব্যাণ্ডানো'। ইওরোপ এই বন্ধনী নিয়ে ক্ষেপে উঠল। নূতন ফ্যাসান চালু হল। বড় রুমালের মতো এই বন্ধনীগুলি গলায় বেঁধে, মাথায় জড়িয়ে, হাতের কব্জি থেকে ঝুলিয়ে, দরবারে বিচরণ না করলে পুরুষরমনী নিজেদের সেকেলে বোধ করতে লাগলেন। বন্ধনী রপ্তনীর জাই বন্যা এল। বলিচরণ বন্ধনী বিক্রি করে বড়লোক হবেন স্থির করলেন। যত বন্ধনী বাজারে ছিল সব তিনি নিজে বা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে দিয়ে কিনে মজুত করলেন। ফলে বন্ধনীর অভাব সৃষ্টি হল। বাজারে বন্ধনী না

পাকার ফলে কাঠমাদের জমান বন্ধনী চড়া দামে কিনে ইংরেজ কোম্পানী রপ্তানী করতে লাগল। এই ধরণের কীর্তির দুটো অসুবিধা হয়। ফ্যাসানের খুব কাছাকাছি না থাকলে হঠাৎ মজুত মাল নিয়ে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। আর ক্রেতা বুঝতে পেরে গিয়ে সোজাসুজি বাজার থেকে কিনতে আরম্ভ করলেও বিপদের শেষ থাকে না। বলিচরণ এইরকম বিপদে পড়লেন যদিও সেটা এল একেবারে অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে। জিনিষ অবশ্য ধারে কেনারই রেওয়াজ ছিল। ব্যাপারীরা কোম্পানীর কাছে অভিযোগ করল যে তারা বলিচরণ ও তার বণিকদের কাছে যে মাল বিক্রি করেছেন তার দাম পাচ্ছেন না। কোম্পানী হিসেব করলেন, যে পরিমান মাল কোম্পানীর ঘরে এসেছে তার থেকে অনেক বেশী পরিমান জিনিষ বলিচরণ কিনেছেন। কোম্পানী এবার বলিচরণকে পুরো হিসেব দাখিল করতে বললেন। দেখা গেল দেরী করে সল্প পরিমানে দাম দিয়ে গোমস্তা কোম্পানীর নিদারুণ ক্ষতি করেছেন। দ্রব্যমূল্য সাংঘাতিক বেড়ে গেছে। কোম্পানীর লগ্নীকৃত অর্থ স্বাভাবিকের থেকে অনেক কম সুদে খাটছে। কলকাতা কাউন্সিলের টনক নড়ল। তারা হিসাব পরীক্ষা করতে লোক পাঠালেন। প্রকাশ হয়ে গেল যে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান হিউ বারকার সাহেব মোটা পয়সা খেয়ে বসে আছেন। তাকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করা হল। তিনিও কাল বিলম্ব না করে ডুপ্লে সাহেবের কাছে চন্দননগরে পলায়ন করলেন। সেখান থেকে ফরাসী জাহাজে চড়ে সাগরপাড়ি দিলেন। বারকারের বেনিয়ান, বলিচরণের আত্মীয় শচী কাঠমাকে অনেক জিজ্ঞাসা করেও বেহিসাবের হদিশ মিলল না।[১৯]

কাগজে কলমে বলিচরণকে ধরা গেল না। তার জামানত বৃদ্ধি করা হল। তার সম্পর্কে সকলের মনেই সন্দেহ লেগে থাকল। তাকে আর বিশ্বাস করা সহজ হল না। এদিকে গোলমালের সুযোগে সব জিনিষের দাম বেড়ে গেল। কাঁচা রেশম থেকে রেশমের দ্রব্যাদি, নানা ধরনের মোটা সুতি থান থেকে সব রকমের সুতি কাপড়েরও দামও বৃদ্ধি পেল। এর মধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। একদিন কোম্পানী, বণিকদের কাছ থেকে অনেক টাকার বিল পেলেন। গুদামে খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল যে সমপরিমাণ রেশম ও রেশমজাতদ্রব্য সেখানে জমা নাই। সন্দেহ হল

আদৌ জিনিষ এসেছে নাকি। কিন্তু গোমস্তা বলিকাঠমা আর কোম্পানীর ৪ নং ও ৫ নং সাহেব উইলিয়ম কেম্প ও এডওয়ার্ড আইলস্ জোর গলায় ঘোষণা করলেন যে বিলের মাল সব এসে গেছে। ২ নং ও ৩ নং সাহেব চার্লস এডামস ও এডাম ডসন জানালেন জিনিষ পাওয়া যায় নাই। প্রচণ্ড গোলমাল সৃষ্টি হল। ব্যবসায়ীদের ডাকা হল। তাদের পক্ষে জানান হল যে সব জিনিষই তারা পৌঁছে দিয়েছেন। কোম্পানীর গুদাম থেকে মাল যদি হারিয়ে যায় তাহলে তার দায়িত্ব তাঁদের নয়। কলকাতায় খবর দেওয়া হল। কুঠির প্রধান রিচার্ড আয়ারও লিখলেন 'মাল আসে নাই'। সব সাহেবরা গোমস্তা শুদ্ধ গেলেন কলকাতায় আবার ফিরে এলেন কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। এদিকে বলিচরণ জানাল যে পয়সা না পেলে ব্যবসায়ীরা আর মাল দেবে না জানিয়েছে। কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ হবার উপক্রম। কলকাতায় কোম্পানীর গোমস্তা বিষ্ণুদাস শেঠকে সমাধানের ভার দেওয়া হল। তিনি প্রথমে বলিচরণ এবং তার বন্ধুদের বোঝাবার চেষ্টা করে বিফল হলেন। এবার বলিচরণ জানাল যে প্রতি সের কাঁচা রেশমের দাম পাঁচ টাকা চার আনার জায়গায় পাঁচটাকা আট আনা করে দিতে হবে। বিষ্ণুদাস বুঝলেন যে এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নাই। তিনি শর্মাদের খবর পাঠালেন। কিছু-দিনের মধ্যেই শর্মারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কুড়িজন নূতন ব্যবসায়ীকে ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে পরিচিত করালেন। প্রথম পর্বেই তাঁরা প্রায় দুই লক্ষ টাকার কাঁচা রেশম বিক্রী করতে রাজী হলেন। দর হল সের প্রতি তিন টাকা পনের আনা। কোথায় পাচটাকা আট আনা আর কোথায় তিনটাকা পনের আনা। খবর নিয়ে কলকাতায় লোক ছুটল। পুরাতন লোকসান বাঁচাতে সেই মাসেই ইংরেজ কোম্পানী আরো চারলক্ষ টাকার কাঁচা রেশম কিনে ফেললেন।[২০] ১৩ই এপ্রিল ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস রাসেল কাশিমবাজার কুঠির প্রধান নিযুক্ত হয়ে এলেন। তিনি এসেই সর্বপ্রথম বলিচরণ কাঠমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলেন। কাঠমারা সবদিক থেকেই খুবই বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ল। নূতন বনিকগণ নিয়মিত কম দরে ব্যবসা করতে লাগলেন।

এদিকে রাজনৈতিক জগতে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে। নবাব সুজাউদ্দৌল্লার বিলাসী স্বভাব সমস্ত নবাবী ক্ষমতা তার কর্মচারীদের উপর

বিস্তৃত করেছে। বিশেষ হাজী আহমদ ও আলিবর্দী খাঁর ক্ষমতা আকাশচুম্বী হয়ে গেছে। ক্ষমতা বৃদ্ধির সূত্র ধরেই হয় সম্পদবৃদ্ধি। নবাবী কর্মচারীদের বিশেষ হাজী আহমদ ও আলিবর্দীদের সম্পদ খুবই বৃদ্ধি পেল। জগৎশেঠের ক্ষমতা ও সম্পদ সহজেই বাংলার সুবাদারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

কাশিমবাজারকে কেন্দ্র করে কম সম্পদ বৃদ্ধি হল না। বিদেশী কোম্পানী-গুলিও এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠলেন। একটু মাঝামাঝি পর্যায়ের ব্যবসায়ীর পক্ষে এই সময় তিনলক্ষ টাকা জামিন দেওয়া খুব কঠিন কাজ ছিল না। গুজরাটি বণিকগণ এই সময় ভগবান নেমিনাথের মন্দিরশীর্ষ ষোল মণ সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেন। বলাবাহুল্য যে এই সম্পদ বৃদ্ধি সবসময়ে প্রচলিত পথে হত না। জগৎশেঠের বাড়িকে কেন্দ্র করে রাজনীতি চর্চার শুরু হল এই সময় থেকে। আরো দুইটি ঘটনা ঘটল। এই সময় দুইজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করলেন যাঁরা ভারত ইতিহাসে কায়েমী আসন লাভ করেছেন। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে) বিহারের পাটনা সহরে জন্মালেন নবাব আলিবর্দীর দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ যিনি পরবর্তীকালে সিরাজদৌল্লা বা সিরাজ-উ-দৌল্লা (সাম্রাজ্যের প্রদীপ। সিরাজ কথারই গ্রাম্য প্রচলিত শব্দ, চেরাগ মানে বাতি।) নামে খ্যাত হন। আর সুদূর ইংল্যাণ্ডের এক পল্লী অঞ্চলে জন্মালেন ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস, কালের অমোঘটানে তাঁকে প্রথমে কাশিমবাজার ও পরে ভারত ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। প্রস্তুতিপর্বে ভবিষ্যতের ইতিহাসের শেষ হতেই ১৩ মার্চ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজাউদৌল্লা পরলোকগমন করলেন।

পিতার মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ বিনা বাধায় নবাব হলেন। দিল্লী থেকে সুবাদারীর মনোনয়ন পত্রও এসে গেল। কিন্তু তিনি শাসনকার্য্য চালাতে অপারগ হলেন। তিনি ছিলেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিলাসী ও অমনযোগী। দেওয়ান আলমচাঁদ, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ের লোক বলেই আর সহ্য করতে পারলেন না। নবাবকে সতর্ক করতে গিয়ে তিনি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলেন। প্রকাশ্য দরবারে নবাব হাজী আহমেদকে সুজাউদৌল্লার বিলাস রমনী সংগ্রাহক বলে অপমান করলেন। নবাব বুঝিয়ে দিলেন যে ক্ষমতা অধিকারের জন্য হাজী আহমদ তাঁর স্ত্রী কন্যাদেরও মৃত নবাবের ভোগে দিতে দ্বিধা করেন নাই। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের পৌত্রবধূকে জোর

করে ধরে নিয়ে যাবার ঘটনা সত্য হবার সম্ভাবনা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের অপমান চারিদিকে অসন্তোষ ছড়িয়ে দিল। তারপর নবাব যখন প্রবীণ হাজী আহমেদকে পদচ্যুত করলেন তখন নবাবী ওমরাহদের বিচলিত হবার কথা। ষড়যন্ত্র বসল জগৎশেঠের আবাসে। বিহারের শাসনকর্তা নবাব আলিবর্দী খাঁকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করবার জন্যে ডাকা।[২১]

সরফরাজ খাঁর ভাগ্যাকাশে আরো মেঘ জমে উঠল। নাদিরশাহ দিল্লী দখল করে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করলেন। সব সুবাদারদের হুকুম করলেন তাঁর নামে টাকা ছাপাতে এবং মসজিদে প্রতি শুক্রবার তাঁর নামে খুতবা পাঠ করতে। তদনুযায়ী সরফরাজ খাঁ 'নাদির শাহ দিল্লীর সম্রাট' এই নাম তাঁর মুদ্রায় ক্ষোদিত করলেন। এই বছরই কিন্তু নাদিরশাহ দিল্লী ত্যাগ করে গেলেন এবং মহম্মদশাহ আবার দিল্লীতে বাদশাহ হলেন। সরফরাজ খাঁ অনধিকারীর নামে তনখা বার করে বাদশাহের বিরাগভাজন হলেন। একথা সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ল যে কেউ যদি পানাসক্ত, আলস্য পরায়ণ, হীনচরিত্র সরফরাজ খাঁকে অপসারিত করেন তাহলে বাদশাহ তাকেই সুবাদার মনোনীত করতে দ্বিরুক্তি করবেন না। কারণ সরফরাজের নীতি হীনতায় দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছিল। কর্মচারীদের অপমান ও বরখাস্ত শাসনকার্যে সঙ্কট এনে দিয়েছিল যার ফলে বাদশাহের রাজস্ব প্রাপ্তি একান্ত অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে অমাত্যগণ শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বলে আশঙ্কিত হলেন। তারা নিজেদের ক্ষমতা হানিতে ক্ষুব্ধ হলেন এবং ভবিষ্যতে সম্পদহানির সম্ভাবনায় নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।[২২] কুড়ি হাজার পদাতিক, দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, কুড়িটা কামান আর তিন হাজার অশ্বারোহী আফগান সৈন্যের পুরোভাগে আলিবর্দী খাঁ বাংলায় প্রবেশ করলেন। বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে নবাব স্বয়ং বিদ্রোহীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেলেন। তারপর গিরিয়ার উন্মুক্ত প্রান্তরে ৯ এপ্রিল ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে, ১১৪৬ সালের চৈত্রের শেষ সন্ধ্যায় নবাব সরফরাজ খাঁ বীরের মতো যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করে নিলেন। যে নবাবের জীবনে কোন স্থৈর্য্য ছিল না, যুদ্ধক্ষেত্রে অসিহস্তে শেষ শয্যা গ্রহণ তাঁকে মহিমান্বিত করেছে।[২৩] জলিমাসিংহের গল্প সরফরাজের এই কীর্তিকেই শ্রদ্ধা জানান। বাগুলী নদী আর ভারতের একমাত্র ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি এই যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছে।

সরফরাজ তো দেহ রাখলেন কিন্তু নাদিরশাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা নিয়ে বিপদে পড়লেন জগৎশেঠ, কারণ জনসাধারণ ওই মুদ্রা গ্রহণ করতে রাজী হল না। দিনে দিনে ওই মুদ্রা টাকশালে জমতে লাগল। ইংরেজ কোম্পানী জগৎশেঠের কাছে টাকা ধার করতে গিয়ে জানলেন যে ওই নাদিরশাহের নামাঙ্কিত টাকা ছাড়া অন্য কোন টাকায় ধার দেওয়া হবে না। খুবই চিন্তার কথা। কারণ পূর্ণ মূল্যে যে টাকা তারা নেবেন, বাজারে তার বিনিময় হার কম, অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী লোকসান। দারুণ অর্থকষ্ট থাকা সত্ত্বেও তারা নাদিরশাহের নামাঙ্কিত টাকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে পনেরশত কামিনীর অধিপতি নবাব আলা-উ-দ্দৌল্লা হায়দার জঙ্গ সরফরাজ খাঁ হত হয়েছেন। বাংলার নূতন সুবাদার হয়েছেন নবাব আলিবর্দী খাঁ মহবৎ জঙ্গ বাহাদুর। কাজেই জগৎশেঠকে সমস্ত নাদিরশাহী মুদ্রা গলিয়ে নূতন নবাবের নামে মুদ্রা অঙ্কন করতে হল। একদিকে লাভ করতে গিয়ে জগৎশেঠ অন্যদিকে লোকসানের খাতা খুললেন। এই খাতা আর বন্ধ হল না।

ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে ব্যবসায়ী রাধাকৃষ্ণ নন্দী হিসাব করতেন। একদিন ভাবলেন যে তিনি যখন ইংরেজ কোম্পানীর কুঠির নিকটতম প্রতিবেশী তখন ওদের সঙ্গে ব্যবসা করলে মন্দ হয় না। তার বন্ধু শর্মা বণিকগণ উৎসাহ দিল। নূতন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগেই ইংরেজ কোম্পানীর খাতায় নাম পত্তন করে ফেললেন। পৈতৃক রেশম ব্যবসায়ও তার ভালই চলছিল। তাই কোম্পানীকে নানা রেশমের জিনিস দিতে তাঁর কোন অসুবিধা হল না। যখন কাঠমারা একসের কাঁচা রেশমের দাম চাইল পাঁচটাকা আটআনা আর শর্মারা সেই রেশম দিতে রাজী হলেন তিনটাকা পনের আনায়, তখন রাধাকৃষ্ণ সবাইকে টেক্কা দিয়ে তিনটাকা বার আনা দরে কাঁচা রেশমের যোগান দিলেন। একাই বিক্রি করলেন ত্রিশ মন রেশম।[২৪]

অন্যান্য বস্তুও যোগান দিলেন তিনি ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে,[২৫] তাদের পরিচয় দেওয়া হল।

গাড়া	৩৬ হাত × ২ ১/৪ হাত	২০০০ খণ্ড	৪৩০০	টাকা
ঐ	৩০ হাত × ২ ১/৪ হাত	১০০০ ,,	১৬৬২-৮-০	,,
জামাওয়ার	৩০ হাত × ১ ৩/৮ হাত	৬৬ ,,	১৪৫২	,,
ঐ	২০ হাত × ২ হাত	৩৪ ,,	৫৪৪	,,
সরল টাফেটা	২১ হাত × ২ ১/৮ হাত	১৫০ ,,	৭৮৭-৮-০	,,
দাগটানা টাফেটা	২১ হাত × ২ ১/৪ হাত	১৫০ ,,	৮৬২-৮-০	,,
সুতি রুমাল		১০০ ,,	৬১০-০	,,
উত্তম শ্রেণীর বন্ধনী		১০০ ,,	২৭৫	,,
রেশমের লুঙ্গি রুমাল		৮০ ,,	৩৪০	,,
চুনাদার		২০ ,,	২৪০	,,
সাধারণ বন্ধনী		২০০ ,,	৪৫০	,,
		৩৯০০ ,,	১১,৫১৩-৮-০	টাকা

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও যে ব্যবসায় ঠিক মতো চলেছিল তাতে আধুনিককালের লোকেদের অবাক হবারই কথা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে বারেবারে দেখা গেছে যে যুদ্ধ ও ব্যবসায় একই সঙ্গে চলেছে। কেনাবেচা বা কৃষিকাজের সঙ্গে যেন রাজনৈতিক জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। সরফরাজ খাঁ গিরিয়ার প্রান্তরে যুদ্ধ করে নিহত হলেন সেটা যেন এক ভিন্ন জগতের ঘটনা। কোন ব্যবসায়ী এতটুকু সময়ও সে ভাবনায় অতি-বাহিত করলেন না। পরবর্ত্তী কুড়ি বছরেও এই মনোভাবের পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে। ইংরেজ কোম্পানীর এই সময়ের কাগজপত্র পড়লে বিশেষ কাশিম-বাজারের ব্যবসায়ের হিসেবপত্রের মধ্যে খুঁজলে যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের কোন খবরই বড় হয়ে দেখা দেবে না। বরঞ্চ রেশমের লুঙ্গী রুমাল আর ছাপা বন্ধনী রপ্তানী করার তাগিদের কথাই নজরে আসবে।

চার

গিরিয়ার বিজয়ের পরে আলিবর্দী খাঁ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন। কেউ তাকে কোথাও কোন বাধা দিল না। বলাবাহুল্য রাজ্যের প্রায় সব প্রধানব্যক্তিই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন। জগৎশেঠ কোন বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন এমন প্রমান পাওয়া না গেলেও নবাবের মৃত্যুতে তিনি যে লাভবান হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাদশাহের কাছ থেকে আলিবর্দী খাঁর পক্ষে সুবাদারী ক্রয়ও তাঁর কীর্তি বলেই সন্দেহ করা হয়। নবাব আলিবর্দী খাঁ মহবৎজঙ্গের দরবারে তাই জগৎশেঠ ফতেচাঁদ হলেন সব থেকে সম্মানিত ব্যক্তি। নবাব স্বয়ং জগৎশেঠের কাছে টাকা ধার করায় তাঁর ক্ষমতাকে নবাবের থেকে বেশী মনে করা হতে লাগল। এই সব কারণে সরফরাজ খাঁর পতনে জগৎশেঠের নেপথ্য হস্তক্ষেপ সন্দেহ করা হয়ে থাকে। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যেই হাজী আহমদ স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। আলিবর্দী খাঁ শিথিল শাসনব্যবস্থাকে শক্ত হাতে টেনে ধরলেন। নওয়াজেস মহম্মদ (বড় জামাই) ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। তাকে নায়েব দেওয়ানী ও নিজামীর পদ দেওয়া হল। হোসেনকুলি খাঁ তার সহকারী নিযুক্ত হলেন। সৈয়দ আহমদ খাঁকে (মেজজামাই) পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল। প্রিয়তম কন্যা আমিনার স্বামী জৈনুদ্দিন আহমদ খাঁ হৈবৎজঙ্গ (ছোটজামাই) পাটনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। তাঁকে নায়েব দেওয়ানী ও নিজামীব পদও দেওয়া হল। দেওয়ান আলমচাঁদের এরমধ্যে মৃত্যু হয়েছে তাই আলিবর্দী তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির দেওয়ান চুঁচুড়ার কায়স্থ কুলতিলক জানকীরামকে পাটনায় জৈনুদ্দিনের দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। সবার প্রতি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে তিনি অতি সহজেই সরফরাজপক্ষীয়দের বশীভূত করে ফেললেন। পারলেন না উড়িষ্যার শাসনকর্তা সরফরাজ-ভগ্নিপতি রুস্তম জঙ্গকে। তার সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দিলেন ময়ূরভঞ্জের ও খুরদার নরপতিদ্বয়। সারা বছর ধরে যুদ্ধ করেও নবাব উড়িষ্যাকে আয়ত্তে আনতে পারলেন না। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ শুরু হতেই মারাঠাদস্যুর অশ্বক্ষুরধ্বনী আকাশবাতাস প্রকম্পিত করল। সুরু হল বর্গীর হাঙ্গামা।

আলিবর্দীর কিন্তু এর মধ্যে শত্রুবৃদ্ধি হয়েছে। যুদ্ধের খরচ অনেক

হওয়ায় তিনি জমিদারদের ওপর রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য চাপ দিলেন। বাংলার বৃহত্তম জমিদার বাট লক্ষ টাকা আয়ের নাটোর রাজবংশ দীর্ঘদিন রাজস্ব বাকী ফেলেছিলেন। একাধিক তাগিদ দিয়ে কোন ফল না পেয়ে ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব রাজা রামকান্তকে জমিদার পদ থেকে খারিজ করে দিয়ে ওই বংশের বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকে নাটোর রাজবংশের অধিকর্তা ও রাজস্বের জামিনদার ঘোষণা করলেন। নবাব আদেশে সৈন্যদল গিয়ে দেবীপ্রসাদকে বহাল করে এল। রাজা রামকান্ত আর রাণী ভবানী ছুটে এলেন মুর্শিদাবাদে। ডেকে আনলেন বৃদ্ধ দেওয়ান দয়ারাম রায়কে। তারপর বহু আবেদন নিবেদন করে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং জগৎশেঠের আনুকুল্যে আবার স্বপদ ফিরে পেলেন দীর্ঘ চারমাস পরে। দয়ারামের মধ্যস্থতায় দেবীপ্রসাদ কিছু সম্পত্তি পেয়ে তখনকার মতো সন্তুষ্ট হলেন বটে কিন্তু এই ভ্রাতৃবিরোধ অতিক্রত নাটোরের পতন সূচনা করল।[১]

নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর স্বভাবটাই একটু ধীরস্থির। নিজে পণ্ডিত কাজেই নদীয়ায় যেমন সংস্কৃত শিক্ষাকে প্রচলিত রেখেছেন সেখানকার পণ্ডিতগণও তার পক্ষপুট ছায়ায় নির্বিঘ্নে বসবাস করেন। অবাধে চলে বিদ্যাচর্চা তথা সংস্কৃত চর্চা। নানা কবি ও গায়ক আশ্রয় পেয়েছেন রাজার দরবারে। ভারতচন্দ্র তাদের মধ্যে প্রধান। সব থেকে শ্লাঘার কথা সমস্ত হিন্দু বাঙালী তাঁকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলে মনে করে। রাজস্ব বাকী একান্তই সাধারণ ঘটনা তাঁর কাছে। কিন্তু নূতন নবাব আলিবর্দী খাঁ সে সব কথা শোনেন না, আবার সাংঘাতিক ভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করে জমা দেবার জন্য মাত্র কয়েকদিন সময় দেয়। অবশেষে যা ঘটবার তাই ঘটল। নবাবী কর্মচারী রাজাকে অপমান করল। রাজাও তার সমুচিত জবাব দিলেন। নবাবী কর্মচারী নবাবকে গিয়ে খবর দিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেছেন। এল সৈন্য সামন্ত কৃষ্ণনগরে। বন্দী করে নিয়ে গেল রাজাকে মুর্শিদাবাদে। সমস্ত হিন্দু সমাজ উদ্বেলিত হল। সরফরাজের মৃত্যুতেও যা ঘটে নাই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দী করাতে তাই হল। সাধারণ লোক ভীত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নবাবের জনসাধারণের মেজাজ বুঝতে দেরী হল না। তিনি রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে আবার সসম্মানে তাঁকে

নদীয়াতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ হল হিন্দু সমাজ। তাই যখন মারাঠা আক্রমণের খবর এল তখন তারা আনন্দিত হয়ে উঠল। তারা চাইল যে মোগল রাজত্বের পতন হোক আর সে জায়গায় হিন্দু রাজত্বের সূচনা হোক। রটল ভুবনেশ্বরের শিবমন্দির নষ্ট করায় মারাঠারা নবাব আলিবর্দীকে শাস্তি দিতে এসেছে। আরো গুজব ছড়াল যে মারাঠা শাসনের পত্তন হলে মারাঠারাজ শাহু কথা দিয়েছেন যে সুবা বাঙলায় কৃষ্ণচন্দ্রই থাকবেন তার প্রতিনিধি। মহাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ছত্রে ছত্রে হিন্দুবাঙালীর সেই আশা আজও জীবন্ত হয়ে আছে।[২]

কেবল শাসনব্যবস্থা নয়, নবাবী ফৌজকেও আলিবর্দী খাঁ ঢেলে সাজালেন। একাজে তাঁর থেকে যোগ্যব্যক্তি তখন সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। এই কাজে তার সুযোগ্য সহকারী হলেন তারই অনুগত যুবক ও তাঁর বৈমাত্রেয় ভগ্নিপতি মীরমহম্মদ জাফর আলি খাঁ যিনি মীরজাফর নামে বাংলার ইতিহাসে কুখ্যাত হয়েছেন। ইনি বক্সী নিযুক্ত হলেন। সৈন্য-বাহিনীকে নিয়মিত বেতন দেওয়া হল এঁর প্রধান দায়িত্ব। কালে মীরজাফর নবাবের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পান এবং শক্তিতে ও বুদ্ধিতে নবাবের বিশ্বাসকে অটুট রাখেন।

কাশিমবাজারের জনজীবন শান্তস্নিগ্ধ গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। শান্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করতে এখানকার অধিবাসীরা অভ্যস্ত হয়েছেন। এই সময়ে কাশিমবাজারের জনসংখ্যা এক লক্ষ। ব্যবসায়ী সহর হবার জন্য বহু বণিক, মহাজন, স্রফ ও গদীওয়ালা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেছেন। অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগই হিন্দু, তাদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব খুব বেশী। কেনাবেচার ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই কীর্তন শোনা যায়, মৃদঙ্গ আর কর্তালের ধ্বনী ব্যবসায়ীদের উন্মনা করে দেয়।[৩] সন্ধ্যা আগমনের আগেই ভাগবত পাঠ বা চৈতন্যচরিতামৃত শোনবার জন্য কারু চণ্ডীমণ্ডপে অথবা মন্দিরে অনেকেই জমায়েত হতেন। জমায়েত হতেন মহোৎসব উপলক্ষে। একদিকে বাণিজ্যের প্রসার, অর্থের লেনদেন, ব্যবসার লাভ, অন্যদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত নাম সংকীর্তন করে কাশিমবাজার ঐহিক ও পারত্রিক দুই বিষয়েই সমান দৃষ্টি দিয়েছিল। মাঝে মাঝে বিপদ আসত।

১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মার্চ ইংরেজ কুঠিয়াল আঙ্গে (Ange) মুর্শিদাবাদে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের কথা লণ্ডনের ডিরেক্টরদের জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এই আগুনে মুর্শিদাবাদের পাকা বাড়ি ছাড়া আর সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উত্তরে লণ্ডন থেকে জানান হয়েছে, যে সব কাঠে তেলের ভাগ বেশি সে সব কাঠ যেন গৃহ নির্মানে ব্যবহার করা না হয়।[৪] কিন্তু এই উপদেশ স্বত্বেও আগুনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নাই। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে লণ্ডনে লেখা এক পত্রে জানা যায় যে আগুনে কাশিমবাজারের ফ্যাক্টরির সৈন্য থাকার ব্যারাক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেটি মেরামতের জন্য কলকাতা থেকে সেগুন কাঠ পাঠান হয়।[৫]

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল ইংরেজরা মারাঠা আক্রমণের খবর লণ্ডনকে জানাতে গিয়ে লিখেছে, "আমরা কাশিমবাজারের স্যার ফ্রান্সিস রাসেলের কাছ থেকে গত ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল খবর পেয়েছি যে কাশিম-বাজারে মারাঠা আক্রমণ হতে পারে। বর্ধমান, রাধানগর ও অন্যান্য জায়গা থেকে আমাদের ব্যবসায়ীরা এই খবরই এনেছে"।[৬] এই খবর পাবার পরই কলকাতা থেকে এক শক্তিশালী সৈন্যদল কাশিমবাজার রক্ষার জন্য পাঠান হল।[৭] মারাঠাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য ফ্যাক্টরির চারদিকের প্রাচীরকে উঁচু করা হল। চারকোণায় বড় কামান বসাবার উপযুক্ত করে চারটি গম্বুজ তৈরী করা হল। তারপর তার ওপর ভারী কামান তুলতে এসে গেল ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। লণ্ডনে চিঠি লেখা হল যে কুঠি এখন দুর্ভেদ্য।[৮] তবে ভাবনা গেল না। মারাঠাদের কীর্তিকলাপের গল্প হৃদকম্প সৃষ্টি করল। মারাঠা আক্রমণের ভয় ছাড়াও নবাবের নজরানা দাবীর ভয় কম ছিল না। আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে নবাব প্রতি গম্বুজের জন্য আলাদা নজরানা দাবী করবেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দেও নবাবী সমন না পেয়ে ইংরেজরা অবাক হল। লণ্ডনে লিখে পাঠাল যে যুদ্ধের সময় এই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নবাব অনুমোদন করেছেন বলেই আপাতত নজরানা চাওয়া হচ্ছে না। তবে যুদ্ধ শেষ হলে, শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল্য হিসাবে সম্ভবত । দাবী করা হবে।[৯] কিন্তু যুদ্ধ শেষ সহজে হল না। নজরানা পরে।

১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতিবছর মারাঠা দস্যুরা বাংলায় আসতে শুরু করল। নবাব স্বয়ং বর্গীদমনের ভার নিলেন। বার বার যুদ্ধে হেরে গিয়েও মারাঠা দস্যু দমিত হল না। সাময়িক শান্তির পর আবার গ্রাম নগর আক্রমণ করে লুন্ঠন, ধর্ষণ, অত্যাচার, অপহরণ শুরু করত। বর্গীর হাঙ্গামা বাংলা-বিহারের জাগ্রত বিভীষিকা। নবাব কখনও তাদের অর্থ দিয়ে শান্ত করতেন, কখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন। শেষে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দী খাঁ বর্গীর হাঙ্গামা থেকে মুক্তি পাবার জন্য এক মতলব আঁটলেন। রাজা জানকীরামকে এই কীর্ত্তির হোতা এবং মীরজাফরকে প্রধান কর্মকর্তা বলা যেতে পারে। মানকড়ে নবাব শিবির স্থাপন করে রঙিন পতাকা উড্ডীন করা হল। সময় ৩০ মার্চ, চৈত্রের আর এক সর্বনাশী সন্ধ্যা। নবাবের সঙ্গে আলোচনা করতে এলেন মারাঠা সেনাপতি ভাস্কররাম কোলহাতকার যিনি বাংলা নাটকের গুণে ভাস্কর পণ্ডিত নামেই সমধিক পরিচিত। তার সঙ্গে এলেন আরো বাইশজন সৈন্যাধ্যক্ষ। কারণ তাঁরা আশা করেছিলেন যে গত বছরের মতো এবারও নবাব আলিবর্দী বাইশ লক্ষ টাকা দিয়ে সন্ধি ক্রয় করবেন। অর্থের ব্যাপারে মারাঠা নায়কগণ কেউ কাউকে বিশ্বাস করতেন না। পাছে সুযোগ পেয়ে ভাস্কররাম নিজের ভাগে বেশী টাকা রাখেন তাই বাইশজন সৈন্যাধ্যক্ষই নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অংশীদার হতে এলেন। মানকড়ের নবাবী শিবিরের বর্ণনা ও ইতিহাস মুসলমানী ও মারাঠা ইতিহাসে অপূর্ব নাটকীয় রচনা। তাতে লেখা হয়েছে যে আলোচনার মধ্যপথে নবাব আলিবর্দী তাঁর শিবির থেকে সাময়িকভাবে বহির্গত হওয়া মাত্র শিবিরে লুক্কায়িত বীর মুসলমান যোদ্ধাগণ ভাস্কর পণ্ডিত সহ বাইশজন সৈন্যাধ্যক্ষকে হত্যা করলেন।[১০] এই হত্যালীলার নায়ক মীরজাফর এবং সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা আর মীরকাশিম নামে এক সাহসী ও উচ্চাভিলাষী তরুণ যুবক। এই হত্যাকাণ্ডে তার বীরত্ব দেখে মীরজাফর তাকে নিজের জামাতা করে ফেললেন।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বর্গীদের আগমন সংবাদ দাবাগ্নির মতো কাশিমবাজারে এসে পৌছল। বীরভূম ধ্বংস করে আটহাজার অশ্বারোহী কাশিমবাজার অভিমুখে ছুটে আসছে, একথা নিমেষ মধ্যে রাষ্ট্র হল যে,

মারাঠা দস্যুরা কেবল লুণ্ঠন ও অত্যাচার করে না সুযোগ পেলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আটক করে অর্থ আদায় করে। স্ত্রীলোক মাত্রেই উপভোগের সামগ্রী। জাতিকুলমান নির্বিশেষে তাদের উপর দলবদ্ধভাবে অত্যাচার করা হয়। যুবতী অথবা বৃদ্ধা কেউ নিষ্কৃতি পায় না। এমন কি ধর্মস্থান বা দেবালয়কে কলুষিত করেও বর্গীরা তাদের বাসনা চরিতার্থ করে। একমাসের মধ্যে পলায়ন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। প্রভাবশালী একটি ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীকে কাশিমবাজারে দেখা যেত না। মানুষের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব কিন্তু জগৎশেঠের মহিমাপুরের বাড়ি ও টাকশাল শুধু প্রকৃতিতে নয় আকৃতিতেও বিরাট। যে মাসে নবাবের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে মারাঠা দস্যুরা জগৎশেঠের গদী লুঠ করে দুই কোটিটাকা (মতান্তরে তিন লক্ষ) নিয়ে চলে গেল। তার সঙ্গে নিয়ে গেল নানা রকমের মূল্যবান খুচরা সামগ্রী।[১১] কাশিমবাজার কাউন্সিল ৭ জুন কলকাতায় পত্র দিয়ে সব খবর জানালেন। আর লিখলেন যে বর্গীর হাঙ্গামার পর কাশিমবাজার ও তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে এমনকি রাজধানী মুর্শিদাবাদেও নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। কুঠির নিকটবর্ত্তী একাধিক চুরি ডাকাতির প্রতি নবাবের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।[১২] মুহূর্ত বিলম্ব না করে নবাব আলিবর্দী বর্গীদের পেছনে ধাওয়া করে তাদের কাটোয়া পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দিলেন। সলিমুল্লা লিখেছেন, দেশের সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাদের স্ত্রীলোক ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য গঙ্গার পূর্ব পাড়ে (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে) দলে দলে সরে গেলেন। গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে) মারাঠাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য নবাব ভাল করে প্রস্তুত হলেন।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামা আবার শুরু হল। জগৎশেঠ এবার আগে থাকতেই সাবধান হয়েছেন। টাকাকড়ি, সম্পদ, বাড়ির মেয়েদের এমনকি ছোট ছেলেপিলেদের পর্য্যন্ত ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং নবাব আলিবর্দী ও ভ্রাতা হাজি আহমদও অর্থ ও সম্পদ ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর বর্গীদের একটা দলকে অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করে অন্য দলকে যুদ্ধে পরাজিত করলেন। গঙ্গারামের বিবরনী হতে বর্গীর অত্যাচারের প্রত্যক্ষ-দর্শী ভয়াবহতা জানতে পারা যায়। বর্গী কথার উৎপত্তি মারাঠা 'বাগির' শব্দ থেকে। সব থেকে নিম্নতম মান ও বেতনের সৈন্যদের ওই নামে ডাকা হত। অতি সামান্য বেতনের বিনিময়ে তারা সৈন্য হতেন কারণ লুণ্ঠন

ও ধর্ষণের অবাধ স্বাধীনতা তাদের দেওয়া হত। ফেব্রুয়ারী মাস পড়তে না পড়তেই হাঙ্গামা শুরু হল। নবাবও যুদ্ধসাজে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ৩০ মার্চ চৌরিয়াগাছিতে (বহরমপুর থেকে দশ মাইল দূরে বর্তমান নাম 'সারিগাছি' নিঃসন্দেহে পুরাতন নামের রূপান্তর। যেমন ব্রহ্মপুর থেকে বহরমপুর।) ভাগিরথীর পশ্চিমপাড়ে নবাবের সঙ্গে মারাঠা নায়ক শ্রেষ্ঠ পেশোয়া বালাজী বাজীরাওএর সাক্ষাত হয়। নবাব বার্ষিক বাইশলক্ষ টাকা চৌথ হিসাবে দিতে রাজী হলেন। পেশোয়া তখন ঘোষণা করলেন যে নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলাকে সামলাবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন। প্রতিশ্রুত হলেন যে রঘুজীর দলবল আর বাংলায় এসে উপদ্রব করবে না। পেশোয়া ও নবাব উভয়েই জানতেন যে কেবল অনুরোধ শোনবার লোক রঘুজী ভোঁসলা নন। তাই কাটোয়া থেকে বীরভূম যাবার পথে পেশোয়া ও নবাবের যৌথবাহিনী রঘুজীকে আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিল। এই বছর জুন মাস থেকে পরের বছর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নয় মাসের ক্ষণস্থায়ী শান্তি বাংলায় অনুভূত হল।[১৩]

পর বৎসর কিন্তু মারাঠারা আবার এল। একদল নয়, দুই দলই তাদের অত্যাচারী বাহিনী দিয়ে বাংলার বুকে হাহাকার তুলল। চাষবাস ফেলে চাষা পালিয়ে গেল। বণিক পালাল ব্যবসায় ফেলে। ইতিমধ্যে পেশোয়া ও ভোঁসলার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে কাজেই নবাবের সঙ্গে সন্ধির সর্ত হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে তারা আবার এলেন সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাকে শ্মশান করে দিতে। নবাব বুঝলেন যে বাইশলক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি একটির জায়গায় দুইটি মারাঠা বাহিনীর সামনে লুণ্ঠন ও ধর্ষণের পথ উন্মুক্ত করেছেন। দিল্লীর কাছে সাহায্য চাওয়া বৃথা কারণ দিল্লীর বাদশাহ মারাঠদের এই লুণ্ঠন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল। বলা চলে তারই সম্মতিতেই মারাঠাদের বাংলায় অভিযান। সেকথা পরে বিশদ ভাবে বলা যাবে। আলিবর্দী নিজের মন্ত্রণা পরিষদে ও বাহুবলের ওপরই একমাত্র নির্ভর করলেন। পেশোয়ার সঙ্গে গত বছর যে দিনে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়েছিল এ বছরেও সেই দিনটাই ধার্য্য করলেন ভাস্কররাম কোলহাতকার আর বাইশ জন মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষর সঙ্গে সাক্ষ্যাত করবার জন্য। স্থান এবার মানকড়। ভাস্কররাম আর তার সহকর্মীদের হত্যা করায় বাংলায় জনগণ খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন সন্দেহ নাই। তাদের চোখে এই নবাবের সম্মান বহুগুণ

বর্ধিত হয়ে গেল। কিন্তু মারাঠা আক্রমণ বন্ধ হল না। প্রতি বছর নিয়মিত মারাঠা আক্রমণ প্রায় কালবৈশাখীর মতো বাংলার আবহাওয়ার অন্তর্গত হয়ে গেল। অবশেষে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি স্থায়ী হল। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী নবাব বাৎসরিক বারলক্ষ টাকা দিতে রাজী হলেন। সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ, সুবর্ণরেখা নদী পর্য্যন্ত, মারাঠা অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হল। উড়িষ্যা পাবার ফলে ভারতে মারাঠা কর্তৃত্ব আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হল।

নবাব কিন্তু যুদ্ধের খরচ জগৎশেঠ ও বিদেশী কোম্পানীগুলির কাছ থেকে আদায় করতে একটুও লজ্জিত হলেন না। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দেই বিদেশী বণিকদের কাছে ত্রিশলক্ষ টাকার দাবী হল। ইংরেজরা পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার প্রস্তাব করলে নবাব বলে পাঠালেন যে আগে ইংরেজ কোম্পানীর চার পাঁচ খানি জাহাজ ছিল। এখন তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশখানা জাহাজ বন্দর কাশিমবাজারে যাওয়া আসা করে। তার ওপর নবাব তাদের কলকাতা সহরের রক্ষক, সুতরাং অন্তত পক্ষে পঁচিশলক্ষ টাকা কেবল ইংরেজ কোম্পানীর কাছে তার যুক্তিসঙ্গত দাবী। কলকাতা কাউন্সিল এবার একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেন। অবশেষে কাশিমবাজারের কুঠিয়াল জন ফর্স্টারের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত নবাবী দাবী ও ইংরেজ কোম্পানীর দেয় নজরানার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করা হল। তদনুযায়ী ১৬ সেপ্টেম্বর ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাকে জানান হল যে নবাব শেষ পর্য্যন্ত সাড়ে তিনলক্ষ টাকা নিতে সম্মত হয়েছেন এবং বিনিময়ে এক পরোয়ানা জারী করে কোম্পানীর হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও বিভিন্ন আড়ঙ্গের বাণিজ্যাধিকার স্বীকার করে নেবেন। টাকা দেওয়া হলে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ স্বয়ং এই পারোয়ানা কাশিমবাজারে এসে কুঠীর প্রধানের হাতে অর্পন করেন। নবাব আলিবর্দী খাঁ এই অর্থ পেয়ে খুবই খুশী হন, কারণ তিনি কলকাতা কাউন্সিলের প্রধানের জন্য শিরোপা ও একটি হাতি উপহার দেন। কলকাতা কাউন্সিল এই উপহারের প্রতিদানে নবাবকে একটি আরবী ঘোড়া যৌতুক দিলেন। নবাব তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হলে কোম্পানীর সৈন্য সাহায্যের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী তাতে রাজী হলেন না।[১৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই সময়ে ইংরেজ কোম্পানীর নবাবের সঙ্গে দরাদরির ক্ষমতা এসেছে। কেবল তাই নয়। ইংরেজদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা

সম্পর্কে নবাব অবহিত ছিলেন, তাই সৈন্য সাহায্যের প্রস্তাব। জগৎশেঠের ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে সদ্ভাবের খবরও সবাই জানতেন। এই সখ্যতার প্রয়োজন ছিল। মারাঠা ভীতিতে ইংরেজদের ব্যবসা ভাল না হওয়ায় জগৎশেঠের কাছে তাদের নিয়মিত টাকা ধার করতে হত। নবাবও এই সময় তার টাকার প্রয়োজনে কোন শেঠ বা বড় ব্যবসায়ীকে অব্যাহতি দেন নাই। জগৎশেঠের কাছে তিনি বার বার টাকা নিয়েছেন। অবশেষে জগৎশেঠও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন বললেন, 'এদেশে এখন নবাব বা ভগবান কিছুই নাই। কোন নিয়মশৃঙ্খলা দেখা যায় না। আছে শুধু লোভ, শুধু টাকা পাবার তৃষ্ণা'।[১৫]

বর্গীর হাঙ্গামা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কেন বর্গীরা লুণ্ঠন করতে এল সেটাও বোঝা দরকার। মারাঠারা দস্যু ছিল না। বাংলা বিহার উড়িষ্যায় অর্থ আদায় করবার ছিল তাদের আইনসঙ্গত বাদশাহী অধিকার। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নবাব আলিবর্দী খাঁ কাটোয়াতে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলার সঙ্গে মিলিত হলেন। রঘুজীর সঙ্গে ছিলেন তার সেনাপতি ভাস্বররাম। তখনই নবাব জানতে পারলেন যে মারাঠা রাজা শাহুর সঙ্গে বাদশাহর এক চুক্তি হয়েছে। তদনুসারে দিল্লীর বাদশাহ বাংলা সুবার জন্য বার্ষিক পঁয়ত্রিশলক্ষ টাকা চৌথ শাহুরাজাকে দিতে স্বীকার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়েছেন যে বাংলা সুবার সুবাদার নবাব আলিবর্দী খাঁর কাছ থেকে এই চৌথ মারাঠাদের আদায় করে নিতে হবে। রাজা শাহু নাগপুরের রাজা রঘুজীকে এই চৌথ দান করেন। দিল্লীর বাদশাহ কিন্তু ইতিমধ্যে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও-কে ওই খবর জানিয়ে দিলেন। পেশোয়া ছিলেন রঘুজীর পুরাতন শত্রু। কাজেই বাদশাহর আদেশে চৌথ আদায় করা এবং রঘুজীকে নিরস্ত্র করবার জন্য বালাজীও সসৈন্যে বাংলাসুবায় প্রবেশ করলেন। রঘুজী ইতিমধ্যে উড়িষ্যায় ঘাঁটি স্থাপনা করেছেন। সুতরাং বাদশাহী আদেশের ফল স্বরূপ দুইদল মারাঠাবাহিনী বাংলায় এল এবং অত্যাচারে অনাচারে বাংলার জীবন দুর্বিসহ করে তুলল। অবশেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে মারাঠাদের সরে যেতে হল। তখন উত্তর উড়িষ্যার কিছু অংশ মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত হল। শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র উড়িষ্যা

প্রদেশ ও বার্ষিক ১২লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করলেন নবাব। বাংলায় মারাঠা উপদ্রব নিরসিত হল।[১৬]

ইতিমধ্যে নবাব আলিবর্দীকে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছে। পাটনায় পাঠান বিদ্রোহে ভ্রাতা হাজী আহমদ এবং তাঁর ছোটপুত্র, জামাতা জৈনুদ্দিন আহমদ নিহত হলেন। নবাব-কন্যা সিরাজ-মাতা আমিনা হলেন বন্দিনী। সময় ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। মারাঠা যুদ্ধ স্থগিত রেখে বৃদ্ধ নবাব সসৈন্যে পাটনায় গেলেন এবং বিদ্রোহী পাঠান সৈন্যদের পরাজিত করে কন্যার মুক্তি সাধন করলেন। জামাতার জায়গায় দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ সিরাজদ্দৌল্লা বিহারের নামমাত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। সিরাজের বয়স তখন পনের বছর তাই রাজা জানকীরামের হাতে বিহারের শাসনভার দিয়ে নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু তিনি বিদায় হওয়ামাত্র পঞ্চদশবর্ষীয় নবাব-দৌহিত্র রাজা জানকীরামের শাসন অগ্রাহ্য করলেন এবং বিলাস-সঙ্গীদের পরামর্শে রাজা জানকীরামকে পদচ্যুত করে স্নেহময় মাতামহ স্বয়ং নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। বলাবাহুল্য এ খবর গোপন থাকল না। বৃদ্ধ নবাব স্বয়ং পাটনায় এসে সিরাজকে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। রাজা জানকীরামই বিহারের পুরোপুরি শাসনকর্তা হলেন। তাঁর পুত্র দুর্লভরাম নবাবকে রাজস্ব বিভাগে সাহায্য করতে লাগলেন।[১৭]

নবাবের দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয় নাই তখনও। সিরাজের পরের ভাই মির্জা কাজিমকে দত্তক নিয়েছিলেন নিঃসন্তান নওয়াজেস মহম্মদ ও ঘসেটি বেগম। তার নাম দিয়েছিলেন এক্রামাদ্দৌল্লা, বিবাহও দিয়েছিলেন খুব জৌলুস করে। মাত্র কয়েকদিনের অসুস্থতায় ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে এক্রামাদ্দৌল্লার মৃত্যু হল। নওয়াজেস মহম্মদ মারা গেলেন ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। হোসেনকুলি খাঁ হলেন ঘসেটি বেগমের দেওয়ান। কিন্তু সিরাজ-মাতা আমিনা বেগম এতদিন তাকে পেয়েই না স্বামীর শোক ভুলেছিলেন। হোসেনকুলি খাঁকে নিয়ে দুই নবাব কন্যার প্রতিযোগীতার কাহিনী যেমন কুৎসিৎ তেমনি কদর্য্য। কামনা ও দেহলিপ্সার সব মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে আসঙ্গ পিপাসার এক নবতম নরকের পরিচয় দেয়। তাই প্রকাশ্য দিবালোকে সিরাজের আদেশে যখন সভ্রাতা হোসেনকুলি খাঁ দ্বিখণ্ডিত হলেন তখন নবাবের সঙ্গে অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।[১৮]

নবাবী জীবনযাত্রা ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। বিলাসপরায়নতা, সুরাপান ও কামিনীসম্ভোগকেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মনে করা হতে লাগল। সিরাজ একলক্ষ টাকায় দিল্লী থেকে ফৈজী নামে এক সুন্দরী দেহ-বিলাসিনীকে ক্রয় করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে তাকে পৈশাচিকভাবে দেওয়ালে গেঁথে হত্যা করলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দেই সিরাজ মোহনলাল নামে এক কাশ্মিরী যুদ্ধ ব্যবসায়ীর ভগ্নিকে ক্রয় করলেন। পরে ইনি লুৎফউন্নিসা নামে সিরাজের প্রিয় সহচরী হন। স্ত্রীলোক উপঢৌকন দেওয়া ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর এক রীতি। নবাব-দৌহিত্রের সুনজরে পড়বার জন্য অনেকেই স্ত্রীলোক উপঢৌকন দিতে লাগলেন। সিরাজের হারেম সুন্দরী রমণীতে পূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর একমাত্র বিবাহিতা পত্নী উমদাৎ উন্নিসার নবাব-দৌহিত্রকে বাধা দেবার কোন ক্ষমতা ছিল না। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবন ধরে (মৃত্যু ১০ই নভেম্বর ১৭৯৩) মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সাক্ষী হলেন। এমনকি সিরাজ-বংশধর রূপে পরিচিত হলেন জারিয়া লুৎফউন্নিসার কন্যা। কেবল সিরাজ নয় সকলেই বিলাসের দাস হলেন। মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহমদ খাঁও সুরা ও সাকীর টানেই পরপারে চলে গেলেন। তার পুত্র শওকৎজঙ্গ সম্পর্কে বলা হত যে নানী বা দাইএর বক্ষদুগ্ধ পরিত্যাগ করার পর তাকে কেউ কখন সুরাসক্ত না থাকতে দেখে নাই।

এই সব ঘটনা নবাব আলিবর্দীর মনে কোন চিন্তা জাগিয়েছিল জানবার উপায় নাই। তবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে একথা অস্বীকার করা যায় না যে বাংলা সুবায় নবাবীর দিন তখন নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। নর্তকীর নূপুর নিক্কন এবং গোলাপজল আর আতরের খুসবু কিছুতেই ঢেকে রাখতে পারছিল না যে বাংলায় মুসলমান শাসনের দিন অবসানের পথে চলেছে। আর নবাবের তিন জীবিত দৌহিত্রের কাউকেই ঠিক মনুষ্য পদবাচ্য বলা চলে না।

এক্রামাদৌল্লার বালকপুত্র মুরাদদৌল্লাকে কি করে সুবাদার করা যায় তা নিয়ে ঘসেটি বেগম চিন্তিত হলেন। তার সহায় দেওয়ান রাজা রাজ-বল্লভ আর তার বুদ্ধিমান পুত্র কৃষ্ণদাস। ওদিকে ষড়যন্ত্রের আভাষ পাওয়া মাত্র নবাব দুর্লভরাম ওরফে রায়দুর্লভকে দেওয়ান করেছেন। মীরজাফর সেনাবাহিনীর অধিকর্তা। উভয়কে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন যেন সিরাজকে সুবাদার হতে তারা সাহায্য করেন। দুজনাই বৃদ্ধ নবাবের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

নবাব আলিবর্দীর জীবনের শেষ কয় বছর ১৭৫১ থেকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার ব্যবসার প্রসার লক্ষণীয়। কেবল ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তেত্রিশলক্ষ ছেষট্টি হাজার পঞ্চাশ সিক্কাটাকা বাংলার ব্যবসায়ে লগ্নী করেন। এইসময় নিয়মশৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করেছে। দেশের শিল্প ও বানিজ্যের প্রসার হয়েছে। বন্দর কাশিমবাজার এই ব্যবসার বৃদ্ধির সাক্ষী হয়ে আছে। নানা জায়গা থেকে দ্রব্য ও বস্ত্র সামগ্রী কাশিমবাজারে আসত এবং অনেক সময় নৌকা বদল করে কলকাতার দিকে নদী পথে যাত্রা করত। ভাগিরথীর পথই ছিল বিপদমুক্ত। পথে দেরী হত কারণ বহু জায়গায় চর পড়তে আরম্ভ করেছে। খরার সময় মাঝে মাঝে নৌকাকে ডাঙায় তুলে কিছু দূরে গিয়ে জলে নামাতে হত। তা স্বত্বেও এইটাই নৌকা যাতায়াতের সদর রাস্তা। এমন কি ঢাকা থেকে নৌকা জলদস্যুর ভয়ে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও সুন্দরবন হয়ে ঘুরে না এসে, উজান বয়ে যেত ফরাক্কার কাছে সেখান থেকে ধরত ভাগিরথীর ধারা। কাপড়ের সম্ভারে কাশিমবাজার ভরে যেত। ঢাকা, পাটনা, জগদিয়া থেকে আসত 'খাসা'। কাশিমবাজার থেকে পাওয়া যেত 'ডুনিদার', 'দোসুতি', রেশমের সম্ভার, রেশমের কাপড় থেকে তৈরী নানা রকমের পরিধেয়, টাফেটা ও ভেলভেট। ঢাকা ও কাশিমবাজার থেকে আসত 'ডিমিথি', 'ডুরিয়া', 'মলমল', 'নয়নসুখ', 'শীরশাকার', 'শিরবন্ধ', ও তাঞ্জীব। ঢাকা ও জগদিয়া থেকে আসত সুবিখ্যাত 'হামাম' কাপড়।[১৯] এই সময়কার ব্যবসার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে সাতজন ইংরেজ ভাগ্যান্বেষণকারী নিয়মিত বিদেশে বস্ত্রসম্ভার চালান দিয়ে নিজেদের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করেন। লক্ষণীয় যে এ বণিক দলের সকলেই আলাদা ব্যবসা করবার চেষ্টা করেছেন এবং কেউ কোন ভাবে কোন বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[২০]

এদিকে ইংরেজ কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠীর কর্ণধার রাসেল সাহেব কাঠমাদের ঔদ্ধত্ত সহ্য না করতে বদ্ধপরিকর হলেন। কিন্তু শর্মাদের সঙ্গেও তিনি কোন দীর্ঘস্থায়ী বোঝাপড়া করতে রাজী হলেন না। ফলে কাঠমা বিরোধী ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে রাজী হলেও তাদের ক্ষমতা খুব বেশী হল না। কিছুদিনের মধ্যেই কাঠমারা কলকাতার গোমস্তা তাদের আত্মীয় বিষ্ণুদাস শেঠের কাছে এমন কিছু খবরাখবর পাঠাল যে রাসেল সাহেবকে

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে যেতে হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে কাঠমা ব্যবসায়ী ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে আবার ব্যবসা করতে রাজী হলেন।[২১] এবার কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী সাবধানে চললেন। কোন এক সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভর না করে তারা শর্মাদেরও ডেকে পাঠালেন। ফলে এই দুই দল আর তাদের বন্ধুবান্ধব সবাই ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের বড় ব্যবসায়ীরা হলেন (বেশী ব্যবসা অনুযায়ী) বাবুন কাঠমা, রঘুনাথ বিশ্বাস, দুলাল শর্মা, কেবলরাম শর্মা ও হরিবল্লভ দাস।[২২] ব্যবসায়ীর বেশী সমাগম হওয়ায় এক বছরের মধ্যে প্রচুর উন্নতি হল রপ্তানীযোগ্য সম্ভারের। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অগাষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানী এক চুক্তি করলেন যে অগ্রীম দাদনের পরিমাণ এখন থেকে হবে শতকরা দশ টাকা।[২৩] এবার কাঁচা রেশম যা ক্রয় করা হত তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হল। স্থানীয় রেশমের নাম হল 'নভেম্বর বন্ধ' অর্থাৎ নভেম্বর মাসে বাঁধা। শীতকালের তৈরী রেশমের সুতোর জোরও নানা কারণে বেশী হত। তারপর হল 'কুমারখালি' অর্থাৎ কুমারখালিতে যে রেশম তৈরী ও বিক্রী হত সেই রেশম এবং 'গুজরাটি' অর্থাৎ গুজরাটি বণিক-গণ যে রেশম কেনাবেচা করতেন। গুজরাটি বণিকরা সাধারণত রংপুর জেলায় তৈরী রেশমের পূর্ণ স্বত্বাধিকারী ছিলেন তাই এই রেশমের নামও বণিকদের নামেই হয়ে গেল। এই তিন রকম রেশমেরই বিদেশে প্রচুর চাহিদা ছিল। একটু বেশী ঔৎসুক্য নিয়ে যাঁরা এই প্রবন্ধ পড়বেন তাঁরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দামের কথা জানতে চাইবেন। নভেম্বর বন্ধের দাম ছিল প্রতি সের ৫ টাকা ৮ আনা, কুমারখালি প্রতি সের ৫ টাকা ৬ আনা আর গুজরাটি প্রতি সের ৬ টাকা ১ আনা।

দেখা যাচ্ছে যে ভাস্কররামকে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হত্যার পর অন্তত চার বছর ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ চলে নাই। মারাঠা আক্রমণ প্রতি বছর হলেও অন্তত কাশিমবাজারের ব্যবসায়ী সমাজকে খুব ভীত করতে পারে নাই। তবে সাধারণ বহু লোক যে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। তাঁরা তাঁদের জায়গাজমি ও বাড়ী স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে এই সময় পদ্মার পূর্বপারে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। কিন্তু ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গুজব ছড়াল যে এবার বিরাট ফৌজ নিয়ে বর্গীরা আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যবসায়ী পলায়ন করলেন।

বিশেষ ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের হাঙ্গামায় শর্মারা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন তাই তাদের দল থেকেই পলাতকের সংখ্যা অনেক হল। এরা জানালেন যে নবাব ও জগৎশেঠ স্বয়ং যখন ঢাকায় পুত্রপরিবার ও ধনরত্ন সরিয়েছেন তখন ভবিষ্যতে সেখানেই আবার রাজধানী স্থানান্তরের সম্ভাবনা তাছাড়া ঢাকা বর্গীদের আওতার বাইরে। সুতরাং এই সময় বহু ব্যবসায়ী ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিদায় হলেন। জিনিষপত্রের দর বৃদ্ধি পেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বর্গীরা মুর্শিদাবাদ বা কাশিমবাজারে এসে পৌছাল না। ব্যবসা প্রায় স্বাভাবিক ভাবে চলতে লাগল। একটা তফাৎ কিন্তু ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, শর্মারা কমে যাওয়ায় কাঠমাদের ক্ষমতা আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা ভাই ভাইপো যে যেখানে আছে, নাবালক সাবালক, সবাইকেই কোম্পানীর খাতায় ব্যবসায়ী বলে নাম লেখালেন।

ইতিমধ্যে রাধাকৃষ্ণ নন্দীর খুবই বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। নূতন ব্যবসায়ী হিসেবে ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে অনেক রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য বিক্রির সুযোগ পেয়েছেন। তারপর শর্মাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগে এবং তাদের আনুকুল্যে রাধাকৃষ্ণের ব্যবসা কিন্তু ভালই চলেছে। কাঠমাদের সঙ্গেও তার বিরোধ নাই। এখন তিনি স্থানীয় পাঁচজন বড় ব্যবসায়ীর অন্যতম। সময় ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ, মনে আশা যে ইংরেজ কোম্পানী প্রথমে কাঠমা ব্যবসায়ী প্রীতরামকে 'বাবু' উপাধি দিয়ে যেমন ১৭৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্মানিত করেছে, যেমন করে শর্মাদের গোপালবাবু সম্মানিত হয়েছেন তেমনি সম্মান হয়তো তাঁর প্রাপ্য হতে পারে। মনে রাখতে হবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইচ্ছা করলেই যে কেউ নিজেকে 'বাবু' বলতে পারতেন না। 'বাবু' হলেই তাঁর সমাজে একটা প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হচ্ছে সেজন্য অর্থ, বংশ ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে তাকে এই সংজ্ঞার উপযুক্ত হতে হত। দীর্ঘদিন, প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্য্যন্ত 'বাবু' সমাজে এক অত্যন্ত সম্মানিত সম্বোধন হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

রাধাকৃষ্ণের উন্নতি কাঠমাদের সহ্য করা কঠিন হল। কারণ রাধাকৃষ্ণ একক ব্যবসায়ী, তার দল নাই, দলগত সুযোগ সুবিধা আদায়ের দিকে তার নজর না থাকায় তার ব্যবসায় অল্প সময় পরপর দর বাড়াবার কোন ইচ্ছা নাই। কিন্তু তা স্বত্বেও তার উন্নতি লক্ষণীয়। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দশ বিশ

হাজার টাকায় তার বার্ষিক ব্যবসা সীমাবদ্ধ থাকত আর এখন অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তার বার্ষিক ব্যবসা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। শুধু সেটাই রাগের কারণ নয়। ওই একলা ব্যবসার কায়দাটা দেখেই না এতগুলি ব্যবসায়ী কোন দলের সঙ্গে বোঝাপড়া না করেই ইংরেজ কোম্পানীকে জিনিষ সরবরাহ আরম্ভ করে দিয়েছে। সুতরাং যেমন করেই হোক রাধাকৃষ্ণের পতন চাই।

১৭৫৩ স্বাভাবিক ভাবে শুরু হল। ইংরেজ কোম্পানীর বড় সাহেব নবাবের নাতি সিরাজদৌল্লার সঙ্গে দেখা করে তাকে চকচকে জরির দুটি চমৎকার থান আর কয়েক থান মোলায়েমতম রঙিন রেশম উপহার দিয়ে এলেন। রাধাকৃষ্ণের দুর্দৈব ব্যবসার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি কলকাতায় রেশমী কাপড় পাঠাতে আরম্ভ করেছেন। আঘাতটা এল সেই দিক থেকে। কলকাতায় পাঠান দ্রব্য সম্ভার খারাপ বলে বাতিল হয়ে গেল। রাধাকৃষ্ণকে দাদনীর টাকা এবং জিনিষের দাম ফেরৎ দিতে বলা হল। যোগ করতে করতে দেখা গেল যে প্রায় তিন লক্ষ টাকার ধাক্কা।[২৪] উন্নতির শেষ ধাপে উঠতে গিয়ে এই অনিচ্ছাকৃত পদস্খলনের শোক রাধাকৃষ্ণ সহ্য করতে পারলেন না। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হল।

ব্যবসা ও সংসার দুইএর ভার পড়ল জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকান্তের ওপর। কান্তের দুই বিপদ। একদিকে বণিকদের ঈর্ষায় ব্যবসায়ের পতন বহু টাকার দেনা, অন্যদিকে ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে মনোমালিন্য অর্থাৎ ভবিষ্যতের ব্যবসার পথ বন্ধ। এই দারুন দুর্যোগ থেকে সংসার ও ব্যবসাকে কি করে তিনি বাঁচাবেন এই চিন্তাই তাকে ব্যস্ত করে তুলল। কান্তবাবু কিন্তু আর অনেকের মতো সাধারণ ছিলেন না। তিনি সহজেই হতে পারতেন দশের মধ্যে দশম অথবা পাঁচের মধ্যে পঞ্চম। তিনি ভেবে ভেবে উপায় ঠিক করে ফেললেন।

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে আসেন। দুই বছর কলকাতায় অবস্থানের পর ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাকে কাশিমবাজারে পাঠান হয়। তার মাহিনা নির্দিষ্ট হয় বাৎসরিক পাঁচ পাউণ্ড এবং কুড়ি টাকা মাসিক, এছাড়া কাপড় ধোয়াবার খরচও তাকে দেওয়া হত। কাশিমবাজারে উইলিয়াম ওয়াটসের অধীনে তাঁকে প্রথম থেকেই কোম্পানীর সিল্কের ব্যবসার দেখাশোনার ভার দেওয়া হল। দুইবছর পর তিনি এই কাউন্সিলের সভার বিবরনী লেখার ভারও পেলেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি কাশিমবাজার

কাউন্সিলের সেক্রেটারী ও স্টোরকিপার নিযুক্ত হন।[২৫] ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চারিদিকে খোঁজ করছিলেন একজন বেনিয়ান বা সাহায্যকারী।

এই সময় থেকে কান্তবাবুর ওয়ারেন হেস্টিংসের বেনিয়ান হওয়ায় উভয়ের প্রয়োজন চমৎকার ভাবে মিটে ছিল। কান্তবাবু পেলেন কোম্পানীর এক সাহেবকে মাতব্বর যাতে তার পিতার ঋণ শোধে সুবিধা হল এবং অন্য ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ প্রশমিত হল। অন্তত এখন তারা ক্ষতি করার চেষ্টা করলে কোম্পানীর সাহেবকেই নালিশ জানান যাবে। হেস্টিংসের বিরাট সুবিধা হল কারণ কান্তবাবু সিল্কের ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীদের জন্মাবধি জানেন। পারিবারিক ব্যবসার দেখাশোনা করে এই প্রায় ৩৪ বছরের যুবক স্থানীয় রেশমশিল্প সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। তাছাড়া যথেষ্ট অর্থ থাকায় তার প্রভুর ব্যক্তিগত ব্যবসা দেখাশোনার ভার ভালভাবেই নিতে পারবেন। এই আনন্দেই সম্ভবত কান্তবাবু প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকায় তাঁর প্রথম জমিদারী ক্রয় করলেন ১১৬৩ সালের প্রথম বৈশাখ (9 April 1756)।

ওদিকে অশীতিপর নবাব আলিবর্দীর জীবনদীপ প্রায় নির্বাপিত। তিনি অশান্ত মনে মৃত্যুবরণ করলেন ৯ এপ্রিল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ষোল বছর আগে ঠিক এই দিনেই গিরিয়ার প্রাঙ্গণে তিনি নবাব সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে বধ করেন। তাঁর মৃত্যু যেন আবার সেই সরফরাজ খাঁকেই পুণর্জীবিত করল। তাঁর দৌহিত্র সিরাজ তেমনি মদ্যপ, তেমনি চরিত্রহীন, তেমনি অসম্মানকারী। চাটুকারদের দ্বারা চালিত তেমনি অসংযমী। আলিবর্দী সরফরাজকে বধ করলেন কিন্তু সরফরাজ মরল না। ষোল বছর পর সিরাজের মধ্যে জেগে উঠে প্রতিশোধ নিল। বৃদ্ধ নবাবের সমস্ত কীর্তি সম্পূর্ণ মুছে গেল। নবাবের মৃত্যুর সময় সুবা বাংলায় শান্তি বিরাজিত। কেবল ইংরেজ কোম্পানী বাংলায় প্রায় চৌত্রিশ লক্ষ টাকা লগ্নি করেছেন তার মধ্যে ছয়লক্ষ টাকা লগ্নি করেছেন কেবল কাশিমবাজারের রেশম ব্যবসায়ে। রেশম রপ্তানী হয়েছে তাঁদের অন্যতম প্রধান কর্ম।

এই সময় বাংলার দিগন্ত কি বিরাট। দিকে দিকে বাংলার দ্রব্যসম্ভার নিয়ে জাহাজ ছুটে চলেছে। মাল খালাস করবারও যেন সময় হচ্ছে না আবার ছুটে আসছে জাহাজ ভর্ত্তি করতে। ঔরঙ্গজীব বাদশাহ বাংলা সুবার আনুষ্ঠানিকভাবে নামকরণ করেছিলেন 'আমার সাম্রাজ্যের নন্দনকানন'। এই সময়কার ইতিহাস জানলে বৃদ্ধ বাদশাহকে তারিফ করতে ইচ্ছা হয়।

পাঁচ

পিতামহ নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মির্জা মহম্মদ সিরাজদ্দৌল্লা ক্ষমতা দখলের অভিযান চালালেন। পিতৃব্য বংশধর মুরাদদ্দৌল্লা যাতে সুবাদার ঘোষিত না হয় তাই তিনি তখতে বসামাত্র মতিঝিল আক্রান্ত হয়ে সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠিত হল। মাতৃস্বসা ঘসেটি বেগম হলেন নবাবের হারেমে বন্দিনী। তাঁর দেওয়ান রাজা রাজবল্লভকে কয়েদ করা হল। এইরকম ঘটনা ঘটতে পারে সম্ভবত ঘসেটি বেগম আগেই অনুমান করেছিলেন। তার প্রচুর মূল্যবান মণিমানিক্য এবং বংশধর মুরাদদ্দৌল্লাকে, বিশ্বস্ত রাজবল্লভ পুত্র কৃষ্ণদাসের সঙ্গে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে পূর্ণিয়ার নবাব সিরাজের মধ্যমপিতৃব্য পুত্র শওকৎজঙ্গ বাংলার সুবাদারী পাবার জন্য দিল্লীতে আবেদন করলেন। বয়সে এবং সম্পর্কে তিনি সিরাজের থেকে বড় ছিলেন সেজন্য দিল্লীর বাদশাহ ও দেশের লোক মনে করতেন যে সুবাদারী পাবার তিনিই হলেন হকদার, সিরাজ-দৌল্লা অনধিকারী।

পাঠক অবহিত হচ্ছেন যে নাটকে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, রেডিও, সিনেমা ও যাত্রায় সিরাজের যে ছবি পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বলা-বাহুল্য সেই সিরাজ-চিত্রগুলি পরিপূর্ণভাবে কল্পনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এমনকি কোন কোন অসাধু অধ্যাপক এই মিথ্যাগুলিকে সত্য বলে চালাবার অপচেষ্টা করে জননেতা হবার চেষ্টাও করছেন। সুতরাং সিরাজদ্দৌল্লা সম্পর্কে বিবরণ কোথা থেকে সংগৃহীত হল জানান প্রয়োজন।

সমসাময়িক বিবরণ প্রচুর পাওয়া যায়। তাই থেকে নবাব চরিত্র বুঝতে কষ্ট হয় না। ১। সৈয়দ গোলাম হোসেনের লেখা সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ এই সময়কার সব থেকে মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সৈয়দ গোলাম হোসেন পাটনায় জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন এবং ঐতি-হাসিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গ্রন্থে ১৭০৭ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। সৈয়দ গোলাম হোসেন কিছুকাল পূর্ণিয়াতে ছিলেন, পরে নবাব মীরকাশিমের অধীনে সরকারী কাজের ভার পান। পরে নবাব যখন বিহারের অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গে

তার সম্পত্তিও অপহরণ করেন তখন তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দেন।

২। মুজাফ্‌ফরনামার লেখক করম আলি এই বই খানিতে ১৭২২ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের সুবে বাংলার ইতিহাস রচনা করেছেন। ইনি প্রথম জীবনে ঘোড়াঘাটের ফৌজদার ছিলেন। নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর পর ইনিও প্রথমে পূর্ণিয়াতে ও পরে পাটনায় পলায়ন করেন।

৩। ইংরেজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠী ও কলকাতার কাউন্সিলের রিপোর্ট, হিসাব, কর্মসভার বিবরণী, চিঠিপত্র তাছাড়া দৈনন্দিন কর্মবিবরণী, ব্যক্তিগত রোজনামচা, রিপোর্ট, লণ্ডনের কর্মকর্তা-দের সঙ্গে পত্রের আদানপ্রদান প্রভৃতি প্রচুর সম্পদ পাওয়া যায়। কিছু কাগজপত্র কলকাতা বিজয়ের সময় নষ্ট হলেও যা আছে তা থেকে সিরাজ-দৌল্লার জীবনী বুঝতে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যায়। পাওয়া যায় কূট ও ওয়াটসনের রোজনামচার বই। ক্লাইভ, ওয়াটসন, ওয়াটস, হেস্টিংস, কূট প্রভৃতির ব্যক্তিগত কাগজপত্র ও চিঠি। এছাড়া ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটস কাশিমবাজার কুঠী নবাবকে বিনাযুদ্ধে হস্তান্তর করায় তাকে লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। পরে ওয়াটসের সহকারী কোলেটকে আলাদা প্রশ্ন করে ওয়াটসের উত্তরের সত্যতা যাচাই করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে মীরজাফর খাঁর সঙ্গে ৫ জুন ১৭৫৭-র সেই বিখ্যাত চুক্তির পরও ওয়াটসকে জবাবদিহি করতে হয়। এইসব কাগজপত্র দেখা কঠিন নয়। কিছু পরিশ্রমেই সেটা হতে পারে। আরও পাওয়া যায় সেইসব বিবরণী যাতে চন্দননগরে ও পলাশীতে সৈন্য হতাহতের জন্য কর্নেল ক্লাইভকে পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে সাক্ষী দিতে হয়। কর্নেল কূটের রোজনামচায় পলাশীর যুদ্ধ বিবরণী আছে। এছাড়া কিছু অনামা ও অজানা ইংরেজদের কাগজও বিভিন্ন জায়গায় দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়। এইসব কাগজের উপর নির্ভর করেই ইতিহাস রচিত হয়।

৪। সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে সব থেকে মূল্যবান সংবাদ উৎস ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ ল্যঁলার স্মৃতিকথা। ইনি কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠীর প্রধান হওয়ায় নবাবের সঙ্গে দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ আলাপের সুযোগ পেয়েছেন। সবার ওপর ইনি ছিলেন নবাবের শুভানুধ্যায়ী এবং সেজন্য সিরাজের বন্ধুত্ব কামনা করতেন। তিনিই নবাবকে প্রথম জানালেন ষড়যন্ত্রের কথা।

চন্দননগর পতনে নবাব যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন তারপর ইংরেজদের চিঠি পাওয়া মাত্র লাসাহেবকে কাশিমবাজার তথা বাংলা থেকে বিতাড়ণ করলেন তখনও লাসাহেবই গোলন্দাজ সাঁফ্রকে কয়েকটি কামান ও একদল সৈন্য দিয়ে রেখে গেলেন। হুকুম দিলেন সাঁফ্র যেন কোন কারণেই নবাবের কাছ থেকে দূরে না থাকেন। এই সাঁফ্রই পলাশীতে একলা যুদ্ধ করেছিল তার সৈন্যদল নিয়ে ইংরেজ বিপক্ষে, সে খবর এখন ভুবন বিখ্যাত হয়ে গেছে। ভুল করে কেউ একে 'সিনফ্রে' বলেন। লাসাহেব নিজেও যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে চান নাই। তাই বিরাট একদল সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধের আগে মিলিত হতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধিহীন সিরাজ সব শুভ মতামত উপেক্ষা করে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাশীর প্রান্তরে পৌঁছে, কয়েকঘণ্টায় যুদ্ধে হেরে, নিজের পরাজয় সংবাদ সর্বপ্রথম বহন করে মুর্শিদা-বাদে পলায়ন করলেন। বস্তুত ইংরেজ পক্ষের যুদ্ধের প্রথম পরিকল্পনাই ছিল যাতে লাসাহেবের সঙ্গে নবাবের মিলন না হয়। হলে ইংরেজদের পক্ষে সেই বিরাটবাহিনী ফরাসী যুদ্ধ অভিজ্ঞ সৈন্যধাক্ষদের হাতে পড়লে বিপদের কারণ হবে। ইউরোপীয় অধ্যক্ষতা বন্ধ করতে পারলে বাহিনী যত বড়ই হোক ইংরেজরা যুদ্ধ কৌশলে তাদের বার বার হারিয়ে নিজেদের রণপ্রাজ্ঞতা প্রমান করেছে। নবাবের পলায়নের খবর পেয়েই সাঁফ্র তাকে অনুধাবন করল। কিন্তু নবাবকে খুঁজে পেল না। কারণ নবাব বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে প্রথমে গো-শকটে এবং তারপর নদীপথে পলায়নের চেষ্টা করলেন। ২৩ জুন শেষরাত্রে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে ৩০ জুন ভগবান গোলায় সিরাজ ধরা পড়লেন। পেছনে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে সাতদিনে তিনি অতিক্রম করলেন মাত্র দশ মাইল পথ। অকর্মণ্যতার আর নির্বুদ্ধিতার এর থেকে বড় প্রমান বিরল। সিরাজ যখন ধরা পড়লেন তখন লাসাহেব বাংলাবিহারের সীমানায় মাত্র ত্রিশমাইল দূরে সৈন্যসামন্ত নিয়ে অপেক্ষা করছেন। লাসাহেব তাঁর বিবরণীতে সিরাজের রাজ অভিষেক থেকে অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল ১৭৫৬ থেকে তিনি নিজে কাশিমবাজার ছেড়ে যাওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৬ এপ্রিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ তক বহুঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। লাসাহেব ভারতে দীর্ঘদিন ছিলেন এবং বাদশাহর সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও করেছেন। লাসাহেবের বিবরণী দীর্ঘকাল অজ্ঞাত ছিল। ভাষা পথিক হরিনাথ দে মহাশয় কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে সেটিকে আবিষ্কার

করেন এবং তার প্রথম অনুবাদ প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে লাসাহেবের বিবরণী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর নজরে আসে এবং ইংল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। পরে হিলসাহেব সেটিকে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে সেটাই প্রচলিত, হরিনাথ-কৃত-অনুবাদ লুপ্ত। লাসাহেবের লেখা থেকেই সিরাজ-দৌল্লার প্রত্যক্ষ ছবি পাওয়া যায়।

৫। নানা খুচরা স্বদেশী ও বিদেশী আকর পাওয়া যায়। চন্দননগরে ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ রেণল্ট ও ঢাকার ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ কোর্তঁর বিবরণী আছে। আছে ওলন্দাজ কোম্পানীর প্রচুর নথিপত্র। আছে গোলাম হোসেন সেলিমের রিয়াজুস সালাতিন গ্রন্থ। এককথায় এই সময়কার এত বিভিন্ন বিবরণী আছে যে সমসাময়িক ইতিহাস সহজেই জানতে পারা যায়। অন্ধ এবং উন্মাদ না হলে এই বিরাট তথ্যসমাবেশকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

এবার সিরাজদৌল্লার জীবনী প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। আগেই বলা হয়েছে পাটনায় সিরাজের জন্ম ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে)। বিবাহ ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা ইরাজ খাঁর কন্যা ওমদাৎ উন্নিসার সঙ্গে। ১৩ বছর বয়সের এই বিবাহই তার জীবনের একমাত্র আইনসঙ্গত পরিণয় বন্ধন। প্রসঙ্গত বলা চলে যে বিবাহোপলক্ষেই সিরাজের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখ।[১] নিঃসন্দেহেই বলা চলে ওমদাৎউন্নিসা সিরাজদৌল্লার একমাত্র মহিষী।[২] সিরাজদৌল্লার বিবাহ প্রসঙ্গে ইউসুফ আলি তাঁর রচিত আহবাল-ই-মহবৎজঙ্গে লিখেছেন যে প্রথমে আতাউল্লা খাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহ স্থির ছিল। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন আগে সেই কন্যার হঠাৎ মৃত্যু হলে মির্জা ইরাজ খাঁর কন্যা ওমদাৎউন্নিসার সঙ্গে সিরাজদৌল্লার বিবাহ হয়। দুঃখের বিষয় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কোন সম্প্রীতি ছিল না। এই বিবাহের কোনো সন্তান নাই। নবাব মহিষীর দীর্ঘজীবনের অবসান হয় ১০ নভেম্বর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, মুর্শিদাবাদের পুরান কেল্লায়।[৩] এরপর সিরাজের উল্লেখ হয়েছে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। পাটনায় পাঠান বিদ্রোহের খবর পেয়ে নবাব আলিবর্দী সৈন্যদল নিয়ে চলে গেলেন বিদ্রোহ দমন করতে। বিদ্রোহ দমনের পর সিরাজ চললেন পাটনায় নবাবের আহ্বানে। পিতা জৈনুদ্দিন আহমদ ও পিতামহ হাজী আহমদের পাঠানদের হাতে নিহত হবার খবর পেয়ে সিরাজ-দৌল্লা তার প্রিয়তম গোশকটে সদ্যক্রীতা সহচরী লুৎফউন্নিসাকে নিয়ে

পাটনা যাত্রা করলেন। উল্লেখ্য এটাই লুৎফউন্নিসার প্রথম ঐতিহাসিক প্রকাশ। সুতরাং মনে করা হয় যে এইসময় সিরাজ মোহনলাল ভগিনী এই কাশ্মিরী রূপসীকে ক্রয় করেন। গোশকটের বলীবর্দ দুটিরও প্রথম উল্লেখ এই সময়। এদের রং ছিল তুষার ধবল, জাতি ছিল গুজরাটি এবং উচ্চতায় এত প্রকাণ্ড ছিল যে একজন লম্বা লোকের পক্ষেও মাটিতে দাঁড়িয়ে কষ্ট করেই তাদের ককুধ স্পর্শ করতে হত। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির এই বলীবর্দ-দ্বয় বারশত টাকায় ক্রীত হয়। পরবর্তীকালে মীরজাফর নবাব হলে তিনি এই ষাঁড় দুটি ওয়াটস সাহেবকে দান করেন।[8] পিতা পিতামহের মৃত্যুর ও মাতার বন্দীত্বের খবর পেয়ে সিরাজদৌল্লা গোশকটের থেকে কোন দ্রুতগামী যান ব্যবহার করলেন না এবং জারিয়া (ক্রীতদাসী) সমভিব্যাহারে যাত্রা করলেন।

পাটনায় নবাব আলিবর্দী তখন শান্তি স্থাপনা করেছেন। মৃত জামাতার পুত্র ও প্রিয়তম পৌত্র সিরাজদৌল্লাকেই বিহারের নামমাত্র শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। একান্ত বিশ্বাসী রাজা জানকীরাম দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। বিহারের শাসনভার তার ওপরেই থাকল। কিন্তু মুর্শিদাবাদে ফেরামাত্র পাটনার খবর আবার চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। পঞ্চদশবর্ষীয় সিরাজ শাসনকার্য বা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী না হলেও অপকর্মে বেশ পারদর্শী হয়েছিলেন। চাটুকার বিলাস সঙ্গীদের কুপরামর্শে তিনি প্রবীণ রাজা জানকীরামকে অপমানে জর্জরিত করতে শুরু করলেন প্রতিদিন। তারপর জানকীরামকে পদচ্যুত করে স্নেহময় মাতামহ স্বয়ং নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করলেন। এইসব খবর পেয়ে নবাব আলিবর্দী নিজে এসে সিরাজকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলেন। রাজা জানকীরামই পরিপূর্ণভাবে বিহারের শাসক নিযুক্ত হলেন।[5] এই ঘটনা জানা থাকলে বোঝা সহজ হয় যে পরবর্তীকালে সিরাজের বিলাসের স্রোত বন্ধ করার কোন চেষ্টা কেন নবাব আলিবর্দী করেন নাই। বস্তুত বিলাসপরায়ণতা, সুরাসক্ততা ও কামিনী সম্ভোগ তখনকার নবাবী রীতির অন্তর্গত ছিল। একরামাদৌল্লা, শওকৎজঙ্গ বা সিরাজ এবং পরবর্তীকালে মুরাদদৌল্লা, মীরজাফর বা মীরণ এই পদ্ধতীতেই জীবনযাপন করতেন। ব্যতিক্রম ছিলেন নবাব আলিবর্দী এবং নবাব মীর-কাশিম সেজন্য তাদের চিন্তাধারায় বাস্তব বিমুখতার চিহ্ন কম। তার মধ্যে

সিরাজ ছিলেন আবার দাদুর আদরের নাতি, সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাই তার উচ্ছৃঙ্খলতার রং ও ঢং দুইই ছিল খুব চড়া। লাসাহেব লিখেছেন যে মীরমদন ও মোহনলালের প্রধান কাজ ছিল স্ত্রীলোক সংগ্রহ করা। তার জন্য তারা যে কোন রকম অসভ্যতার সুযোগ নিতেন।

মুতাক্ষরীণ ফৈজী হত্যার কাহিনীও সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। কাঞ্চনী (দেহোপজীবিনী) ফৈজীকে দিল্লী থেকে একলক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়। এটি হয় নবাব দৌহিত্রের নূতন খেলনা। ফৈজী বালকের খেলার সঙ্গী না হয়ে সিরাজের ভগ্নিপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর সঙ্গে রভসলীলায় মেতে উঠলেন। অবশেষে সিরাজ জানতে পেরে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করলেন। মুতাক্ষরীণ কোন সময়ের উল্লেখ করেন নাই। মনে করা হয় যে বিবাহ ও লুৎফউন্নিসা ক্রয়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৪৬ থেকে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে এই ঘটনা ঘটে। লাসাহেব ১৭৫৬তে লিখেছেন সিরাজ কেবল সাংঘাতিক দুশ্চরিত্র নয় অমানুষিক নিষ্ঠুর। ফৈজীর ঘটনা একটি উদাহরণ মাত্র।

১৫ই এপ্রিল সিরাজদৌল্লার অভিষেক হল। একমাসের মধ্যে ঘসেটি বেগমের সম্পত্তি অপহৃত হল। রাজা রাজবল্লভ বন্দী হলেন। মীরজাফর ও রায়দুর্লভ পদচ্যুত হলেন। কাশ্মিরী যুবক ব্যবসায়ী ও সিরাজ পার্ষদ মোহনলাল দেওয়ান নিযুক্ত হলেন, মীরমদন হলেন সেনাপতি। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় প্রচণ্ড অপমানিত হলেন। সন্দেহ করা হল যে শওকৎজঙ্গের নামে সুবাদারী পরোয়ানা দেবার যে অনুরোধ দিল্লী পৌঁছেচে তার নজরানার অর্থ এসেছে জগৎশেঠদের কাছ থেকে। মোহনলাল হুকুম চাইলেন যে এই চারজনের মুণ্ডু কেটে সহরের চারকোণায় দেখালে ফল ভালই হবে। কিন্তু সিরাজ অতদূর যেতে সাহস করলেন না। ইতিমধ্যেই রাজবল্লভ পুত্র কৃষ্ণদাস ঘসেটি বেগমের ধনরত্ন নিয়ে তীর্থযাত্রা করতে যাচ্ছেন বলে উঠলেন গিয়ে ইংরেজ আশ্রয়ে। সিরাজ বার বার চেয়ে পাঠালেন কৃষ্ণদাসকে কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী সে কথা কানেই তুললেন না। প্রচণ্ড ক্রোধে সিরাজদৌল্লা ৩ জুন ১৭৫৬ কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ করলেন। বিনা যুদ্ধে কাশিমবাজার কুঠী আত্মসমর্পন করল। ক্ষোভে দুঃখে ইংরেজ সেনাপতি নিজের মাথায় গুলিবর্ষন করে হত হলেন। কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেব রেশমি রুমালে নিজের দু'হাত বেঁধে সিরাজের হাতির পদতলে নতজানু হয়ে 'তুমহারা গোলাম, তুমহারা

গোলাম', বলে চিৎকার করতে লাগলেন।[৬] ওয়াটস ও তার সহকারী কোলেটকে বন্দী করা হল। ৯ জুন ওয়ারেন হেস্টিংস বন্দী হলেন। অবশেষে তাঁর বেনিয়ান ওলন্দাজ কুঠীর অধ্যক্ষ ভেরনেট সাহেবের কাছ থেকে ৩০০০ টাকা ধার করে জামিন দিয়ে হেস্টিংসের মুক্তি ক্রয় করেন। নবাব প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলেন। কাশিমবাজার থেকেই যাত্রা করলেন কলকাতার পথে। ১৬ জুন কলকাতা আক্রমণ, ২০ জুন কলকাতা জয়। নূতন নামকরণ হল তার আলিনগর। বিজয়োল্লাসে নবাব ফিরে এলেন। মুক্তি পেলেন ওয়াটস ও কোলেট। হলওয়েল প্রমুখ সাহেব বন্দীদের শৃঙ্খল পরিয়ে মুর্শিদাবাদে নামান হল। তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। সিরাজদৌল্লার সে বিজয়োৎসব মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের নাগরিকদের দীর্ঘকাল মনে ছিল। কলকাতা জয়ের উৎসাহে নবাবের আশাবৃক্ষে ফল দেখা দিল। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী শওকৎজঙ্গের সঙ্গে তিনি শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। অগাষ্ট মাস প্রস্তুতির জন্যে রেখে তিনি রাজা মোহনলালকে সেপ্টেম্বর মাসেই পূর্ণিয়া পাঠালেন। ২৪ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হল, অবশেষে ১৬ অক্টোবর মণিহারির যুদ্ধে শওকতজঙ্গ পতিত হলেন। নবাব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মোহনলালকে মহারাজা উপাধি ও বাহারবন্দ পরগণা জায়গীর দিলেন। এছাড়া তাকেই পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল। মোহনলাল অবশ্য মুর্শিদাবাদ ছাড়লেন না, কখনও পুত্র বা অন্য কোন বিশ্বস্ত লোক দিয়ে কাজ চালিয়ে দিলেন। মোহনলাল সিরাজকে ভগ্নি বিক্রয় করেছিলেন একথা আজ সর্বজনজ্ঞাত। সেই ভগিনীর চেষ্টাতেই তাঁর উন্নতিও অনস্বীকার্য্য। কার্য্যত মোহনলাল মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কন্যা ও পুত্র উভয়ের বিবাহই মুসলমানের সঙ্গে হয়েছিল। লাসাহেবের রচনায় মোহনলাল সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। মোহনলালের সঙ্গে লাসাহেবের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বস্তুত ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহনলালকে মাতব্বর করেই তিনি নবাব দৌহিত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই বছরই দিনেমার বণিককুলকে লাসাহেব বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন যে সিরাজদৌল্লার আনুকুল্য ছাড়া নবাব আলিবর্দীর কাছ থেকে ব্যবসার ফারমান আদায় করা যেত না। সে বছর সিরাজদৌল্লা দিনেমার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন পেয়েছিলেন এবং সেজন্য লাসাহেবের ওপর তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন।

মোহনলাল সম্পর্কে অনেক খবরই লাসাহেবের লেখায় পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে ভাষা এতই চমৎকার যে সহজ অনুবাদে তার মাধুর্য্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা। মোহনলালের চরিত্র তিনি যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন, পরলোকগত দিগেন সান্যালের অচল পত্রের ভাষায় অনুবাদ করলে সম্ভবত আসলের একটু রং দেখতে পাওয়া যাবে। লাসাহেব লিখেছেন 'মোহনলালকে যদি কেবল বদমায়েস বলা যায় তাহলে অন্য বদমায়েসরা মানহানির অভিযোগ আনবে। নবাবের জন্যে কোন অপকর্ম করতেই মোহনলাল পশ্চাৎপদ ছিলেন না। নবাবকে তিনি সাংঘাতিক ভালবাসতেন। তিনি স্পষ্ট জানতেন যে প্রভুর সর্বনাশ মানেই তারই জীবন নাশ। জনসাধারণ সিরাজদৌল্লাকে যতখানি ঘৃণা ও ভয় করত মোহনলালকে তার দশগুণ করত। কিন্তু নবাবের থেকেও মোহনলালের চরিত্রের দৃঢ়তা ও বিচারবুদ্ধি বেশী ছিল। বুদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ছিলেন শেঠদের যোগ্য প্রতিপক্ষ। মোহনলাল তার নিজের ইচ্ছামতো ব্যবস্থা করতে পারলে শেঠরা ষড়যন্ত্র করার আগেই বিনষ্ট হত। নবাবের জন্যেই মোহনলালের হাত পা বাঁধা ছিল। সিরাজদৌল্লার সব থেকে সঙ্কটের সময় (ডিসেম্বর ১৭৫৬ থেকে জুন ১৭৫৭) মোহনলাল ছিলেন মরণাপন্ন অসুস্থ। এ সময় তিনি বিছানা থেকে উঠতে বা বাড়ীর বাইরে যেতে পারতেন না। আমি এই সময় নবাবের সঙ্গে দুইবার তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। অনেকে মনে করতেন যে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবার চেষ্টা হয়েছিল। তাই থেকেই এই অসুস্থতা। এ সম্পর্কে মোহনলাল নিজে নীরব থাকতেন। সিরাজদৌল্লা এই সময় নিজেকে খুবই অসহায় মনে করতেন'।[৭] মোহনলাল ১৭৫৬-র ডিসেম্বরে অসুস্থ হন এবং পরবর্তী জুন মাসে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের সময়ও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন নি। সবমিলে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ সিরাজকে সর্বত্র সাফল্যে ভূষিত করল। এমন কি দিল্লী থেকে এল সুবেদারী ফরমান।

ওই বছরই ১৫ ডিসেম্বর ক্লাইভকে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এনে তাকে ইংরেজ পক্ষের সৈনাপত্য দেওয়া হল। ২৭ ডিসেম্বর কলকাতা পুনরাধিকারের উদ্যম শুরু হল। ৩০ ডিসেম্বর ইংরেজ বজবজ দুর্গ অধিকার করল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারী ক্লাইভ কলকাতা পুনরুদ্ধার করে পুনরায় সুরক্ষিত করলেন। নবাব সসৈন্যে হুগলীতে উপনীত হলেন ১৯ জানুয়ারী এবং ৩ ফেব্রুয়ারী কলকাতার উপকণ্ঠে উমিচাঁদের বাগানবাড়ীতে ঘাঁটি স্থাপন

করলেন। ৫ ফেব্রুয়ারী রাত্রে কর্নেল ক্লাইভের সেই সুবিখ্যাত নবাবী ঘাঁটি আক্রমণ ও ৬ ফেব্রুয়ারী পাল্কীযোগে নবাবের পলায়ন। ৯ ফেব্রুয়ারীর সন্ধি-পত্রে নবাব ইংরেজদের সব ঘাঁটি কেবল ফেরৎ দিলেন না তার ওপর বহুলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে এবং ইংরেজদের নিজস্ব সিক্কা টাকা ছাপতে দিতে রাজী হলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারী নবাব এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা লাভ করল। নবাব তাদের সব দাবী মেনে নিলেন।

কলকাতার পরাজয়ের পরই নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় মোহনলালের অসুস্থতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। ওদিকে ভারতীয় দিগন্তেও রাহুর প্রকাশ হল। ২৮ জানুয়ারী লুণ্ঠনকারী আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী প্রবেশ করলেন। ৩০ মার্চের মধ্যেই গোকুল, মথুরায় নিষ্ঠুর হত্যা ও অত্যাচার করে আবদালী ফরিদাবাদে উপস্থিত হলেন। সিরাজ আশঙ্কিত হলেন বুঝি আবদালী বাংলায় উপস্থিত হয়। এই ভয়ই তার কাল হল। দরবারে ওয়াটস্ সাহেবের অসভ্য চিৎকারের তিনি ভীত হতে আরম্ভ করলেন। ব্যাপারটা বোঝামাত্র ওয়াটসের চিৎকারের মাত্রা তিনগুণ বৃদ্ধি পেল। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের চিঠির আদান প্রদান বেড়ে গেল। তারই মাঝে ১৩ মাচ ক্লাইভ চন্দননগরে সৈন্য নিয়ে উপনীত হলেন। হুগলীর ফৌজদার রাজা নন্দকুমার উৎকোচ গ্রহণ করে বিশ্বাসহন্তা হলেন। ২৩ মার্চ ক্লাইভ চন্দননগর জয় করলেন। দলে দলে পলায়িত ফরাসী স্ত্রী-পুরুষ কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠীতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ক্লাইভ জানালেন যে ফরাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা করলে কথনই নবাবের সঙ্গে সন্ধি করা হবে না। ভীতত্রস্ত নবাব একান্ত সুহৃদ লাসাহেবকে ফরাসী কুঠী তুলে দিয়ে স্থানান্তরে যাবার অনুরোধ করলেন। অন্যদিকে জগৎশেঠ ফরাসী-দের কাছে ঋণের টাকার জন্য জবর চাপ দিতে শুরু করলেন। অবশেষে কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ ১৬ এপ্রিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সদলবলে পাটনা যাত্রা করলেন। ভীত নবাব তাকে থাকতে বলতে সাহস পেলেন না। নবাবকে বিপদের সময় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং নবাবের ব্যক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গোলন্দাজ সাঁফ্রে ও একদল সৈন্য রেখে লাসাহেব প্রস্থান করলেন।

নবাবের এই অনীহার কারণ সিরাজ চরিত্রে। বিলাসব্যসনে, চরিত্র-হীণতায়, নৃশংসতায়, ধর্ষণে ও অত্যাচারে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। তরলমতি, অল্প বয়সে ক্ষমতার অহঙ্কার এবং কুসঙ্গ সিরাজদৌল্লার নামে বিভীষিকার সৃষ্টি করত। বাংলার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে নবাবের নাম ছিল দুঃস্বপ্ন, নবাবের কীর্তি ছিল লজ্জার।[৮] মনোবিকলনের যুগে এই চরিত্র বিশ্লেষণ করতে প্রচুর জ্ঞানের দরকার হয় না।[৯] সিরাজ ছিলেন কাপুরুষ সম্ভবত কিম্পুরুষও তাই পৌরুষ প্রমাণ করার জন্য নৃশংস অত্যাচার, নারীধর্ষণ ও অপহরণ তাকে করতে হয়েছে। সকলের কাছে উচ্চস্বরে জানাতে হয়েছে নিজের ক্ষমতার কথা। বহুনারী তিনি সম্ভোগ করেছেন। স্ত্রী ওমদাৎউন্নিসা বা ক্রীতা বাইজী ফৈজীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল ছিল না। লুৎফউন্নিসার কন্যাকেই তাঁর একমাত্র সন্তান বলা হয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সিরাজ নিজে কখনও এই কন্যার পিতৃত্ব স্বীকার করেন নাই। বয়সের হিসাব করলে দেখা যাবে কন্যার জন্ম ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। অর্থাৎ লুৎফউন্নিসাকে যখন উনি ক্রয় করেছেন সেই সময়ে। লুৎফউন্নিসা সিরাজের মৃত্যুর পর এই কন্যা সিরাজের ঔরসজাত বলে দাবী করেছেন। সিরাজ লুৎফউন্নিসাকেও কখনও সহচরীর অধিক মর্য্যাদা দেন নাই। সুতরাং এই কন্যার নবাব-দুহিতা না হবার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। এইবার দাদুর আদরের নাতির চরিত্রের অন্যদিক-গুলি দেখা যাক। যুদ্ধে যে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। অশ্বারোহণে তিনি অশক্ত বলেই দ্রুতগতিতে নিজেকে স্থানান্তরিত করতে পারলেন না, রাজনীতিতে অজ্ঞ বলেই ফরাসী লাসাহেবকে বলে দিতে হল যে সভাসদরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে, রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ বলেই তিনি আবদালীর ভয়ে জুন মাস পর্য্যন্ত কম্পমান থাকলেন, জানলেন না যে হামলাকারী লুণ্ঠক এপ্রিল মাসেই ভারত ছেড়ে চলে গেছে। ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের বাধাদেবার কেউ থাকল না। একেই নবাবপক্ষীয় কম তায় তখন মোহনলাল অসুস্থ আর মত্তপ মীরমদন নিজের আর্থিক উন্নতিতে ব্যস্ত। কলকাতা জয়ে তার বীরত্ব দেখে নবাব ফেব্রুয়ারীর যুদ্ধে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে ভরসা করেন নাই। রাজা মানিকচাঁদ সেই সুযোগ গ্রহণের পূর্ণ চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস

পড়তেই জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় প্রকাশ্যভাবেই বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দিলেন। মীরজাফরকে দলে আনার চেষ্টা চলতে লাগল। অবশেষে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ইয়ার লতিফ খানের জায়গায় মীরজাফরকে ভবিষ্যতে নবাব করতে রাজী হলে মীরজাফর ষড়যন্ত্রে যোগদান করলেন। সিরাজের পতনের মূলথ সড়া প্রস্তুতকারী যে মহারাজা দুর্লভরাম একথা সমসাময়িক সকলেই স্বীকার করেন। ষড়যন্ত্রকারী জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, মীরজাফর, দুর্লভরামের পেছনে বাংলার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সমবেত হলেন। ইংরেজদের ওপর নবাবকে সরাবার ভার দেওয়া হল। কাশিমবাজারের বাতাস সিরাজের পতনের চক্রান্তে পূর্ণ হয়ে গেল।

সিরাজের ক্লীবতার সঙ্গে তুলনীয় কর্নেল ক্লাইভের তৎপরতা। প্রথমে ফলতায় ২৭ ডিসেম্বর স্থলবাহিনীর সৈন্যাপত্য গ্রহণ। তারপর ২৯ ডিসেম্বর বজবজ দুর্গ জয়। ২ জানুয়ারী কলকাতা পুনরুদ্ধার। ৩ ফেব্রুয়ারী উমিচাঁদের বাগানে (বর্ত্তমানে যেখানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ অবস্থিত) নবাবের ঘাটি স্থাপন। সেই ঘাটি ক্লাইভ আক্রমণ করলেন ৫ ফেব্রুয়ারী। হটকারিতার ফলে এল সাফল্য। ভীত নবাব মেনে নিলেন ইংরেজ কোম্পানীর সব দাবী। সন্ধিপত্র পড়তে লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। মার্চ মাসে চন্দননগর অভিযান শুরু করলেন ক্লাইভ। ২৩ মার্চ চন্দননগর অধিকার করলেন। ভীত নবাব কাশিমবাজার থেকেও ফরাসীদের বিতাড়ণ করলেন ১৬ এপ্রিল। জলপথে নৌকা আনতে সময় লাগল। সেনাপতি এ্যাডমিরাল ওয়াটসন গ্রীষ্ম-কালীন নদীর নাব্যতার অসুবিধা তুচ্ছ করলেন। ৫ জুন ওয়াটস-মীরজাফর চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ১২ জুন ওয়াটস, সাইকস, কোলেট ও হেস্টিংস মৃগয়া করবার অছিলায় ঘোড়ায় চড়ে অগ্রদ্বীপে চলে এলেন। (লক্ষনীয় এঁরা একদিনে একবার ঘোড়া বদল করে চল্লিশ মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করলেন। সিরাজদ্দৌল্লা সেখানে সাতদিনে দশ মাইল যেতে পেরেছিলেন।) সেখান থেকে নদীপথে কলকাতায় পলায়ন করলেন। ১৯ জুন কাটোয়া দুর্গ জয় করে ইংরেজ ২২ জুন পলাশীতে সৈন্য সমাবেশ করলেন। কাণ্ডজ্ঞান-হীন নবাব লাসাহেবের জন্যে অপেক্ষা না করে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক সভাসদ সমভিব্যাহারে ২৩ জুন ভোরবেলায় পলাশীতে পৌছলেন। যুদ্ধ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল। সাঁফ্রে প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন। গোলার আঘাতে সেনাপতি

মীরমদন হত হলেন। হত হলেন মোহনলালের জামাতা। কাপরুষতার চরমতম উদাহরণ সৃষ্টি করে কাউকে কিছু না বলে অসমাপ্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নবাব নিঃশব্দে হলেন পলায়িত। মুর্শিদাবাদ থেকেও সেই রাত্রেই পলায়ন করলেন গো শকটে প্রিয়তম সহচারীকে সাথী করে। ভগবানগোলায় সিরাজ যখন ধৃত হলেন লাসাহেব তখন মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ। নবাবের ৫৩ খানা কামানের মধ্যে ৪১ টা থেকে কোন গোলা ছোঁড়া হয়নি। নবাব সৈন্যের কেবল এক পঞ্চমাংশ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। নবাবপক্ষে হতাহত প্রচুর কিন্তু ইংরেজ পক্ষে এতই নগন্য যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। পদচ্যুত সিপাহশালার, দেওয়ান বা মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়ে যুদ্ধে আসা মীর-জাফর ও ওয়াটসের চুক্তি না থাকলেও অনুমোদন করা যায় না। যে অবস্থায় নবাব এই সব অপমানিত অমাত্যদের কাছ থেকে বিশ্বাস বা আনুগত্য প্রত্যাশা করেছিলেন তাতেই তাঁর অনভিজ্ঞ চিন্তাধারাকে বাতুলতার পর্য্যায়ে পৌছে দিয়েছে। অনেকেই সন্দেহ করেন যে নবাব সম্ভবত কাউকেই বিশ্বাস করতেন না তাই সকলকে সঙ্গে করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন। মোহনলাল-মীরমদন-সাঁফ্রেকে অন্যদের তুলনায় কম অবিশ্বাস করেছেন মাত্র। নবাব লাসাহেবকেও বিশ্বাস করেন নাই তাই তাকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নাই। আবার পলাশীতে আসবার আগে সেই কারনেই তার জন্য অপেক্ষাও করেন নাই। যুদ্ধ শেষ হবার আগে পলায়ন (কলকাতার ফেব্রুয়ারীর যুদ্ধেও তাই করেছেন) যুদ্ধ প্রজ্ঞা একেবারেই না থাকার লক্ষণ।

যুদ্ধ শেষ শুধু নয় মোগল রাজত্বের অবশেষ হল বাংলা সুবায়। ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ৩০ জুন সিরাজ ধৃত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। পলাশীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের এই অসহায়তায় অবাক হয়ে যেতে হয়। কি অদ্ভুত একাকীত্ব, কি সাংঘাতিক সুহৃদহীণতা। একাকী লুৎফউন্নিসাকে নিয়ে গো শকটে ও নৌকায় নবাবের পলায়ন চেষ্টা এবং তার ব্যর্থতা, মৃত্যুর অধিক দুঃখজনক বলেই প্রতিভাত হয়। ২ জুলাই মীরনের প্ররোচনায় গুপ্তঘাতকের হাতে সিরাজের নৃশংস মৃত্যু। ৩ জুলাই হস্তীপৃষ্ঠে সেই বিভৎস খণ্ডিত শবের নগর ভ্রমণ ও সমাধি। হতভাগ্য সিরাজের ইতিহাস শেষ হল।

এরমধ্যে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে এসে মীরজাফরকে নবাবী দিয়েছেন ২৯ জুন। কাশিমবাজার কুঠীতে বসে ইংল্যাণ্ডে তার পিতাকে চিঠি দিয়েছেন দেশের বাড়ী মেরামত করতে। আরো লিখেছেন তার জন্যে যেন পার্লামেণ্টের একটি আসন সংগ্রহ করে রাখা হয়। এই কাশিমবাজার কুঠীতে বসেই ক্লাইভ সাহেব তাঁর বৃটিশ মেজাজ প্রকাশ করে জানালেন মীরনকে যে, মৃত নবাবের স্ত্রীলোককে তার যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে। যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের মতো তাকে নিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারা চলবে না। এই সময়ই লুৎফ-উন্নিসার কন্যাকে মৃত নবাবের কন্যা বলে প্রথম উল্লেখ করা হচ্ছে। কিছুদিন পরে সিরাজের আত্মীয় স্বজনদের ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। যুবরাজ মীরন যার পুরো নাম সাদিক আলি খাঁ এবং যিনি 'ছোটনবাব' বলেই সর্মাধক পরিচিত হতে চাইছিলেন, রুষ্ঠ হলেন। কিন্তু জগৎশেঠ খবর পেয়ে ক্লাইভকে সাবধান করে দিলেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে জগৎশেঠ-ভ্রাতৃযুগল বাদে সবাই ভেবেছিলেন যে ইংরেজ যুদ্ধ জিতিয়ে দিয়ে চলে যাবে। ব্যবসায়ী জগৎশেঠ ইংরেজদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই দেশের শাসনভার নেবার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। জগৎশেঠরা স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে দেশে শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা না হলে তাঁদের ব্যবসায়ে বিরাট ক্ষতি হবে তাই ইংরেজদের বাংলা-বিহারের দেওয়ানী নেবার জন্য উৎসাহিত করেছেন। লাসাহেব স্পষ্ট লিখেছেন যে ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন শেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়। তাদের জোর না থাকলে এই চক্রান্ত আদৌ সফল হত কিনা সন্দেহ। ইংরেজ কিন্তু প্রথমে মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ধরতে চায় নি। যখন ধরল তখন জগৎশেঠ হলেন তাদের প্রথম বলি। টাঁকশাল কলকাতায় উঠে এল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। জগৎশেঠের আর টাকা তৈরী করবার কোন অধিকার থাকল না। নবাবের পাওনাদার থেকে জগৎশেঠ-বংশ ধীরে ধীরে সামান্য জমিদারে পরিণত হল। ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কিং হাউস জগৎশেঠ দিল্লীর বাদশাহ থেকে মারাঠা পেশোয়াকে টাকা ধার দিতেন। তার হুণ্ডি ও হাতচিটা পেশোয়ার থেকে মালয় হয়ে বাটাভিয়া পর্য্যন্ত সম্মানিত হয়েছে। অথচ পলাশীর যুদ্ধের কুড়ি বছরের মধ্যে তাদের পতন বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে সব থেকে বড় দুঃসংবাদ।[১০]

পলাশীর যুদ্ধের সময় বাংলার কিরকম অবস্থা ছিল তা নিয়ে বহু রচনা

প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি থেকে জানতে পারা যায় কতকগুলি চমৎকার তথ্য। যেমন, এই সময়কার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ বিরোধ ছিল না। (ইংরেজ আমলে যাঁরা উপন্যাস নাটক লিখেছেন তারা ধরে নিয়েছেন বিরোধ ছিল।) আবার প্রচণ্ড সম্প্রীতিও ছিল না। তারা নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করতেন। ব্যবসা বা রাজকার্য উপলক্ষে পরস্পরের ঘনিষ্ঠও হয়েছেন কিন্তু কখনই গণ্ডী অতিক্রম করেন নাই। যেমন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পানভোজন বা একত্রে আনন্দ উপভোগ করা নিন্দনীয় ছিল। মুসলমান সমাজের সঙ্গে করণকারণে ব্রাত্য হতে হত। সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি মহারাজা মোহনলাল ভগ্নি বিক্রয় করেছিলেন সিরাজদৌল্লার কাছে, কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন এক মুসলমান বীরের সঙ্গে কিন্তু হিন্দু সমাজে ফিরতে পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে এই রকম বহু হিন্দু যারা মুসলমান না হয়েও মুসলমানদের সঙ্গে আচার ব্যবহার করেছেন, আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। হিন্দু যেমন মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখতেন না তেমনি অন্য হিন্দুর সঙ্গেও যোগাযোগের সূত্র ক্ষীণ ছিল। প্রত্যেক পরিবারই একটি দ্বীপের মতো স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে চাইতেন। কারণ অবশ্য স্ত্রী নির্যাতন। রমনী অপহরণ মোগল বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট। কারু বাড়ীতে সুন্দরী কন্যা বা ভার্য্যা থাকলে সে খবর উচ্চতম মহলে চলে যেত এবং নদীতে বা দীঘিতে যাবার পথে অপহৃতা হবার সুযোগ থাকত। লাসাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে মদন নামে এক হিন্দু যুবকের কীর্তির কথা লিখে গেছেন। ইনি ছিপ নৌকা নিয়ে গঙ্গার ঘাটে স্নানের সময় যেতেন এবং সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলেই তাকে ছিপে তুলে নিয়ে হীরাঝিলে পৌঁছে দিতেন। পরে মুসলমান হলে এই ব্যক্তি মীরমদন নামে খ্যাতি লাভ করেন। এই কারণেই অর্থ রোজগারের প্রথম ধাপেই প্রয়োজন হত গৃহ সংলগ্ন পুকুরের। বাড়ীর বাইরে যেতে হলে বিরাট ঘোমটার তলে আব্রু রক্ষাই হয়ে দাঁড়াল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। আত্মীয় স্বজনেরও অন্দর মহলে ঢোকার অধিকার থাকল না। বহিরাগতদের সামনে মহিলাদের উপস্থিতি অপ্রয়োজনীয় করা হল। লক্ষণীয় যে মহিলা হরণকে চিরকালই 'নবাবী বা আমিরী অত্যাচার' মনে করা হয়েছে। কখনই হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অত্যাচার বলে মনে করা হয় নাই। তেমনই আবার বর্গীর

হাঙ্গামের সময় হিন্দু ও মুসলমান রমনীগণ অত্যাচারিতা হয়েছেন। তখনও মুসলমান সমাজ এটাকে হিন্দুর অত্যাচার ভাবেন নাই। নবাব সরকারে নিয়মিত হিন্দু বাঙালী নিয়োগ করা হত মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকেই। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টিও এই সময় থেকেই ধরা চলতে পারে। বিশেষ বাঙালী পদবীতে রায়, চৌধুরী, তালুকদার, শিকদার, তফাদার, মজুমদার, কারকুন, আমীন প্রভৃতি দেখলে তাদের পূর্ব পুরুষদের সরকারী যোগসূত্রের আভাষ পাওয়া যায়।

ব্যবসার জগতেও হিন্দুদের প্রভুত্ব লক্ষণীয়। টাকা লেনদেন ও তেজারতি ব্যবসায় যাঁরা মগ্ন ছিলেন সবাই অবাঙালী হিন্দু। পরবর্তীকালে এদের মধ্যে কেউ কেউ জমিদারীও কিনেছেন। এছাড়া নুনের কারবার, সুতো ও রেশমের বস্ত্রশিল্প, হরিয়েক দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী ব্যবসা প্রভৃতি হিন্দু বণিকদের হাতে ছিল। মুসলমানগণ ব্যবসায়ে মনোযোগী নয় দেখেই মোগল সরকার আইন করলেন যে মুসলমানদের থেকে হিন্দুদের দ্বিগুণ শুল্ক দিতে হবে। নুনের ব্যবসায়ে হিন্দু দিত শতকরা আড়াই টাকা। এই নিয়ে বৃথা আন্দোলনে সময়ক্ষেপ না করে অর্থবান হিন্দু ব্যবসায়ীরা প্রায় সবাই একজন করে ঘুমন্ত মুসলমান অংশীদার সঙ্গে রাখতেন। ফলে সর্বদা নিম্নতম হারেই শুল্ক নবাব সরকারে জমা পড়েছে।[১১] পলাশীর পর এই শুল্ক নিয়মগুলি যেমন সংশোধিত হতে লাগল তেমনি হিন্দু ব্যবসায়ীগণ তাদের মুসলমান অংশীদার-দের ত্যাগ করতে লাগলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দেই অর্থনীতির প্রধান অংশীদার হলেন হিন্দু ব্যবসায়ী ও বণিকগণ। গবর্নর ভেরলেস্ট অঙ্কিত চিত্রটি চমৎকার 'The farmer was easy, the artisan encouraged, the merchant enriched and the prince satisfied.' সমসাময়িক এই ইংরেজের এই বর্ণনা যেমন সুন্দর তেমনি সুচিন্তিত।

ব্যবসার প্রসারে যেমন কাশিমবাজার জমজমাট হয়ে উঠল তেমন আর আগে কখন হয় নাই। রেশম সম্ভার নিয়ে বা সোরা নিয়ে জাহাজ চলাচল বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। কলকাতায় জনবসতি বৃদ্ধি হবার সাথে সাথে কলকাতায় খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করাও নিয়মিত ব্যবসা হল। ব্যবসা করা হত সিক্কা টাকায়। কিন্তু সিক্কা টাকা বলে কোন বস্তু বাজারে চলিত ছিল না। কাজেই 'Current Rupee' বা সনওয়ারী তঙ্কায় লেনদেন চলত। এক সিক্কা

টাকা সমান ছিল ১.০৮ সনওয়ারী তঙ্কা। মজার কথা হল সনওয়ারী তঙ্কা বলেও কিছু প্রচলিত ছিল না। কাজেই যে সব টাকা পাওয়া যেত সেগুলিকে সিক্কায় রূপান্তরিত করে হিসেব রাখা হত আর সনওয়ারীতে রূপান্তরিত করে লেনদেন করা হত। খুব গণ্ডগোলের ব্যাপার সন্দেহ নাই। বিশৃঙ্খলাকে চরম করার জন্য আমদানী হত বরমার প্যাগোডা, রোমীয় ডুকাটুন এবং ফরাসী, আরব প্রভৃতি নানা দেশের অর্থ। সেইসব বিভৎস হিসেবপত্রের ভেতর না গিয়ে ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন টাকা এবং তাদের দর দাম নীচে দেওয়া হল।[১২]

৮ সিক্কা টাকার সমান	এক স্টারলিং পাউণ্ড
১০০ „ „ „	১০৬-১৪ আনা বোম্বাই টাকা
১০০ „ „ „	১০৮ সুরাটি „
১০০ „ „ „	১০৫-১২ আনা মাদ্রাজী „
১০০ „ „ „	১০৬-৬ „ আরকটি „
১০০ „ „ „	১০৩-৮ „ তিনসনী „
১০০ „ „ „	১০৩-৫ „ চারসনী „
১০০ „ „ „	১০৩-৩ „ পাঁচসনী „
১০০ „ „ „	১০৯ নয়া আরকটি বা সনওয়ারী টাকা

ইংরেজ কোম্পানীও রেশমের ব্যবসায় মেতে উঠলেন রেশম বিভাগের ভার ক্রমে হেস্টিংসের ওপর ন্যস্ত হল। হেস্টিংস তাঁর বেনিয়ান কান্তবাবুর সহযোগীতায় আরঙ্গে আরঙ্গে ঘুরতে লাগলেন।[১৩] কাঠমারা জব্দ হল কারণ সাহেব নিজে কথা বলছেন। অবশেষে চাঁদ সরকার আর জীবনবাবুর ওপর রেশম কেনার ভার দেওয়া হল। নভেম্বরে বাঁধা পাকা গুজরাটি রেশমের সুতোর লচির সের প্রতি মূল্য হল আট টাকা পৌনে ছয় আনা। এই সূত্রে কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা করতে এলেন কৃষ্ণইন্দ্র শর্মা যিনি পরবর্তীকালে কোম্পানীর গোমস্তা রূপে[১৪] কাজ করে খ্যাতি লাভ করেন এবং পরিণত বয়সে কৃষ্ণইন্দ্র হোতা নামে বহু দানশীল ধর্মাচরণ ও জনহিতকর বৃহৎ কার্য্যাদি করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর কাশিমবাজারের মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেল। ইংরেজ বণিকেরা হয়ে উঠল নবাবের থেকেও বেশী ক্ষমতাশালী। মাত্র এক বছর আগে যারা ছিল নবাবের নিম্নতম আমলার করুণার ভিখারী, উৎকোচ আর উপহারে বাণিজ্যের অধিকার বজায় রাখাই ছিল যাদের একমাত্র কর্ম এখন তারা শুধু নবাবের প্রধান সহায় নয়, তাঁর আজ্ঞাকারী। ভেলভেটের আস্তরণের তলে লৌহমুষ্ঠির চাপ বড়ই প্রকট। কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ নবাব-দরবারে সম্মানিত অতিথির মর্যাদা পেলেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্তব্য স্বীকৃত হল, নাম হল রেসিডেণ্ট টু দি দরবার। রেশম তৈরী এবং রেশম সুতো পাকাবার জন্য নূতন কিছু বাড়ীঘর তৈরী হল। রেশম কাচার ও শুকোবার জন্য সৃষ্টি হল বাণক-বাগান। রপ্তানীর জন্য আলাদা গুদাম নির্মিত হল।[১৫] বস্তুত শাসন ক্ষমতায় ও বাণিজ্যিক প্রসারে কয়েক বছরের জন্য কাশিমবাজার বাংলার রাজধানীর মর্য্যাদা পেল।

ছয়

আচার্য যদুনাথ পলাশীর যুদ্ধকে নবযুগের সূচনা বলেছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরোনো যুগের খোলস ফেলে নূতন যুগের জন্ম হল। ফলে শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি ও জ্ঞানের দিক থেকে ভারতবর্ষে এক অপূর্ব জাগরণের সময় এল।[১] কেবলমাত্র ইওরোপীয় কর্ম ও ব্যবসায় পদ্ধতীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল না, চিন্তার ও ভাবের রাজ্যের আদান প্রদান, নবচেতনা জাগরূক করল। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে ইংরেজ পণ্ডিত বাংলা শিখে উপহার দিলেন বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা অভিধান ও বাংলা ছাপাখানা। বাংলা ভাষার বিবর্তনে প্রথম শ্বেতপুষ্প অঞ্জলী যে বিদেশীদের দেওয়া এটা কম শ্লাঘার কথা নয়।

পলাশীর পর রাজনৈতিক পরিবর্তনও এল। নবাব মীরজাফর রবার্ট ক্লাইভের হাত ধরে ২৯ জুলাই ১৭৫৭ মসনদে আরোহন করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ কোম্পানীর বাহুবলের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছেন। তাঁর ইংরেজ নির্ভরতা এতই বেশী যে দিল্লীর বাদশাহের আনুগত্য আনুষ্ঠানিকভাবে বা প্রত্যক্ষে স্বীকার করবার কোন তাগাদা অনুভব করছেন না। কিন্তু মনের অস্থিরতা যাচ্ছে না। ক্লাইভের প্রভু-ভাবটা যেন কায়েমী কায়দা হয়ে দাঁড়াল। যুদ্ধ জিতিয়ে ইংরেজ ফিরে গেল না, বেশ ভাল করে জমিয়ে বসল। ক্লাইভ কলকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী চব্বিশ পরগণার কিছু অংশের জমিদার বলে স্বীকৃত হলেন। তিনি আবার নগদ মূল্যে এই অধিকার ইংরেজ কোম্পানীর ওপর জারী করলেন। এ ঘটনায় তাকে নিজের দেশে বিপদে পড়তে হয়েছিল।

এদিকে দুর্লভরাম আবিষ্কার করলেন যে পলাশীর ষড়যন্ত্রে প্রায় কোন কিছু না করে মীরজাফর নবাবী পেল অথচ ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা হয়েও তাঁর তেমন সুবিধা হল না। কেবল মোটা উৎকোচ গ্রহণ করেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। যদিও মীরজাফর তাঁকে মহারাজা উপাধি দিয়ে প্রধান মন্ত্রী করেছেন কিন্তু কোন ঘটনা হলেই ডেকে পাঠান তারই আশ্রিত নন্দকুমারকে। পছন্দ হল না মীরজাফরের চালচলন। কাজেই তার পুত্র সাদিক আলি খাঁ, যিনি মীরণ নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছেন, রায়দুর্লভের দৃষ্টি পথে দেখা দিলেন। রায়দুর্লভ সহজেই বোঝালেন যে মসনদে উঠতে

তার একমাত্র বাধা অকর্মণ্য পিতা। হঠাৎ তার অপঘাতে মৃত্যু হলে মীরণকেই বাংলার নবাব বলে সকলে কুর্নীশ করবে। কথাটা মীরণের পছন্দ হল। বহু নারী পরিবৃত সন্ধ্যায় মদ্যপান ও রমনের মধ্যেখানে তিনি নিজের প্রাণের ইচ্ছাটি প্রকাশ করলেন। নবাব মীরজাফরের এই খবর শুনে আফিংএর নেশা কেটে গেল। প্রথমেই চিঠি লিখলেন কাশিমবাজারে রেসিডেণ্ট হেস্টিংসকে। ডেকে পাঠিয়ে আলোচনা করলেন কি করে জীবন রক্ষা করবেন দুর্বিনীত আত্মজের গুপ্ত অস্ত্র থেকে। নবাবের ভয় যে অমূলক নয় তা জানিয়ে হেস্টিংস ক্লাইভকে পত্র দিলেন। লিখলেন: 'পিতৃহত্যা মোগল ঐতিহ্যের অন্যতম। নবাবের অভিমত, ছোট নবাব এই ঐতিহাসিক প্রথাকে চালু করার পক্ষপাতী।' এসে গেলেন ক্লাইভ কলকাতা থেকে। প্রথমেই রায়দুর্লভকে কলকাতায় পাঠান হল। এই সুযোগে নন্দকুমার হলেন নবাবের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী। ক্লাইভের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব থাকায় এই পদ তিনি অতি সহজেই পেয়ে গেলেন। তারপর মীরণকে কলকাতা দেখতে পাঠান হল। বহু কামিনী সমভিব্যাহারে মদ্যপানে সময়ের হিসাব হারিয়ে মীরণ নৌকা যোগে কলকাতা পর্য্যন্ত গেলেন ও ফিরে এলেন। নিন্দুকে বলে তিনি জীবনে কলকাতার মাটি স্পর্শ করেন নাই। তখন কোথায় ষড়যন্ত্র আর কোথায় দুর্লভরাম। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মীরজাফর কিন্তু ক্লাইভের বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। মনে হয় ক্লাইভকে জেনানা মহলেও তিনি নিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালের চিঠি পত্রে জানা যায় যে ক্লাইভ মীরজাফর ও তার প্রথম স্ত্রী (নবাব আলিবর্দীর বৈমাত্রেয় ভাগিনী) বিবি শাহ খানুমকে 'বাবা ও মা' বলে ডাকতেন এবং তাঁরাও ক্লাইভের সঙ্গে 'পুত্রের মতো' ব্যবহার করতেন।[২] মানব চরিত্রের বিচিত্র গতি সর্বদাই চমকের অবকাশ রাখে।

পলাশীর পর প্রথমে স্ক্রাফটন ও পরে হেস্টিংস হলেন নবাব দরবারে রেসিডেণ্ট বা ইংরেজ প্রতিনিধি। এই সময় তাকে কাশিমবাজার কুঠীরও অধ্যক্ষ করা হল। কাজেই একই সঙ্গে কোম্পানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখার ভার পড়ল। তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ও চলল। হেস্টিংস ক্লাইভের অংশে দুশো মণ রেশম কাশিমবাজার থেকে গুজরাটে পাঠালেন। চীনে যে রেশম সম্ভার ক্লাইভের নামে পাঠান হল তাতে

হেস্টিংসের অংশ ছিল। কোম্পানীকে গাড়ী টানা বলদ সরবরাহ করে এবং রেশমের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে বেশ কিছু অর্থ তিনি দেশে পাঠাতে পারলেন। এই সময় ব্যক্তিগত শোকও তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। স্ত্রী ও শিশু কন্যা মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে কাশিমবাজারে কবরস্থ হলেন। শিশুপুত্র জর্জ চিররুগ্ন। তাকে বাধ্য হয়েই ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিতে হল।

সবাই ভেবেছিল যে যুদ্ধ জিতিয়ে ইংরেজ ফিরে যাবে এবং বশংবদ ভাল-ছেলের মতো ব্যবসা বাণিজ্যে মনোনিবেশ করবে। একমাত্র ব্যবসায়ী জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ইংরেজদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন তাই দেশের শাসনভার নেবার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। শাসন ব্যবস্থার স্থায়ী উন্নতি না হলে যে এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি হতে পারে না একথা এদেশী জগৎশেঠদের মতো বিদেশী ইংরেজও বুঝেছিলেন। তাই নবাবের পেছনে দাঁড়িয়ে তাকে যেমন মদৎ দিয়েছেন, দিল্লীর বাদশাহ বা মারাঠাদের তেমনই সাবধান করে দিয়েছেন। সকলের মতো জগৎশেঠরাও ইংরেজদের খুশী করতে চাইলেন। তাই সাতলক্ষ টাকা ঋণের দায়ে ফরাসী কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠীর যাবতীয় সম্পত্তি মায় ঘরবাড়ি দুর্গ আর ফরাসডাঙ্গার দু'শো তাঁত জগৎশেঠ দখল করে নিলেন। কাশিমবাজাবের তথা মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে ফরাসী প্রভাব এইভাবে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়ে গেল।[৩]

ভারত ইতিহাসেও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। দিল্লীতে শাহ আলম বাদশাহ হলেন। আহমদ শাহ আবদালী দিগ্বিজয়ীর ভূমিকা ত্যাগ করে দিল্লীর বাদশাহের বন্ধুরূপে দেখা দিলেন। তাঁর বন্ধুত্বের জোরে শক্তিমান হয়ে বাদশাহ ইংরেজদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার সাহস পেলেন। বাংলা সুবায় বাদশাহী কর্তৃত্ব পুর্ণস্থাপনার জন্য সাহাজাদা আলি গৌহরকে অযোধ্যার নবাবের সহযোগীতায় পাটনা অভিমুখে অভিযান করবার হুকুম দেওয়া হল। মীরজাফরের মন্ত্রী ও প্রধান সহায় নন্দকুমার কিন্তু আর এক খেলায় মেতেছেন। তিনি একদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবার জন্য মারাঠাদের সঙ্গে পত্রালাপে লিপ্ত, অন্য দিকে মীরজাফরকে পদচ্যুত করে অন্য কাউকে সুবাদারী দেবার জন্য স্বয়ং বাদশাহের সঙ্গে পত্রালাপ করছেন। ইংরেজ কোম্পানী সন্দেহ করতেন যে মন্ত্রীমহাশয় ওলন্দাজদের কাছ থেকে

অর্থ গ্রহণ করেছেন ও ফরাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওলন্দাজ সহায়তায় ইংরেজ ও মীরজাফরকে বিতাড়ন করে বাদশাহের ফরমায়েসী কাউকে ফরমান পাইয়ে দিয়ে তার নামে নিজে বাংলার সর্বময় কর্তৃত্ব করাই যে নন্দকুমারের সাধ হয়েছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বদহজম হল। ওলন্দাজরা পিছিয়ে গেল। মারাঠা ও ফরাসীরা ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিল। ফলে সেই ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দেই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ইংরেজ জালিয়াতির অভিযোগ করে এবং মীরজাফর ওই বছর নবাবী থেকে বিতাড়িত হলে নন্দকুমার কারারুদ্ধ হন।[৪]

সমস্ত ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ জুড়েই রাজনৈতিক রামধনু নানা রঙের খেলা দেখাল। মীরণের স্ত্রীলোক সঞ্চয়ন প্রায় উদভ্রান্ততার পর্যায়ে পৌছে গেল। তিনি চাইলেন লুৎফউন্নিসাকে, আর চাইলেন তার অনূঢ়া কন্যাকে। ক্লাইভ সাহেবের বুলডগী গোঁয়ারপনা এই কুৎসিৎ ঘটনা প্রতিরোধ করল। তিনি স্পষ্ট করেই বললেন যে বিবাহিত হোন কি না হোন নবাবের রমনী তাঁর যোগ্য সম্মানই পাবেন। আর তিনি যখন জানিয়েছেন যে কন্যা নবাবের তখন অন্য কেউ সে বিষয়ে আলোচনা করবেন তা বাঞ্ছনীয় নয়। মরিয়া হয়ে মীরণ তখন নবাব সরফরাজ খাঁর পুত্রবধূদের কামনা করল। কিন্তু কোম্পানী সেখানেও অনড়। এইসব নবাবী মহিলাদের সম্ভবত মীরণের কাছ থেকে দূরে রাখবার জন্যেই ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। প্রচণ্ড বিক্ষোভে মীরণ আলিবর্দীর দুই কন্যা, সিরাজমাতা আমিনাবেগম এবং তাঁর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ঘসেটিবেগমকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করলেন। এই সময়েই রাজা রাজবল্লভ মীরণের দেওয়ান ও প্রধান মন্ত্রণাদাতা হয়ে বসলেন। তাঁর মন্ত্রণাতেই নবাব মীরজাফর জামাতা মীরকাশিমকে অপছন্দ করতে শিখলেন। মীরণ তার মীরকাশিম বিরাগ প্রকাশ করতে লজ্জা পেতেন না। বস্তুত তার বিরাগ তার পিতার বিরাগের তুলনায় ছিল লক্ষগুণ বেশী। পরবর্ত্তী-কালে মীরকাশিম রাজা রাজবল্লভ ও তার দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণদাসকে নৃশংস-ভাবে বধ করেছিলেন, তার বীজ এই সময় রোপিত হয়েছিল। মীরণের ঈর্ষাতেই মীরকাশিম রংপুরের সামান্য ফৌজদারের পদ পেলেন। মীরণ চললেন বাদশাহী সৈন্যের সঙ্গে পাটনায় যুদ্ধ করতে। পথে গণ্ডক নদীর পাড়ে বজ্রপাতে তার মৃত্যু হল, সিরাজ হত্যার দিন, ২রা জুলাই। মৃতদেহকে

হাতীর হাওদায় বেঁধে সকলকে ঠকাবার চেষ্টা করলেন রাজবল্লভ। কিন্তু তা হল না। রাজমহলে মীরণকে সমাধিস্থ করে নবাবকে খবর পাঠান হল।

এদিকে ক্লাইভ সাহেব জাহাজে চাপতে না চাপতে মারাঠারা বর্দ্ধমান আক্রমণ করল ফেব্রুয়ারী মাসে। কয়েক মাসের মধ্যেই একদল বর্গী নিয়ে মারাঠা শিবভট্ট কাটোয়ায় উপস্থিত হলেন। চণ্ডুর তৃষ্ণা ও নারী লালসাসক্ত নবাব বাধ্য হয়েই জামাতা মীরকাশিমকে ডেকে পাঠালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নবাবী সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা গেল। জুলাই মাসে সৈন্যরা বেতনের অভাবে প্রত্যক্ষভাবেই নবাবকে অপমান করল। নবাব নিরুপায় কারন তিনি তো নেশায় মশগুল রাজ্যশাসন করেন নন্দকুমার ও নবাবের তিন ভৃত্য কান্তরাম, মনিলাল আর চিকণ। এই দুরাবস্থা থেকে মীরকাশিম নবাবকে উদ্ধার করলেন। সৈন্যদের বেতন দেওয়া হল। মারাঠা বিতাড়িত হল।

মীরজাফর কার্য্যসিদ্ধিতে খুশী হয়ে জামাইকে পূর্ণিয়ার ফৌজদারী দিলেন। কিন্তু সভয়ে দেখলেন তাতে মীরকাশিম খুশী হলেন না। তিনি চাইলেন মীরণের সব পদগুলি, তিনি চাইলেন শাসন ক্ষমতার ভাগ। বৃদ্ধা নবাব-বেগম মীরকাশিমকে উৎসাহিত করলেন। ফলে শাসন ক্ষমতার পূর্ণ অধিকার পাবার জন্য মীরকাশিম ২৭ সেপ্টেম্বর ইংরেজ কোম্পানীর সিলেক্ট কমিটির সঙ্গে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলেন। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট নবাব মীরজাফর-কে পদত্যাগ করবার জন্য অনুরোধ করলেন, তারপর চাপ সৃষ্টি করলেন, অবশেষে ২২ অক্টোবর, বিজয়া দশমীর দিন মীরজাফর মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করলেন নৌকাযোগে। সাথী এক নবীনা নর্ত্তকী যিনি পরবর্ত্তীকালে মণি-বেগম নামে ইতিহাসে পরিচিত। তাঁরই গর্ভজাত সন্তানগণই পরবর্ত্তী নবাব এবং তাদের পূর্বপুরুষ।

মীরকাশিমের রাজত্বকাল শুরু হল। তাঁর শ্বাশুড়ী, নবাব আলিবর্দীর বৈমাত্রেয় ভগিনী ও নবাব মীরজাফরের প্রধানা বেগম বিবিশাহ খানুম কন্যা জামাতার কাছে মুর্শিদাবাদে থাকলেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের মুহূর্তে চারিদিকেই ইংরেজ শক্তি বর্দ্ধমান। নবাবী পাওয়া মাত্র চুক্তি অনুসারে মীরকাশিম দিলেন বর্দ্ধমান এবং আরো চার বছর পরে মীরজাফর আবার নবাব হয়ে দিলেন মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব ও শীলহট্ট বা শ্রীহট্টের চূন তৈরী করার ক্ষমতা, চুনের রাজস্ব আদায়ের একতরফা ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানীকে

দেওয়া হল। জনষ্টোন সাহেব মেদিনীপুরে ও ভেরলেষ্ট সাহেব চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। কোম্পানীর হাতে মোট পঞ্চাশ লক্ষটাকা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা এল। নূতন নবাব কলকাতার টাঁকশালে কলকাতা সিক্কার সঙ্গে মুর্শিদাবাদী সিক্কা টাকা তৈরী করবার অনুমতি দিলেন। বছর শেষ হবার আগেই কিন্তু নূতন নবাবের কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটল। মীরজাফরের তিন প্রিয় ভৃত্যদের বাড়ীতে হানা দিয়ে সেখানে প্রাপ্ত প্রচুর ধনরত্ন বাজেয়াপ্ত করা হল। এখানেই শেষ হল না মীরজাফর পক্ষীয় সকলের বিশেষ অর্থবান-দের সম্পত্তি ও সম্পদ কেড়ে নেওয়া হল। মীরকাশিম এতেও থামলেন না মীরজাফর ও মীরণের উপপত্নি ও গণিকাদের সমস্ত কিছু মায় বাসস্থান পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে তাদের পথে বের করে দেওয়া হল। অচিরাৎ তাদের বেশীর ভাগই বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে আশ্রয় পেয়ে নিয়ত মীরকাশিম বিদ্বেষ প্রচার যন্ত্রে রূপান্তরিত হলেন।

ওদিকে কূট ও মন্‌সন ফরাসী পণ্ডিচারী অবরোধ করলেন। ফলে জেনারেল লালী হলেন সসৈন্যে উপবাসী। যমুনার তীরে আহমদ শাহ আবদালী সিন্ধিয়ার সৈন্যদের পরাভূত করে হত্যালীলায় মেতে উঠলেন। বাদশাহ শাহ আলম পাটনার উপকণ্ঠে কারনাকের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। অরক্ষিত দিল্লী মারাঠাগণ অধিকার করে পাণিপথ পর্য্যন্ত সৈন্য সমাবেশ করল। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ ইংরেজদের প্রতি অনুকূল। কারণাক পরাভূত করলেন শাহ আলমকে। কূট ফরাসীদের পণ্ডিচারীতে হারিয়ে দিলেন। আহমদ শাহ আবদালী পাণিপথে মারাঠাবাহিনীকে ধ্বংস করে মারাঠাদের হিন্দুপৎ পাদশাহী স্থাপনের ইচ্ছাকে মূলোৎপাটিত করলেন। মারাঠাদের ভারতশাসন স্বপ্ন চিরতরে ভেঙ্গে গেল। মহিশূর রাজের সেনাপতি রূপে হায়দার আলি দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান জানালেন।

কাশিমবাজার রেসিডেন্সিতে বসে হেস্টিংস স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, এদেশে থেকে যদি নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে হয় তাহলে শাসন রজ্জু ইংরেজকে গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে নদীর প্লাবনে যেমন কাশিমবাজার প্রতি বছর জলমগ্ন হয়, তেমনি তাদের ব্যবসা প্রচেষ্টা রুদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর যেদিন জলোচ্ছাস দুর্বার হয়ে আসবে সেদিন আত্মরক্ষা করাও কঠিন হবে।

হেস্টিংস কলকাতায় গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে লিখে পাঠালেন : "এদেশে থাকতে হলে এখানকার লোকেদের বিশ্বাস করতে হবে।" ভ্যান্সিটার্ট একমত হলেও দেশীয় লোকেদের কোম্পানীর কাজে নিয়োগের প্রস্তাব কাউন্সিলে পাশ করতে পারলেন না। এই ঘটনা উপলক্ষে ফার্সী ভাষার এই দুই উৎসাহী ছাত্রের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূচনা হল। ক্লাইভ কাশিমবাজারেই হেস্টিংসের কাজকর্ম দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। 'নির্লোভ ও কর্তব্যপরায়ণ' বলে প্রশংসা করলেও হেস্টিংসের এদেশীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং তাদের মতামত শোনবার ইচ্ছাকে ক্লাইভ 'চরিত্রের দুর্বলতা' বলে অভিহিত করেছেন।[৫] হেস্টিংস কাশিমবাজারে থাকাকালীন ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কোন কোন গবেষকের মতে এই সময় থেকেই তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন।[৬] হেস্টিংস কিন্তু দেশীয় লোকদের সহযোগীতায় কাজকর্ম ভালই চালাচ্ছিলেন। একদিকে তিনি রাজ প্রতিনিধি নবাব মীরকাশিমের দরবারে অন্যদিকে তিনি ফ্যাক্টরীর প্রধান অধিকর্তা অর্থাৎ ইংরেজ ব্যবসায় রক্ষা ও উন্নতির ধারক। তারই মাঝে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ৯৫০ পাউণ্ড ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে পারা দক্ষতার চিহ্ন বৈকী। কাশিমবাজার কুঠীর সিল্কের ব্যবসা দেখার জন্য তিনি বিভিন্ন বিভাগ করলেন এবং প্রত্যেক বিভাগে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে গোমস্তা নিয়োগ করলেন।[৭]

গোমস্তা	বিভাগ
১। কৃষ্ণ ইন্দ্র শর্মা (হোতা)	কাঁচা ও পাকা রেশক
২। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর	রেশমের দ্রব্যাদি
৩। যুগল চক্রবর্তী	গড়া
৪। রঘুনাথ বিশ্বাস	পাটনী
৫। মুরলী চ্যাটার্জী	কুমারখালি আরঙ্গ
৬-৭। নৃসিংহ ঠাকুর ও মানিকচাঁদ	পদ্মাপার "
৮। কুশল চ্যাটার্জী	সোনারন্দি "
৯। সনাতন	রংপুর "

লক্ষণীয় যে নয়জন গোমস্তার মধ্যে ছয়জন হলেন অবিসংবাদী ভাবে ব্রাহ্মণ। সন্দেহ হয় যে হেস্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবুর এই গোমস্তা নির্বাচনে ভূমিকা ছোট ছিল না। তাঁর বন্ধু শর্মাদের প্রতিষ্ঠা হল এবং তাঁর পিতৃদেবের

ব্যবসা বিঘ্নকারী কাঠমাগণ আবার পরাজিত হলেন। এই সময়কার ব্যবসার কথা বুঝতে হলে প্রথমে সোনার দর জানতে হবে। কারণ মোহরই তখন প্রধান লেনদেনের স্মারক। এবং মোহরের মাধ্যমেই সমস্ত ব্যবসা চালিত ছিল। সিক্কা টাকায় মোহরের মূল্য ব্যবসার বাজার ও সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করত।

মুর্শিদাবাদী	মোহরের	মূল্য	সমান	১৩	সিক্কা	টাকা	এগার
পাটনাই	,,	,,	,,	১৩	,,	,,	দশ
সুরাটি	,,	,,	,,	১৪	,,	,,	এক
দিল্লী ও আগ্রার পুরাতন		,,	,,	১৩	,,	,,	নয়
ঐ নূতন		,,	,,	১৩	,,	,,	চার
বারাণসীর পুরাতন		,,	,,	১৩	,,	,,	পাঁচ
ঐ নূতন	,,	,,	,,	১২	,,	,,	এগার
পাঞ্চদাগী (পাঁচ রকমের)		,,	,,	১৩	,,	,,	পাঁচ
হায়দ্রাবাদ ও মুসলীপত্তনের		,,	,,	১৩	,,	,,	চার
আরকটী	,,	,,	,,	১২	,,	,,	আট

সোনার দরের উর্দ্ধগতির ফলে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হল।

মীরকাশিম নবাবী করবার উপযুক্ত লোক ছিলেন। কিন্তু দেশী বিদেশী কোন মহলই কার্যক্ষম নবাব চাইছিলেন না। ব্যবসায়ে দুর্নীতি বন্ধ করা এবং নিয়মিত রাজস্ব আদায় করতে নবাব বদ্ধপরিকর হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। পাটনায় রামনারায়ণ আর রাজবল্লভ মীরকাশিমের পতনের পথ খুঁজতে লাগলেন। নন্দকুমার সেনাপতি কূট সাহেবের দেওয়ান হলেন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে। তিনি ক্রমান্বয়ে কূট সাহেবকে নবাবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে লাগলেন। নবাব চললেন পাটনায় রামনারায়ণকে শিক্ষা দিতে সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর সংখ্যাগুরু কাউন্সিলারগণ নবাবের রোষবহ্নি থেকে রামনারায়ণকে রক্ষা করতে কর্নেল কূটকে পাঠালেন। তারপর হল চরম ভুল বোঝাবুঝি। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে কর্নেল কূট পিস্তল বাগিয়ে ধরে হানা দিলেন নবাবের তাঁবুতে।[৯] পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রস্তাব করে বসলেন যে ওয়াটস সাহেবের ইচ্ছা যে নবাব যেন নন্দকুমারকে

আবার হুগলীর ফৌজদার করেন।[১০] নবাব এবার রাজবল্লভকেই রাম-নারায়ণের হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করলেন। মীরকাশিমের বন্ধুত্ব পাবার আশায় রাজবল্লভ নবাবের প্রয়োজন মতো রামনারায়ণের হিসাবে তহবিল তছরূপ খুঁজে বার করলেন। রামনারায়ণের সম্পত্তি ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাকে কয়েদ করা হল। যাকেই নবাব প্রতিপক্ষ এমন কি সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ মনে করলেন তাদেরই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। রাজা মুরলীধর বা বণিক মনসারাম শাহু অথবা পাটনার কোতোয়াল মহম্মদ ইশাখ কেউ বাদ গেলেন না। এমন কি ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের পৈতৃক জায়গীর কেড়ে নেওয়া হল। সিতাব রায় বুদ্ধি বলে নবাবী রোষ থেকে নিজেকে কোনক্রমে রক্ষা করে ধনসম্পত্তি নিয়ে দিল্লীতে পলায়ন করে বাদশাহ শাহ আলমের শরণাপন্ন হলেন। মুতাক্ষরীণ রচয়িতা লিখেছেন যে ব্যাপার এমন হয়ে দাঁড়াল যে নবাবের দরবারে কথা বলবার মতো কোন লোক থাকল না। যতই ধনিষ্ঠ বা মর্যাদাবান সভাসদ হোন না কেন নবাবের পছন্দের বাইরে কোন কথা বলার কারু কোন সাহস থাকল না। এমন কি রাজ-বিদূষক মীর্জা সামসুদ্দিন, যিনি মীরজাফরকে সভার মাঝখানে 'ক্লাইভের গদাগাধা' বলতে ভয় পান নাই, তার মুখও ভয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকল।

মীরকাশিম মুঙ্গের দুর্গ সংস্কার করলেন এবং সৈন্যবাহিনীকে বিদেশী কায়দায় শিক্ষিত করতে চেষ্টা করলেন। নবাবের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন আর্মেনীয় বণিক খোজা গ্রেগরী ইনি গুরগিণ খাঁ নামে প্রসিদ্ধ। তার সঙ্গে যোগ দিলেন আর্মেনীয় মার্কার ও ফরাসী (মতান্তরে জার্মান) সমরু যার প্রকৃত নাম ওয়াল্টার রাইনহার্ড। নবাবের সৈন্যদল অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ এই তিন ভাগে বিভক্ত হল। শক্তি পরীক্ষার জন্য নবাব বিহারের জমিদারদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযান করলেন। ভোজপুরের জমিদাররা যুদ্ধ করতে এসে নিদারুণ পরাজিত হল। নেপাল সীমান্তে বেতিয়া পর্য্যন্ত নবাবী প্রাধান্য প্রসারিত হল। বিহারের সমস্ত কেল্লা নবাবী দখলে এসে গেল।

ইংরেজ কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল মীরকাশিমের এই শক্তি বৃদ্ধিকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। গবর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও ওয়ারেন হেস্টিংস বাদে সকলের মনেই ধারনা বদ্ধমূল হল যে নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হচ্ছেন। বিহারে নবাবী প্রভাব হ্রাস করার জন্য এলিস সাহেবকে

পাটনা পাঠান হল। তার কাছে নিয়মিত বন্দুক ও গোলাবারুদ পাঠাবার ব্যবস্থা হল। এই সময়েই অর্থাৎ ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাজা রাজবল্লভ পাটনার নবাবী নায়েব থাকতে থাকতেই এলিস সাহেবের একান্ত অনুগত হয়ে পড়লেন।

ব্যবসায় জগতে গোলমাল চরমে উঠল। বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অধিকারের অজুহাতে কেবল বিদেশী নয়, দেশী ব্যবসায়ীরাও নবাবের শুল্ক ও দস্তক ফাঁকি দিতে শুরু করলেন। হেস্টিংস গবর্ণরকে লিখে পাঠালেন: 'যে সব লোক মাথায় টুপি পরে তারা কলিকাতার আওতা ছাড়িয়ে আসামাত্র স্বাধীন রাজার মতো ব্যবহার করে।' আরো লিখলেন: 'আমি যদি নবাবের স্থলাভিষিক্ত হতাম, তাহলে আমার প্রজাদের রক্ষার জন্য নবাব যা যা করেছেন তাই করতাম।' নবাব কোম্পানীর গবর্ণরের কাছে অভিযোগ করলেন যে প্রত্যেক পরগণায় ইংরেজদের নাম করে যথেচ্ছ অত্যাচার চলছে। রায়ত ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাল কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। যে সব জিনিষের ব্যবসায় কেবল নবাবী হুকুমে সীমাবদ্ধ যেমন নুন, সুপারি, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, বস্তা, আদা, চিনি, তামাক, আফিং প্রভৃতি জিনিষ নিয়ে ব্যবসা করছে ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদারগণ। বলছে সব ব্যবসায়ই তারা নবাবকে শুল্ক না দিয়েই করতে পারে। নবাবের এই অভিযোগ যখন কলকাতা কাউন্সিলে আলোচিত হল তখন আবার গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও হেস্টিংস নবাবী পত্রের যৌক্তিকতা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। পরিণামে তারা 'নবাবের দালাল' এই আখ্যা পেলেন এবং সংখ্যাগুরু দলের ব্যাটসন সাহেব তার তর্ককে জোরদার করবার জন্য হেস্টিংসকে চপেটাঘাত করলেন। নবাব মীরকাশিম ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছে শুল্ক আদায় করতে না পেরে সব রকমের শুল্ক আদায় তুলে দিলেন। ফলে দেশীয় বণিকরাও ইংরেজ কোম্পানী এবং তাদের দলগত লোকেদের মতো বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অধিকার পেলেন।[১১] কলকাতার কাউন্সিল স্বার্থহানীতে প্রচণ্ড রেগে নবাবের অপসারণ দাবী করলেন। ভ্যান্সিটার্ট ও হেস্টিংস আবার সংখ্যালঘু হয়ে গেলেন।

এবার ঘটনার দ্রুত সঞ্চরন হতে লাগল। কাউন্সিলের সংখ্যাগুরু দল নবাবের পদত্যাগ দাবী করলেন। পাটনায় এলিস সাহেব যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাটনাগামী নৌকা আটক করে

নবাব প্রচুর অস্ত্র পেলেন। নবাব চিরকালই জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তার মনে একটা ধারনা হয়েছিল যে জগৎশেঠদের আর্থিক সাহায্য না পেলে ইংরেজদের ক্ষমতাবৃদ্ধি রোধ করা যাবে। সুতরাং অস্ত্র বোঝাই নৌকা আবিষ্কার করামাত্র নবাবী হুকুমে মহম্মদ তকী খাঁ জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে হীরাঝিলে বন্দী করলেন। কাউন্সিলের নূতন প্রস্তাব নিয়ে অমিয়েট ও হে সাহেবদ্বয় মুঙ্গেরে নবাব সমীপে উপনীত হলেন। প্রস্তাব করলেন নূতন সন্ধির। গভীর ক্ষোভে নবাব অভিযোগ করলেন, 'ইংরেজ বহু সন্ধি করিয়াছে এবং তাহা অবিলম্বে ভঙ্গ করিয়াছে। আমি কোন সন্ধি ভঙ্গ করি নাই। সুতরাং নূতন সন্ধির কোন অর্থ হয় না।' তবু এই দুই কাউন্সিলের সদস্যের অনুরোধে বন্দুক বোঝাই নৌকা ছেড়ে দেওয়া হল। নবাবকে আশ্বাস দেওয়া হল যে এই অস্ত্র নবাবের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু অস্ত্রগুলি পাটনায় পৌছতে না পৌছতে এলিস সাহেব পাটনা আক্রমণ করলেন। দুর্গ জয় করতে না পারলেও সহর দখল করলেন। নবাব সমরু ও মার্কারকে প্রেরণ করলেন। তারা প্রথমেই পাটনা সহরকে মুক্ত করলেন তারপর পলায়নপর এলিস ও অন্যান্য ইংরেজদের গঙ্গাতীরে মাঞ্জী নামে জায়গায় সপরিবারে বন্দী করলেন। ইতিমধ্যে অমিয়েট কলকাতা রওনা হয়েছেন। পাটনা যুদ্ধের খবর পেয়ে নবাব তার গতিরোধের আদেশ দিলেন। নবাবী হুকুম নিয়ে অমিয়েটের নৌকার কাছে যেতেই ভীতত্রস্ত ইংরেজ গুলিবর্ষণ করতে শুরু করল. ক্ষিপ্ত নবাবী সৈন্য সমস্ত ইংরেজসহ অমিয়েট সাহেবকে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের মধ্যবর্তি জায়গায় বধ করল। তারিখ সেদিন ৩ জুলাই। তারপরই নবাবী সৈন্য কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করল এবং দেশীয় ব্যবসায়ীদের সমস্ত মাল লুঠ করল। বন্দর কাশিমবাজারের সমস্ত জাহাজ, নৌকা, আরঙ্গ ও গুদাম লুণ্ঠিত হল। অমিয়েটের হত্যা সংবাদ পেয়ে কলকাতা কাউন্সিল একজোট হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ১০ জুলাই মীরজাফরের সঙ্গে নূতন সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। মীরকাশিমকে বিদ্রোহী ঘোষণা করা হল।

যুদ্ধ শুরু হল। পদে পদে ভারতীয়দের যুদ্ধ বিদ্যার অভাব হল প্রমাণিত। দেখা গেল ব্যক্তিগত সাহসিকতা অথবা নবাবের প্রতি একান্ত আনুগত্য যুদ্ধ জয়ে বিশেষ সাহায্য করে না। ১৯ জুলাই, কাটোয়ার যুদ্ধে নবাব পরাজিত

হলেন। তকী খাঁ অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে হত হলেন। ২৪ জুলাই মুর্শিদাবাদ ইংরেজ দখলে এল। মেজর অ্যাডামসের হাত ধরে মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাবী তক্তে উপবেশন করলেন। ২ অগাষ্ট গিরিযার যুদ্ধে বদরুদ্দিন ও আসাদুল্লার প্রচণ্ড পরাক্রম ও বীরত্ব স্বত্বেও নবাব পরাজিত হলেন। সমরু ও মার্কার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন না। ৫ সেপ্টেম্বর মীরকাশিম উধুয়ানালায় পরাজিত হলেন। আরাটুন, মার্কার ও গুরগিণ খাঁ প্রায় বিনাযুদ্ধে পলায়ন করলেন। বার বার পরাজিত হয়ে মীরকাশিম এবার চরমপত্র দিলেন। লিখলেন যে অচিরাৎ যুদ্ধ বন্ধ না করলে তিনি এলিস সহ সমস্ত ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করবেন। এই চিঠি পেয়ে ইংরেজ কোম্পানী আরো বেশী চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। মীরকাশিমের হুকুমে তখন প্রথমে রাজা রামনারায়ণ ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গঙ্গায় ডুবিয়ে হত্যা করা হল। তারপর রাজা রাজবল্লভ আর তার পুত্র কৃষ্ণদাসকে গুলি করে হত্যা করা হল। ১ অক্টোবর নবাব পাটনা অভিমুখে পলায়ন করলেন। সেই দিনই মেজর অ্যাডামস মুঙ্গেরে পৌঁছলেন। ৩ অক্টোবর মুঙ্গের দুর্গের পতন হল। ৫ অক্টোবর মীরকাশিমের আদেশে এলিস সহ সমস্ত ইংরেজ বন্দী নারীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে নিহত হলেন। ডাক্তার ফুলারটনকে কেবল এই পৈশাচিক কীর্ত্তির প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। ১৫ অক্টোবর অ্যাডামস মুঙ্গের থেকে পাটনা যাত্রা করলেন। ১৮ অক্টোবর মীরকাশিম পাটনা ত্যাগ করলেন। বারে পৌঁছলে গুরগিণ খাঁর গুপ্তহত্যা নবাবী আদেশে সংঘটিত হল। পরদিন জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। শেঠবংশধরদের মীরকাশিম বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ৬ নভেম্বর পাটনা এল ইংরেজ দখলে। মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করলেন ডিসেম্বর মাসে। তারপর অনেক ইতিহাস। অবশেষে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধ। প্রথমে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মে অনুষ্ঠিত পাঁচ পাহাড়ির যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া যাক। সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জে মীরকাশিম, সুজাউদ্দৌলা, বাদশাহ শাহ আলম, তাঁর কর্মচারী বিরাট এক বাহিনীর অধিকর্তা বেণী বাহাদুর এবং অনুপগিরি নাগা সন্ন্যাসীর দল। কিন্তু মেজর কারণ্যাকের অধীনস্থ ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেখা গেল কেবল সুজাউদ্দিনের অধীনস্থ এনায়েত খাঁর নেতৃত্বে পাঠান বাহিনী ও অনুপগিরির

নাগাসন্ন্যাসীরা যুদ্ধ করলেন। অন্য সকলে দর্শকের ভূমিকায়। অবশেষে আর একবার পট উঠল ২২ অক্টোবর বক্সারে। ফল কি হল? সকলের জানা আছে। ইংরেজদের অভূতপূর্ব বিজয় যার ফলে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ। দেশে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ভিক্ষুক মীরকাশিমের দিল্লীতে দেহান্ত হল ৭ জুন ১৭৭৭। তার দুই পুত্র ফরাসী গভর্নর শেভেলিয়ারের অর্থানুকুল্যে তার শেষকৃত্যাদি সম্পন্ন করেন। মীরকাশিমের ইতিহাস বিয়োগান্ত সন্দেহ নাই।

বন্দর কাশিমবাজার থেকে বক্সার অনেকদূর হলেও ইতিহাস অনুসরণ করেই ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করা হল। মীরকাশিমের রাজত্বকালে ব্যবসায়ীরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। ইংরেজ কোম্পানীর গোমস্তা, তাদের আত্মীয়স্বজন, দেশীয় ব্যবসায়ীরা যারা নিজেদের ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিনিধি বা বন্ধু বলে মিথ্যাচার করতেন, এছাড়া নবাবী আমলা ও সৈন্যগণ সবাই ব্যবসায়ীদের জিনিষপত্রের ওপর হামলা করেছেন, লুঠ করেছেন বা প্রবঞ্চনা করেছেন। ফলে মীরকাশিমের রাজত্বকালে ব্যবসা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়। বহু ব্যবসায়ী ভীত হয়ে ইংরেজ আশ্রয় পাকাপাকি ভাবে গ্রহণ করেন। তীর্থ যাত্রার নাম করে অনেকে জগন্নাথ বা শ্রীক্ষেত্র (পুরী) অথবা গোকুল (বৃন্দাবন) যাত্রা করেন। মীরকাশিমের পরাজয়ের পর ইংরেজ কোম্পানী যে সব ব্যবসায়ী তাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব করে ক্ষতিপূরণ করেন। মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হয় ১, ৭১, ৭৪, ১৫৩—৬—৬ টাকা।[১২] দশ বছর পরে সম্পূর্ণ হিসাব খতিয়ান করা হয়।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ আবার ফিরে এলেন। এখন তিনি লর্ড ক্লাইভ বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। নবাব মীরজাফরের সঙ্গে চুক্তিমূলে বাংলা-বিহারের সমুদয় রাজস্ব কোম্পানীর আয়ত্তে এল। কোম্পানী পেলেন বাংলা-বিহার রক্ষার অধিকার। বাংলার নবাব কেবলমাত্র ৫৩ লক্ষ টাকা মাসহারা নিয়ে সন্তুষ্ট হলেন। মন্ত্রীমণ্ডলী ইংরেজদের নির্বাচিত হবেন স্থির হল। ১২ অগাষ্ট দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরেজ কোম্পানীকে অর্পণ করলেন। এই দেওয়ানী বলে ইংরেজদের অধিকার বাদশাহী স্বীকৃতি পেল। কাগজে কলমে যদিও ইংরেজ কোম্পানী কেবল

রাজস্বমন্ত্রী অর্থাৎ বাংলা সুবার রাজস্ব আদায় করে দিল্লীর বাদশাহকে নিয়মিত খাজনা পাঠাবার জন্তে দায়ী এবং বাংলার নবাবের ওপর দেশের রক্ষণাক্ষেণের ভার কিন্তু সে ভার তো নবাব মীরজাফর আগেই ইংরেজ কোম্পানীকে দিয়ে বসে আছেন। তাই নবাবের ফৌজদারী অধিকারও কোম্পানীর পকেটে। কার্যাত কোম্পানীকেই সুবা বাংলার শাসনকর্তা বলে স্বীকার করা হল এবং বলা চলে ১২ অগাষ্ট ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হতেই এদেশে কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হল। বাংলার নবাবের একমাত্র অধিকার থাকল 'নবাব-নাজিম' নাম আর নিয়মিত মাসহারা। নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার বালক-পুত্র মণিবেগমের গর্ভজাত নাজমউদ্দৌলা নবাব ঘোষিত হলেন। তার বাৎসরিক প্রাপ্য কমিয়ে করা হল ৪১ লক্ষ টাকা। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সেটা করা হল ৩২ লক্ষটাকা। ইংরেজরা কিন্তু মাসহারা দিতে খুব পটু ছিলেন। পুরাতন নবাব বংশীয়রা অর্থাৎ সরফরাজ খাঁর পুত্র, পুত্রবধূ থেকে সিরাজ পত্নী ওমদাৎউন্নিসা, সিরাজের প্রিয় সহচরী লুৎফ-উন্নিসা, তার কন্যা উম্মৎসায়রা বেগম এবং তার ভ্রাতা মোহনলাল পর্য্যন্ত সকলেই নিয়মিত মাসহারা পেতেন। বস্তুত এই মাসহারার তালিকা খুঁজতেই পাওয়া গেল সিরাজ-ভ্রাতুষ্পুত্র একামাদ্দৌলার পুত্র মুরাদউদ্দৌলাকে। যাঁকে কেন্দ্র করে সিরাজের বিরুদ্ধে প্রথম চক্রান্ত হয়। বহু ঐতিহাসিক একে মীরণ কর্তৃক নিহত বলেও ঘোষণা করেছেন। মুরাদউদ্দৌলা দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন বৃদ্ধা আলিবর্দী ভগিনী মীরজাফরের প্রধানা বেগম। মণিবেগমের রোষবহ্নি থেকে মীরণের পুত্রকন্যাদের বাঁচাবার আকুতিতে তাঁর কোম্পানীর কাছে লম্বা লম্বা আর্জি অত্যন্ত করুণ। দেওয়ানী পাওয়া ছাড়া কোম্পানী পেয়েছে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্বের পূর্ণ অধিকার আর কলকাতার জমিদারী। লর্ড ক্লাইভ হলেন ২৪ পরগণার জায়গীরদার। তাঁর মোগলাই উপাধি হল সবৎজঙ্গ বাহাদুর।

ইংরেজ শাসনের প্রথম ধাপেই কোম্পানীর সাহেবরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় বড়লোক হতে থাকলেন। সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ লেখক গোলাম হোসেন বর্ণনা করেছেন : 'বাংলাদেশে অর্থ কমে গেছে। শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার ও শোষণই যে তার একমাত্র কারণ তাতে সন্দেহ নাই। প্রতি বছর প্রচুর অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে। ইংরেজরা বাংলার সম্পদে নিজের দেশে ধন-

বানের মতো থাকছে।' বহুবছর পরে বার্ক তার স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব জ্বালাময়ী ভাষায় পার্লামেন্টের হাউস অফ কমনসে অভিযোগ করলেন: 'সমুদ্রের তরঙ্গের মতো সাহসী তরুণ ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীর দল ক্রমাগত ঐ দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চিরক্ষুধার্ত মাংসাশী পক্ষীর মতো তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত খাচ্ছে আর জীর্ণ করছে। তাদের ক্ষুধার শেষ নাই। স্থানীয় অধিবাসীদের অপলক হতাশ দৃষ্টি, মনের বিভ্রম, আচরণের অসহায়তা, কিছুই এই নবযুগের পশুদের নিবারণ করতে পারছে না।'[১৩] তবে এটাও ঠিক যে বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে কোম্পানী রাজদণ্ড চায় নাই, পেয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। তাদের লোভও যে আকাশচুম্বি হয়েছিল তাও সত্য। শাসিত দেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিজয়ীর উত্তমর্ণবোধ তাদের অর্থগৃধ্নু করে তুলেছিল। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ রাজত্ব চায় নাই, অর্থ নিয়ে দেশে ফিরে যেতে চেয়েছে। রাজ্য শাসনের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া মাত্র ইংরেজ ব্যবসায়ীর চরিত্রে ও কর্মে অদ্ভুত পরিবর্তণ লক্ষণীয়। যেদিন ইংরেজ বুঝতে পারল যে শাসনের গুরু দায়িত্ব তাদের সেদিন থেকেই মানসিক ও ব্যবহারিক চরিত্রে শাসকের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাটসন সাহেব কাশিমবাজারে প্রধান নিযুক্ত হলেন। হেস্টিংস উন্নিত হলেন কলকাতার কাউন্সিলে। সেখানেই তাকে মীর-কাশিমের দালাল অ্যাখ্যা পেতে হয়। ব্যাটসন তাকে আঘাতও করেন। মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার পর ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস পদত্যাগ পত্র দাখিল করে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বদেশ যাত্রা করলেন। ব্যাট-সনের সহকারী হলেন চেম্বার্স। প্রধানের এখন মাইনে হল বাৎসরিক ৫০১৬০ টাকা। কোম্পানী বহু লক্ষটাকা কাশিমবাজারের ব্যবসায়ে লগ্নি করলেন। উইলিয়াম বোল্টস্‌কে ইংরেজ ঐতিহাসিকরাই 'সব থেকে দুরাত্মা ইংরেজ' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থ বা স্বর্ণ উপার্জনের জন্য কোন কিছুই তার অসাধ্য ছিল না। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, বঞ্চনা, উৎকোচ বা অত্যাচার সব দিকেই তিনি সমান পটুত্ব দেখিয়েছেন। বোল্টস ১৭৬০ থেকে ১৭৬৭ পর্য্যন্ত এদেশে ছিলেন এবং কিছু সময় কলকাতার কাউন্সিল-কেও অলংকৃত করেন। তাঁকে জোর করে জাহাজে তুলে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তিনি কেবল ক্যাকড় টাকাতেই নয়লক্ষ টাকার বেশী

নিয়ে যেতে সক্ষম হন। বোল্টসের অর্থোপার্জনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল কাশিমবাজার।[১৪]

রেশম ও তাঁতের কাপড়ের শিল্প এই সময় অত্যন্ত উন্নতি লাভ করে। ইওরোপের সিল্কের চাহিদা ইংরেজ ব্যবসায়ীর কাছে যেন সোনার খনির দরজা খুলে দিল। রেশম শিল্পের কেন্দ্রভূমি কাশিমবাজারের সুনাম ভারতের সর্বত্র ও ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ল। গুজরাটিটুলি ও মহাজনটুলি ব্যবসার স্ফীতোদরে মুখর। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক বাঁচিয়ে অর্থোপার্জনের চমৎকার খেলায় মেতে উঠলেন এই গুজরাটি বণিককুল। এই সময় থেকেই নিম্ন বাংলায় বন্দর কাশিমবাজার রেশম, রেশমী সুতা ও রেশমী দ্রব্য রপ্তানী করে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। পরবর্তী ত্রিশ বছর কেবল রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারই কাশিমবাজারকে 'বন্দরের রাণী' আখ্যায় ভূষিত করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে কাশিমবাজার বন্দরের উন্নতির একমাত্র কারণ ইওরোপে রেশমের চাহিদা বৃদ্ধি এবং সেই প্রয়োজন মেটাতে বিদেশী কোম্পানীর প্রচেষ্টা। বিদেশে রেশমের চাহিদা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজারের পতন শুরু। রেশমের ব্যবসা বন্ধ হওয়ামাত্র বন্দর কাশিমবাজারের বিলুপ্তি। নিঃসন্দেহে তাই বলা যায় যে রেশমের ব্যবসার উত্থানপতনের সঙ্গে বন্দর কাশিমবাজারের ভাগ্য অঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাই দেখা যায় ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানীর সঙ্গে দিনেমার ও অস্ট্রিয়ার বণিকগণও রেশমের ব্যবসায় জড়িত। কিছু আরব বণিককেও নানা হিসেব পত্রের মধ্যে দেখা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লিখে পাঠালেন যে কাঁচা রেশমের রপ্তানী বৃদ্ধির উপরই তাদের আয় বৃদ্ধি নির্ভর করেছে।[১৫] পরের বছর অর্থাৎ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার লিখে পাঠালেন যে দেশী রেশম কাঁচা রপ্তানী না করে ইংরেজরা যেন কাঁচা রেশম লেচী করে পাঠাবার দিকে (winding) বেশী মনোযোগী হন। স্পষ্ট ভাষাতেই বিলেতের কর্তৃপক্ষরা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করলেন। তাঁরা লিখলেন: কাশিমবাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সিল্কের ব্যবসা তুলে নেবার জন্য প্রয়োজন হলে অনেক বেশী দামে যেন কাঁচা রেশম ক্রয় করা হয়। সর্দারেরা যাতে কাঁচা রেশম থেকে কোন পাকা রেশম তাদের বাড়ীতে তৈরী করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজন হল সরকারী আদেশ জারী করতে

হবে। যারা এই আদেশ অমান্য করবে তাদের কঠিন শাস্তি দিতে হবে।'[১৬] কাঁচা রেশমের চাহিদা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাণ্ডজ্ঞানও হরণ করেছিল। সেপাই পাঠিয়ে সৈদাবাদের আর্মেণীয় ব্যবসায়ীদের দরজা ভেঙ্গে কাঁচা রেশম লুঠ করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছিল। কাঁচা রেশমকে চরকায় কেটে রেশমের সুতো তৈরী করত 'নাথদ'রা। দলকে দল 'নাথদ'দের ধরে এনে ইংরেজ ফ্যাক্টরীতে বন্দী করে রাখা হত। এই সব তাঁতীরা যাতে রেশমের সুতোর প্রচলন না করতে পারে তাই তাদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলা হত। ১৭৫৮ থেকে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রেশম ছিল কেবলমাত্র লাভের একটি পণ্য, কিন্তু ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রেশমের ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল ইংরেজদের এক বিরাট জাতীয় পরিকল্পনা।[১৭] রেশম রপ্তানীকে চরম স্বাদেশিকতা ও দেশ-প্রেমের প্রকাশ বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ গণ্য করতে লাগলেন। তার কারণ বাংলার চরকায় যে সুতো তৈরী, তা হত কমজোর তার ফলে বুননের সময়ে ছিঁড়ে যেত। বিশেষ ইংল্যাণ্ডের তাঁত যন্ত্রের টান চরকায় কাটা সুতো সহ্য করতে পারত না। উপরন্তু দেশী রেশমের সুতোয় গিঁট থাকত, তাতে দেশী তাঁতের কাপড় বুনতে কোন অসুবিধা হত না, কিন্তু বিদেশের যন্ত্রে লাগান মাত্র গিঁটে গিঁটে ছিঁড়ে যেত। কাঁচা রেশমের রপ্তানী করে যন্ত্রের সাহায্যে যে সুতো তৈরী, তা টেকসই ও জেল্লাদার হত। কাজেই যেনতেন প্রকারেন কাঁচা রেশম ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী করতে পারলে লাভের অঙ্কটা বড় হয়। ইওরোপের বাজারে চীনা ও ইতালীয় রেশমের তুলনায় বাংলার রেশম সস্তা ও উৎকৃষ্ট পণ্য হওয়ায় বাংলার রেশমের চাহিদা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেল। কোম্পানী রেশমে টাকা লগ্নি করা বৃদ্ধি করলেন। বেসরকারী ব্যবসাতেও কোম্পানীর কর্মচারী আর তাদের অনুগতরা এই রেশমী ক্ষুধার সুযোগ নিল। ক্রমাগত হাত বদলাবার ফলে কাঁচা রেশমের দাম বৃদ্ধি হতে লাগল। চাষী ও ক্রেতার মাঝে অর্থাৎ তৈরী ও বিক্রয়ের মাঝে বহু মুনাফাকারী দালালী করতে ঢুকে গেল। এই প্রচণ্ড লোভ শেষ পর্য্যন্ত রেশম ব্যবসায়ের মৃত্যুবান হল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেশমশিল্প মুনাফাকারীদের লোভের শিকার হল।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দেই রেশম ব্যবসায়ের প্রথম নাভিশ্বাসের খবর মেলে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (ইংরেজী ১৭৬৯-৭০॥ বাংলা ১১৭৬॥) সিল্কের গুটিপোকার

চাষীরা যখন মারা গেল অথবা দেশ থেকে পালিয়ে গেল, তখন কাঁচা রেশমের দাম হঠাৎ বৃদ্ধি পেল। পাইকার এবং খুচরা দালালরাও লাভের লোভে চড়া সুদে টাকা দাদন দিতেন। তার ফলে গুটিপোকার চাষী ও রেশমের তাঁতীরা পাইকারদের খপ্পরে পড়ে গেল। কাঁচা রেশমের খুচরা ও পাইকারী বাজার হিসেবে তখন কাশিমবাজারের প্রসিদ্ধি আকাশ ছোঁয়া। কাজেই বিদেশী কোম্পানীগুলি ভীড় করে এল এবং পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষিতে রেশমের মূল্য বৃদ্ধি করল। এই মূল্য বৃদ্ধির সুফল কিন্তু রেশমের 'চাষা' (ইংরেজীতে লিখেছে chasars) বা তাঁতী পেল না। মুনাফার পুরো টাকাটাই দাদনদার পাইকারদের কুক্ষিগত হয়ে গেল। বিদেশী কোম্পানীগুলির তাতে আনন্দ ছাড়া দুঃখ হল না। তারা রেশমের চাষী ও তাঁতীদের নিজেদের বশে পাবার জন্য জোর চেষ্টা করতে লাগলেন। ফরাসী ও ওলন্দাজ কোম্পানী চাষী ও তাঁতীদের ভাগাভাগির প্রস্তাব করলেন কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি স্ফীতোদর ইংরেজ এই প্রস্তাব মেনে নিলেন না। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী কোম্পানী বাংলা থেকে প্রায় লুপ্ত। চন্দননগরে তাদের অবস্থান তখন ইংরেজদের দয়ায় আর ইওরোপের যুদ্ধের চুক্তির ওপর নির্ভরশীল। ওলন্দাজ ব্যবসাও স্তিমিত। তাই চন্দননগরের ফরাসী 'শিভেলিয়র' যখন প্রস্তাব করলেন যে ফরাসী ও ওলন্দাজ বাণিজ্য দ্রব্য ও রেশম সম্ভার কলকাতার ইংরেজ আরঙ্গে রাখা হোক তখন ইংরেজ হেলায় সে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। ইংরেজরা যে এদেশে দানছত্র খুলতে আসেন নাই বোঝা গেল দুই বছর পর। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রেশম সম্ভারের ইংরেজরা একমাত্র অধিপতি। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার ছাপান সূতি কাপড় বা 'ক্যালিকো' ইওরোপের বাজারে ছিল সর্বাগ্রগণ্য। এমন কি ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইএর দরবারে রেশমের রুমাল এমন জনপ্রিয় হল যে সম্রাট থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকদিন নূতন নূতন রঙের রেশমী-রুমাল ব্যবহার করাই ফ্যাশানের পরাকাষ্ঠা মনে করতেন। 'বালুচরী' ইওরোপের বাজারে এমনই জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে ইংরেজরা বালুচরীর রপ্তানী জোর করে বন্ধ করে দিয়ে ইংল্যাণ্ডে রেশম ও সূতি থান বালুচরী ঢঙে ছাপিয়ে বাজার মাৎ করবার চেষ্টা করলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজকোম্পানীর মাথায় এক নূতন বুদ্ধি ঝিলিক মারল। তারা বাংলার কাঁচা রেশম থেকে মসলিন তৈরী করে আবার

ভারতেই বিক্রির জন্য পাঠাতে শুরু করলেন। ম্যাঞ্চেস্টারের তাঁতযন্ত্র সস্তায় মসলিন তৈরী করতে লাগল, তার ফলে দেশী মসলিনের থেকে কুড়ি টাকা কমে বিলিতী মসলিন বিক্রি সম্ভব হল। রেশমের ব্যবসায় ইংরেজদের একচেটিয়া প্রভুত্ব স্থাপিত হল। কাশিমবাজারের ওলন্দাজ কুঠী বন্ধ হবার সম্ভাবনাতেই তাঁতীরা ইংরেজ কোম্পানীর কাছে চলে গেল। বাংলার অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ বণিক কোম্পানীর মুষ্টিবদ্ধ হয়ে পড়ল।[১৮] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আধিপত্যের ইতিহাস বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে কেবল রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক প্রভুত্বও কিভাবে ইংরেজ কোম্পানীর হাতে গেল। এবং সেটা বোঝার চাবি বন্দর কাশিমবাজারের কথা।

ওলন্দাজ কোম্পানীর ব্যবসা ধ্বংস ইংরেজদের বড় কীর্তি। সেটা কি করে সংঘটিত হল এবার দেখা যাক। মনে রাখতে হবে যে চুঁচুড়াতে ওলন্দাজ ও শ্রীরামপুরে দিনেমার কোম্পানীর বিরাট ঘাঁটি ছিল। শুল্ক ফাঁকি দেবার জন্যে বহু ইংরেজ ও ফরাসী ব্যবসায়ী এই দুই জাতির জাহাজ নিয়মিত ব্যবহার করতেন তারপর ইওরোপের কোন অখ্যাত বন্দরে মাল খালাস করে পুরো টাকাটাই পকেটস্থ করতেন। সুতরাং এবার ওলন্দাজ কোম্পানীর খবর নেওয়া যাক।

বাংলায় ব্যবসার প্রথম যুগে বিদেশী কোম্পানীগুলির মধ্যে ওলন্দাজরাই ছিলেন প্রধান। পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল। অর্থলগ্নি কথায় বা মোট ব্যবসার হিসেবেও ওলন্দাজদের প্রাধান্য কেউ অস্বীকার করে নাই। কিন্তু রাজনীতিতে তারা ছিলেন উদাসীন। ব্যবসা ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে তারা সযত্নে রাজনীতির ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলেছেন। ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের মনোমালিন্যের সময় যেমন, তেমনি নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের শক্তি পরীক্ষার সময়েও তাঁরা নীরব নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করেছেন। এই নিরপেক্ষতাই ওলন্দাজ বণিকদের সর্বনাশের কারণ হল। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নবনিযুক্ত নবাব মীরজাফর যখন বৃহৎ 'নজরানা'র দাবী তুললেন তখন বুঝতে কষ্ট ছিল না যে ইংরেজদের প্ররোচনা পেছনে আছে। তার কিছুদিন পরেই প্রথমে রায়দুর্লভ এবং তার পদচ্যুতির পর নন্দকুমার যখন ওলন্দাজদের কাছে ইংরেজ বিতাড়নের প্রস্তাব পাঠালেন তখনও ইংরেজদের ক্ষমতা সম্পর্কে ওলন্দাজদের ধারনা স্পষ্ট নয়। তাই দেখা যায় কাশিমবাজারের

ওলন্দাজ কুঠীর প্রধান ও নবাব দরবারে ওলন্দাজ প্রতিনিধি ভেরনেটের প্রস্তাবক্রমে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গবর্নর বিসডম বাটাভিয়া থেকে সৈন্য আনা স্থির করলেন। নবাবের আড়ালে ইংরেজরা যে তাদের ব্যবসাকে বিপন্ন করছে বুঝতে পারলেও ইংরেজরা যে নবাবকে চালনা করছে তা ওলন্দাজ বণিকরা তখনও বুঝতে পারেন নাই। নানাদিক থেকে ওলন্দাজ ব্যবসায়ে বাধা সৃষ্টি করা হল। তাঁতীদের চুরি করা কিংবা ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। গোমস্তাদের হয়রান করা, ওলন্দাজ জাহাজ থেকে ব্যক্তি সম্পত্তি ও নাবিক অপহরণ, এমনকি ওলন্দাজ মানী ব্যক্তিদের গায়ের বা অপহরণের অভিযোগ নবাবের দরবারে প্রতিদিন আসতে লাগল। ক্লাইভ সাহেব খুব ধৈর্য্যবান লোক ছিলেন এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। ক্রমান্বয়ে অভিযোগ নবাবের কাছ থেকে পেতে পেতে অবশেষে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর বিদেরার যুদ্ধে ওলন্দাজ শক্তি ইংরেজের কাছে সম্পূর্ণ পরাভূত হল বটে, কিন্তু ওলন্দাজ বাণিজ্য বন্ধ হল না। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৮৫৭৯ মন সোরা প্রতি বছর তাঁদের রপ্তানী করতে দেখা যায়। বিহারের সোরা তৈরীর অধিকার ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে তারা প্রতি বছর নিয়মিত ২৩০০০ মণ সোরা পেতেন রপ্তানি করবার জন্য। এছাড়া আফিম, রেশম কাটা কাপড় ও রেশমের তৈরী জিনিষের ব্যবসাও চলতে থাকে।[১৯] ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত বোর্ড অফ ট্রেড লণ্ডনের পরিচালকমণ্ডলীকে জানালেন: এ বছর ওলন্দাজরা বাংলায় কোন অর্থ লগ্নি করে নাই।[২০] সুতরাং এই বছর থেকেই ওলন্দাজদের বাংলার ব্যবসা শেষ হয়েছে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

ওলন্দাজ হল এবার দিনেমার। শ্রীরামপুরের দিনেমার গবর্নর ওলবাই ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঢাকার ইংরেজ কুঠীর প্রধান বেব সাহেব জানান যে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ থেকে সূতি ও রেশমের কাটা কাপড় বে-আইনীভাবে দিনেমার জাহাজে ইওরোপে যায়। সেখানে এই বেআইনী ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র হল কোপেনহেগেন, লিসবন, অস্টেণ্ড প্রভৃতি বন্দর। ইংরেজরা ক্রমান্বয়ে লেগে থাকায় দিনেমার ব্যবসায় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পর ভাটা পড়ে যদিও ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁরা ভারতীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছেন।[২১]

আর্মেণীয় বণিকরা প্রতিবছর কাশিমবাজার থেকে ১০০ মণ সিল্ক, সুরাটে এবং একহাজার মণ সিল্ক মির্জাপুর, নাগপুর, ছত্তরপুর, বেনারস ও অন্যান্য জায়গায় নিয়মিত পাঠাতেন।[২২] আর্মেণীয় বণিকগণ বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় বাণিজ্যের ফরমান লাভ করেন। তদনু-যায়ী কাশিমবাজারের সংলগ্ন সৈদাবাদে বসতি স্থাপন করেন। শ্বেতাখাঁর বাজারে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী গির্জা আজ আর্মেণীয়দের বসবাসের একমাত্র নিদর্শন। খোজা গ্রেগরী যিনি গুরগিণ খাঁ নামে নবাব মীরকাশিমের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তাঁরও বাড়ী, বাগান ও কাটা কাপড়ের দোকান এই সৈদাবাদেই অবস্থিত ছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে আর্মেণীয় বণিকরা অভিযোগ করেন যে তাঁদের নিযুক্ত রেশমের তাঁতীদের ইংরেজ কোম্পানী বলপূর্বক ধরে নিয়ে গেছে। আর অভিযোগ করা হয় যে ইংরেজ বণিকগণ জোর করে রপ্তানির জন্য রাখা কাঁচা রেশম ও সুতি কাটা কাপড় অপহরণ করে নিজেদের রপ্তানি গুদামে আটক রেখেছে। কেবল দেশের মধ্যে নয় বহিসমুদ্রেও ইংরেজ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীগণ আর্মেণীয় জাহাজ দখল করে তাদের দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠন করে রপ্তানি করত।[২৩] এই সময়কার কথা লিখতে গিয়ে কর্নেল জেমস রেনেল জানাচ্ছেন যে কাশিমবাজারে প্রস্তুত রেশমে ভারতবর্ষ ও এশিয়ার বহু জায়গা ছেয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র ইওরোপের বিভিন্ন সহরের যান্ত্রিক তাঁতে কমপক্ষে তিন থেকে চারলক্ষ পাউণ্ড ওজনের, খালি কাঁচা রেশম ব্যবহৃত হত।[২৪]

কাশিমবাজারের গুজরাটি ব্যবসায়ীগণ প্রতিবছর মির্জাপুর ও বেনারসে দুইশত থেকে তিনশত মণ রেশমের থান পাঠাতেন। সম্ভবত মির্জাপুর থেকে এই থান নাগপুরে গিয়ে জামাকাপড়ে রূপান্তরিত হত। কাশিম-বাজারের সিল্ক থেকেই নাগপুরে, ছত্তরপুরে (মধ্যপ্রদেশে) এবং পুণায় কিংখাপ ও গুলবাহার বা ব্রোকেড তৈরী করা হত। সাটিন ও অন্যান্য নানারকমের রেশমের রূপান্তর লক্ষণীয়। মির্জাপুরে কাঁচা রেশমও বিক্রির জন্য পাঠান হত। মির্জাপুর থেকে কাঁচা রেশম মুলতান ও লাহোরে যেত। কাশিমবাজার থেকে গুজরাটি বণিকগণ যত রেশম রপ্তানি করতেন তার মধ্যে সাত আনা সমুদ্র পথে যেত সুরাটে, চার আনা করে যেত মির্জাপুর ও নাগপুরে আর এক আনা যেত বারাণসীতে।[২৫] এই সময়-

কার ভারতীয় রেশম শিল্পকে গুজরাটি বণিকগণ যে নিয়ন্ত্রিত করতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এদেরই দুর্জয় লোভ ধীরে ধীরে কাশিমবাজারের রেশম শিল্পের মৃত্যু ঘটাল।

কাশিমবাজারের রেশম ও সুতার কাটা কাপড়ের ব্যবসা সম্পর্কে সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দী অত্যন্ত মূল্যবান। সদানন্দের এই বিবৃতি ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কুমারখালির রেসিডেন্টের কাছে দেওয়া। রেসিডেন্ট কলকাতার বোর্ড অফ ট্রেডএর কাছে সদানন্দের বক্তব্যের ইংরেজী বিবরণ পাঠিয়ে দেন। জবানবন্দী থেকে আমরা জানতে পারি যে সদানন্দ কাশিমবাজারের গুজরাটি ব্যবসায়ী গিরিধারী দাসের গোমস্তা। তিনি ত্রিশ বছরের কিছু বেশী রেশম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং তার বিবরণের মধ্যে তার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। তার কথা থেকে জানা যায় যে ১৭৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একহাজার মণ কাঁচা রেশম কাশিমবাজার থেকে কলকাতায় যায় এবং সেখান থেকে সুরাটে পাঠান হয়। পরবৎসর সিল্কের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ফলে মাত্র পাঁচশো মণ রেশম পাঠান সম্ভব হয়। সুরাটের জন্য রেশম সংগ্রহ করা হত প্রধানত শেরপুর, সারাবাট, বাউলিয়া, কুমারখালি ও রাধানগর থেকে। গুজরাটি ব্যবসায়ীরা রাধানগরের রেশম ও কাশিমবাজারের তানা বা টানা পছন্দ করতেন। এই দুইরকম রেশম সংগ্রহ করতে পারলে অন্য কোথাও তাঁরা রেশমের খোঁজ করতেন না। এই সময় অর্থাৎ ১৭৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে সাতজন গুজরাটি বড় ব্যবসায়ী কাশিমবাজারে ছিলেন। সদানন্দ তাদের নাম বলেছেন, নীলমণি দাস, গিরিধারী দাস, গোবিন্দ দাস, নরসিংহ দাস, গোলাপ চাঁদ, তুলসী দাস ও গোপীজীবন দাস। রেশমের ব্যবসার সঙ্গে তারা প্রচুর পরিমাণে তুলার ব্যবসা করতেন। এই তুলা থেকেই বাংলার সূতি কাপড় তৈরী হত। গুজরাটি ব্যবসায়ীরা অনেক সময়ে রেশমের বিনিময়ে তুলা সংগ্রহ করতেন। এই তুলা সাধারণত সুরাট ও মিরাট থেকে সংগৃহীত হত। বাংলার কার্পাস থেকে দেশী তুলা শান্তিপুর ও তার আশপাশে নদীয়াতে, মুর্শিদাবাদে এবং মৈমনসিংহ জেলাতে উৎপন্ন হত। সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে রেশম শিল্প তখন অবনতির মুখে। রেশমের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় নিম্নমানের রেশম সূতার ভেজাল দেওয়া শুরু হয়েছে। তাছাড়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বহু রেশম চাষীর মৃত্যু হওয়ায় চাষ

কমে গেছে। সদানন্দ বলেন যে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে দশজন বড় গুজরাটি ব্যবসায়ী কাশিমবাজারে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে সমুদ্রপথে কমবেশী ষাট গাঁইট করে কাঁচা রেশম প্রতিবছর বোম্বাই ও সুরাটে পাঠাতেন। প্রতি গাঁইটের ওজন ছিল পঁচিশ থেকে সাতাশ মণ। প্রতি গাঁইটের এই সময়কার দাম দশহাজার টাকার কিছু বেশী। এই সময় তাঁর মতে গুজরাটি বণিকগণ প্রায় বিশহাজার মণ রেশম প্রতিবছর রপ্তানি করতেন। ক্রমে এই পরিমাণ কমে আসে।[২৬] সদানন্দের জবানবন্দি থেকে দেখা যায় যে রেশম শিল্পের শ্রেষ্ঠ সময়ে একটন রেশমের মূল্য ছিল দশহাজার টাকার থেকে বেশী। সুতরাং রেশমের এক সেরের মূল্য ছিল দশটাকা। এই দর কিন্তু ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই আছে। অর্থাৎ ১৭৮০কেই রেশম শিল্পের অধঃপতনের শুরু বলে গন্য করতে হবে। প্রমাণ স্বরূপ কাশিমবাজারের এক বাঙালী ব্যবসায়ীর রেশম ব্যবসার খোঁজ নেওয়া যাক।

সাত

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের আগেই কৃষ্ণকান্ত নন্দী বেশ গুছিয়ে বসেছেন। দশ এগার বছরের চেষ্টায় পৈতৃক রেশম ব্যবসায় ভালই চলছে। বড় বাড়ী কিনেছেন, জমিদারী কিনেছেন, সম্পত্তি করেছেন। আবার বিবাহ করেছেন, পুত্র সন্তান জন্মেছে। তিনি হেস্টিংস সাহেবের বেনিয়ান হয়েছেন ১৭৫৪ থেকে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তারপর সাইকস সাহেবের বেনিয়ান হন ১৭৬৫ থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তারপর একবছর ফকর কোণ্ডির ট্রেজারির দারোগা হলেন ১৭৬৯ থেকে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ভাইদের ব্যবস্থা করেছেন। তৃতীয় ভাই কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে ইংরেজ কোম্পানীর শান্তিপুর আরঙ্গের গোমস্তা হলেন পরে জগৎশেঠের গোমস্তারূপে যোগ দিলেন। চতুর্থ ভাই নৃসিংহ ব্যবসায়ী। পৈতৃক ব্যবসায় দেখার ভার থাকল তার ওপর। পরে যখন কান্তবাবু স্বয়ং বেনিয়ানগিরি ছেড়ে ওই জায়গায় বসলেন তখন নৃসিংহ ইংরেজ সাহেবদের বেনামদার হলেন। অর্থাৎ সাহেবদের নামে যে রেশম ব্যবসা হত তিনি সেইগুলির দেখাশোনা করতেন। নৃসিংহের পুত্র বৈষ্ণবচরণ কিন্তু পিতৃব্যের কাছে শিক্ষিত হয়ে ভার নিলেন বেসরকারী রেশমের যোগান দিতে। কাজেই গুজরাটি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ হল। গুজরাটি ব্যবসায়ীদের রেশমের যোগানদার হিসেবেই বৈষ্ণবচরণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই গণ্যমান্য ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কান্তবাবুর সুবন্দোবস্তে কাশিমবাজারের রেশম শিল্পের বেশ বড় একটা অংশের যোগানদার হলেন নৃসিংহ ও বৈষ্ণবচরণ। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ইংরেজ এবং দলগত ব্যবসায়ী গুজরাটি বণিকগণ এদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলেন। কোম্পানীর ব্যবসায় পুত্র লোকনাথের নামে পত্তন করে, ইংরেজ কোম্পানীর রেশমের বড় যোগানদার হয়ে উঠলেন কান্তবাবু। এবার এই শেষোক্ত ঘটনার বিশদ বিবরণ দেওয়া যাক।

ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে প্রথম কারবার শুরু করলেন কান্তবাবু নিজেই ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তিনি কোম্পানীর কোন কর্মচারীর সঙ্গে যুক্ত নন কাজেই স্বনামে ব্যবসা করতে তার কোন বাধা ছিল না। প্রথমে তিনি রেশমের পলু বিক্রি করলেন। প্রথম বছরকার ব্যবসার পরিমাণ মাত্র ১৩

মণ ১৭ সের ১৩ ছটাক। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে পলু বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হল ২১১ মণ ৮ সের ৪ ছটাক।[২] পলু সরবরাহের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও পলুর দামের মধ্যে অনেক কথাই বলা হল। দেখা গেল কান্তবাবু যে পলু সরবরাহ করেছেন তার দাম সের প্রতি ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটাকা পাঁচ আনা তিন পাই ও ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে একটাকা এগার আনা ছয় পাই। অথচ এই বছর নিকোলাস গ্রুবার নামে কোম্পানীর কর্মচারী একই পলু সরবরাহ করেছেন সের প্রতি দুই টাকা চোদ্দ আনা পাঁচ পাই দরে এবং কোম্পানীর গোমস্তা সরবরাহ করেছেন সের প্রতি চার টাকা তিন আনা দরে। কমিটি অফ সারকিট যখন ব্যবসা সম্পর্কে তদন্ত করতে এলেন ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাদের চোখে সহজেই কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তার দেওয়া দর বিসদৃশ লাগল। খোঁজ খবর নিয়ে তাদের বুঝতে বাকী থাকল না যে কোম্পানীকে ঠকাবার কি বিপুল আয়োজন করা হচ্ছে। তাদের কাছে কান্তবাবুর মূল্য বৃদ্ধি হল। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে তারা রিপোর্টে লিখলেন: ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর রেশমের চাষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে সত্য কিন্তু সেই ক্ষতির ফলে রেশম বা পলুর মূল্য শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে। এই বৃদ্ধিই যুক্তিসঙ্গত হইত। দেখা যাইতেছে যে কোম্পানী ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের যে মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার উপর শতকরা ষাট টাকা দিতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা আশি টাকা পর্য্যন্ত বেশী মূল্যে রেশম দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে।'[৩]

ইতিমধ্যে হেস্টিংস সাহেব মাদ্রাজে পৌছেই সিল্কের ব্যবসা শুরু করেছেন। তার পত্র নিয়ে দুইজন ব্যবসায়ী কান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করে এবং হেস্টিংসের ইপ্সিত রেশম সম্ভার কান্তবাবু এই ব্যবসায়ীদের মারফৎ পাঠালেন ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর। তাঁর পরবর্তী কীর্তিকলাপ খুবই সুনির্দিষ্ট পথে চলল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারী কলকাতা কাউন্সিল কাশিমবাজারের কুঠী প্রধানের পত্রের সঙ্গে কাশিমবাজারের রেশম ব্যবসায়ীদের একখানি দরখাস্ত পেলেন। এই দরখাস্তে আবেদন করা হয়েছে যে তারা কলকাতার রেশম ব্যবসায়ীদের থেকে সহজ কিস্তিতে কোম্পানীর সঙ্গে রেশমের ব্যবসা করতে চান।[৪] কর্মের দক্ষতা দেখাবার জন্যে কান্তবাবু পুত্র লোকনাথের নামে এক বছরের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন এবং অপূর্ব দক্ষতায় দুই হাজার

সিণ্টজ্ এবং তার সঙ্গে কাঁচা রেশম ও রেশমের নানা সামগ্রী সরবরাহ করলেন। এই ব্যবসায় লোকনাথের অংশীদার হিসেবে এক মুসলমান ভদ্রলোকের নাম দেওয়া হয়েছিল। কারণ তখনকার দেশের আইন অনুসারে কোন মুসলমান ব্যবসায়ে জড়িত থাকলে হিন্দু ব্যবসায়ীদের শুল্কের অর্ধেক দিতে হত। কাজেই মুসলমান ভদ্রলোকরা প্রায়ই ঘুমন্ত অংশীদার হয়ে হিন্দু ব্যবসায়ীদের অর্ধেক শুল্ক দেবার সুবিধা করে দিতেন এবং বিনিময়ে না দেয় শুল্কের কিছু অংশ নিয়ে খুশী থাকতেন। মোগল আমলের পতন মুহূর্তে এই শুল্ক তারতম্য মুসলমান অর্থবানদের ব্যবসায়ে সক্রিয় করতে পারে নাই এটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা সন্দেহ নাই।

লোকনাথ ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা করতে শুরু করে দাদনী প্রথার যে সুযোগ নিলেন তা একমাত্র কান্তবাবুরই তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রসূত মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সব থেকে বড় কারণ হল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লোকনাথ নন্দীর বয়স আট বছর পূর্ণ হয় নাই। কালবিলম্ব না করে কাশিমবাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা লোকনাথের সঙ্গে একমত হয়ে দরখাস্তে স্বাক্ষর করলেন। কলকাতা কাউন্সিল প্রস্তাব মঞ্জুর করলে ব্যবসা শুরু হল। কলকাতার ও কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীদের দাদনের তুলনামূলক আলোচনা করবার আগে মনে রাখতে হবে যে রেশমের জগতে বসে কাশিম-বাজারের ব্যবসায়ীর পক্ষে অধিক অর্থ লগ্নি করা কঠিন ছিল না। কিন্তু কলকাতার ব্যবসায়ীর পক্ষে অর্থলগ্নি করে বস্তুর অপেক্ষায় বসে থাকা এবং সেই বস্তু কেমন হবে না জেনে অর্থ বিনিয়োগ করা অসম্ভব ছিল। এই পথটা দিয়েই কান্তবাবু কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশ ঘটালেন। এবার দাদনী ব্যবস্থার তুলনামূলক অবস্থা দেখা যাক।[৫]

তুলনামূলক অবস্থা

দাদনী ব্যবস্থা	কাশিমবাজারে	কলকাতায়
চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে	কিছু না	শতকরা পঞ্চাশ টাকা
১লা মার্চে	শতকরা পঁচিশ টাকা	কিছু না
১লা মে	শতকরা সাড়ে বারো টাকা	কিছু না
১লা জুন	কিছু না	শতকরা কুড়ি টাকা
১লা জুলাই	কিছু না	শতকরা পনের টাকা
চুক্তি মতো সরবরাহ সম্পূর্ণ হলে	শতকরা সাড়ে বাষট্টি টাকা	শতকরা পনের টাকা

উপরের অবস্থা থেকে দেখা যাবে যে মাল পাবার অনেক আগেই কলকাতার ব্যবসায়ীদের চুক্তিমূল্যের শতকরা পঁচাশি টাকা ইংরেজ কোম্পানীকে দিয়ে দিতে হত। অথচ কাশিমবাজারে মাত্র শতকরা সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা দিলেই কার্যসিদ্ধি হত। বলাবাহুল্য ইংরেজ কোম্পানী কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রেশম কেনা পছন্দ করতেন। বেশী টাকা নিয়েও কিন্তু কলকাতার ব্যবসায়ীরা প্রত্যেক লক্ষ টাকায় সাড়ে সতের হাজার টাকার বেশী লাভ করতে পারতেন না।[৬] তুলনায় কাশিম-বাজারের ব্যবসায়ীরা লাভ করতেন অনেক বেশী। সাধারণ ব্যবসায়ী এক লক্ষ টাকায় পঁচিশ হাজার টাকার বেশী লাভ করতেন। কান্তবাবুর মতো বড় ব্যবসায়ী যারা রেশম জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখতেন তারা প্রায়ই এক লক্ষ টাকায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করতেন। কান্তবাবু নিজেও রেশমের দাদন দিতেন সেইখান থেকে হিসেব করলে একটি প্রায় অসম্ভব চিত্র চোখে পড়বে। সেটি হল প্রতি এক লক্ষ টাকায় এক লক্ষ টাকা লাভ। এই ঘটনা যে অলীক কল্পনা নয় তা এই পরিচ্ছেদেরই শেষের দিকে দেখা যাবে। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার সাহেব ব্যবসায়ীদের টনক নড়ল। তাঁরা দৌড়ে কাশিমবাজারে এলেন এবং সেখানকার নামী ব্যবসায়ী-দের সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে উপনীত হলেন। যেমন নৃসিংহ নন্দী কাগজে কলমে ছিলেন কেবল জেমস ইরউইন সাহেবের জামিনদার। কিন্তু ইরউইনের ব্যবসা তিনি চালাতেন। বার্ষিক প্রায় নয়লক্ষ টাকার ব্যবসা হত তার মধ্যে কতটুকু ইরউইনের অর্থ আর কতটুকু নৃসিংহের অর্থ ধরা সহজ নয়। তবে ইরউইন সাহেব নিঃসন্দেহে কিছু টাকা তুলে নিতেন এবং সেই টাকা শতকরা আটটাকা সুদে কোম্পানীতে লগ্নি করতেন। দেখা যাচ্ছে কোম্পানীর খাতায় ইরউইন সাহেবের দেড় লক্ষটাকা বৃদ্ধি হয়ে প্রায় সাড়ে তিনলক্ষ হয়ে যাচ্ছে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই।[৭] সহজেই মনে করা যেতে পারে যে সাহেব মূলধন ঠিক রেখে লাভের টাকাটা তুলে নিতেন, এবং নিজের খরচ-পত্রের পর উদ্বৃত্ত অর্থ কোম্পানীর ঋণপত্রে লগ্নি করতেন।

এইসব কারণেই কাশিমবাজারের রেশমের মূল্য সাংঘাতিক বৃদ্ধি পেল। আবার একটু তুলনা করা যাক ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের বাইশে এপ্রিল কান্তবাবুদের ঘর থেকে বৈষ্ণবচরণ নন্দীর নামে যে রেশমসামগ্রী ইংরেজ কোম্পানীকে

বিক্রি করা হয়েছিল তার মূল্যের গড়পড়তা ছিল প্রতিসেরে পাঁচ সিক্কাটাকা দশআনা এবং ৫১/২ পাই। অর্থাৎ প্রচলিত টাকায় মূল্য হল গড়ে সাত টাকা। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ কুড়ি বছর পরে রেশমী দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হল গড়ে শতকরা ২৪৭ ভাগ।

লোকনাথ নন্দী ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিম্নতম দরে রেশমী দ্রব্য সরবরাহের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলে তার দর অনুমোদিত হল। সেই দ্রব্য ও দর নীচে দেওয়া হল।৮

দ্রব্য	দর				
	প্রতিখণ্ডের মূল্য হল সিক্কাটাকা				
ডুরেকাটা টাফেটা	”	” ”	”	১৩-১৩-০	পাই
লালরংয়ের টাফেটা	”	” ”	”	১৩-১৩-০	পাই
কালরংয়ের টাফেটা	”	” ”	”	১৩-১০-০	”
সাদা রংয়ের টাফেটা	”	” ”	”	১৩-৮-০	”
বিশেষ সিঁদুরে রং টাফেটা	”	” ”	”	২১-৮-০	”
লুঙ্গি রুমাল	”	” ”	”	১২-১১-০	”
মুগা রুমাল	”	” ”	”	১২-৭-০	”
ফুলিকাট বা ফুলকাটা রুমাল	”	” ”	”	১২-৮-০	”
পামরী বন্ধনী	”	” ”	”	৯-৩-০	”
সাধারণ বন্ধনী	”	” ”	”	৬-১২-৬	”
সাধারণ ছাপা বন্ধনী	”	” ”	”	৬-১২-৬	”
সরেস ছাপা বন্ধনী	”	” ”	”	৭-৪-০	”
সরেস বন্ধনী	”	” ”	”	৭-৪-০৮	”

এই সময়ে কাশিমবাজারের রেশম শিল্পের বাড়-বাড়ন্ত হল বিদেশী চাহিদায়। বিদেশীদের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানী সব থেকে বেশী রেশমদ্রব্য রপ্তানী করত। কেন করত বা করে কি করত? অর্থাৎ এত প্রচুর পরিমাণে রেশমসামগ্রী নিয়ে ইংরেজরা কোথায় কেনাবেচা করতেন জানতে ইচ্ছা হবে। এবিষয়ে হেনরি গুইনন্দ (বহুলোক একে ভারতীয় বলে ভুল করে লিখেছেন

'গুণানন্দ' বা 'গুহকানন্দ') নামে এক সাহেব সব খোঁজখবর নিয়ে কোম্পানির পরিচালকদের কাছে চমৎকার এক বিবরণ পেশ করেন। সেই সুবৃহৎ বিবরণের মধ্যে থেকে কাশিমবাজারে লগ্নিকৃত অর্থ সম্পর্কে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে গুইনন্দ কেবলমাত্র কোম্পানীর ভারতীয় রেশম ব্যবসা সম্পর্কে লিখে গেছেন। বিশেষ রেশমীদ্রব্য সম্ভার যা 'সিল্ক পিস গুডস' নামে খ্যাত তার এইরকম সাংঘাতিক মূল্য বৃদ্ধি কেন হল, তা গুইনন্দের বিবরণে স্পষ্ট লেখা আছে। গুইনন্দ লিখেছেন: 'আপনাদের সকলের অনুমতি নিয়ে আমি বিনীত ভাবে বলতে চাই যে অন্য জায়গার নানা সামগ্রীর (সিণ্টজ বাদে) সঙ্গে কাশিমবাজারে যে বিবিধ দ্রব্যাদি তৈরী হয় তার কোন তুলনাই চলে না। কাজেই মাননীয় কোম্পানীর অন্যান্য জায়গায় লগ্নিকৃত অর্থের সঙ্গে কাশিমবাজারে লগ্নিকৃত অর্থের বিরাট প্রভেদ বুঝতে হবে। কাশিমবাজারে যে সব দ্রব্যাদি তৈরী হয় তা অন্য কোথাও তৈরী হয় না বললে কথাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বলা উচিত হবে যে এইসব বস্তু অন্য কোথাও তৈরী হওয়া অসম্ভব। আপনারা অবগত আছেন যে এই রেশমী বস্তুগুলি আমাদের আমেরিকা ও আফ্রিকাকে রপ্তানীকৃত দ্রব্যসম্ভারের সব থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বস্তুত আমাদের দুই অতিবৃহৎ বানিজ্যিক সম্পর্ক বিশিষ্ট দেশে এই রেশমীদ্রব্য অতি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন। রেশমীদ্রব্য বিনা এই দুই দেশে ব্যবসা করা অসম্ভব। অন্য কোন বিদেশী যদি এই দুই দেশে এই বস্তু সরবরাহ করে তাহলে আমাদের ব্যবসার সমূহ ক্ষতি হবে। তাই যে কোন দামে রেশমীদ্রব্য সংগ্রহ করতে হবে যার ফলে আমাদের জাতীয় বার্ষিক জমা ও অর্থনীতির উন্নতির পথ সদা প্রশস্থ থাকবে। নিয়মিতভাবে এবং সুনিয়ন্ত্রিত দামে কাশিমবাজারের রেশমের দ্রব্য সংগ্রহ করে রপ্তানি করতে হবে।

'আপনাদের অজানা নয় যে কাশিমবাজারে প্রস্তুত বন্ধনী ও অন্যান্য অনুরূপ দ্রব্যসামগ্রী ইংল্যাণ্ডে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং জানান হয়েছে যে এই ধরণের সমুদয় বাণিজ্যসম্ভার আমেরিকার বাজারে বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ সামগ্রী টেমস্ নদীর থেকে বেশী দূরে যেতে পারে না তা আপনারা অবগত আছেন। টেমস নদীতে বা সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত যেতে না যেতেই এই রেশমী দ্রব্যসম্ভার

কাষ্টমস হাউসের রপ্তানি তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও চোরা পথে ছোট ছোট নৌকায় পুনরায় ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসে এবং সমুদ্র তীরবর্ত্তী চোরা বাজারে প্রচণ্ড দামে বিক্রয় হয়। সুতরাং প্রতি বন্ধনীর দাম যদি পঁচিশ শিলিংএর নীচে রাখা হয় তাহলে প্রায় বিনা পরিশ্রমে সমুদ্র তীরবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে সহজেই বিক্রয় করা যাবে। এ দ্রব্যগুলি প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন যদিও স্পেটালস-ফিল্ডে এই ধরণের জিনিষ তৈরীর চেষ্টা চলছে কিন্তু তারা কখনও ছাব্বিশ বা সাতাশ শিলিংএর কমে বিক্রি করতে সাহসী হবে না। এবছর তাদের তৈরী জিনিষ বেশ ভাল হয়েছে বটে কিন্তু দাম খুব চড়া।

'রেশমী লুঙ্গি ও নূতন রুমাল জার্মান ও আমেরিকান বাজারেই বেশী বিক্রয় হয়। এগুলির বুনন যেমন সরেস রংও তেমনি চমৎকার। নিয়ামত দামে এবং নানারং ও ধরণের হলে এগুলি অনেক বেশী বিক্রি করা যাবে। নানারকমের চৌখুপী নক্সার তৈরী হলেও বিক্রয় বৃদ্ধি হবে।

'নানারকমের অর্থাৎ একরঙা, ডুরেকাটা বা দোরঙা টাফেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এগুলির বিশেষ প্রয়োজন আফ্রিকা, আমেরিকা এবং পশ্চিমভারতীয় বাজারের জন্য। এইসব জায়গার সমস্ত ব্যবসায়ী এই দ্রব্যটি কেনবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে কারণ কোম্পানী যে দামে টাফেটা এদের কাছে বিক্রি করতে পারে সেই দামে ইংল্যাণ্ডে তৈরী কোন কাপড় নিয়ে বাণিজ্য করা সম্ভব নয়। এবারে যে গাঁইটগুলি এসেছে সেগুলি চমৎকার। ভবিষ্যতে যাতে এই মান পুরোদস্তর বজায় থাকে তার জন্য কোম্পানীর হুকুমনামা পাওয়া মাত্র যেন বাছাই ও গাটরী বাঁধবার সময় প্রত্যেক থানটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হয়।

'টাফেটার মধ্যে নানারকমের রং পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন রংও করা যায়। আমি মনে করি যে কতকগুলি রং অন্যগুলির তুলনায় বেশী চটকদার বলে বিক্রয়ের সময় অধিকমূল্য পায়। সুতরাং সেই রংএর দ্রব্য যেন বেশী তৈরী করা হয়। চীনাসিঁদুরের লাল রংএর টাফেটা তৈরী করে সেগুলি যেন আলাদা গাঁইট করে পাঠান হয়। লালের সঙ্গে অন্যরং মিলিয়ে থাকলে তার গাঁটরী আলাদা হবে। আমার বিশ্বাস যে এই বস্তুগুলিতে ঠিক রং থাকলে আমাদের লাভ বেশ ভালই থাকবে।

'ডোরাকাটা টাফেটা চীনের তৈরী ডুরে টাফেটার অনুকরণে হলে, যেন তাও অল্পস্বল্প পাঠান হয়।

'ইওরোপে কিছু একটা ভুল হবার জন্য এবছর ফুলকাটা রুমাল সরবরাহের কোন আদেশই যায় নাই। এই জিনিষটিতে কোম্পানী প্রচুর লাভ করে থাকেন এবং সরবরাহ থাকলে বেশ ভাল পরিমাণ বিক্রিও করতে পারেন। মহাশয়গণকে তাই এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই রুমাল বিক্রির বাজার ও চাহিদা এত বেশী যে শতকরা কুড়ি বা ত্রিশটাকা অগ্রীম পাওয়া যায়।......

'এখন কাঁচা রেশমের চাহিদা কিন্তু ভীষণ বৃদ্ধি পেয়েছে সেজন্য এবিষয়ে আপনাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ইওরোপে কাঁচা রেশমের প্রয়োজন নিয়ত বর্দ্ধমান, যদিও দেখছি তার আমদানী ক্রমেই কমের দিকে। বেশী দাম দিয়েও কাঁচা রেশম কেনা লাভজনক কারণ এখানে দামও খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। যে দামেই কাঁচা রেশম যোগাড় করা হোক না কেন তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। বিভিন্ন রকমের কাঁচা রেশমকে কি ভাবে একীভূত করা যেতে পারে তা আমি পরে বিবৃত করছি।'[৯]

এই বিবরণ পড়লে বুঝতে কষ্ট হয় না কেন কোম্পানীর পরিচালকদের কাছে কাঁচা রেশম সংগ্রহ 'অন্যতম জাতীয় কর্তব্য' বলে চিহ্নিত হয়েছিল। কোম্পানীর রেশমী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহের এত প্রয়োজন ও আদর কেন হয়েছিল এই বিবরণী পাঠ করলে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কি পরিমান লাভ হত বুঝতে খালি একটা বস্ত্র পাওয়া যায় যার বিক্রয়ের দাম বলা হয়েছে। দ্রব্যটি হল বন্ধনী। লোকনাথ নন্দী বিক্রয় করছেন ছয়টাকা বারোআনা ছয়পাই দামে। ইংল্যাণ্ডে বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ শিলিং দামে অর্থাৎ ১২ টাকায় পাউণ্ড ধরলে পনের টাকায় বা প্রায় আড়াইগুণ বেশী মূল্যে। এত গেল ইংল্যাণ্ডের মূল্য। আমেরিকা, আফ্রিকা, জার্মানী বা পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে অনেক বেশী দামে বিক্রয় হত তাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিদেশের বাণিজ্যে লাভের লোভেই ইংরেজ কোম্পানী রেশমী ব্যবসাকে পৃষ্টপোষকতা দিয়েছে। সকলকে বিশেষ স্বদেশীয় ইওরোপীয় বণিকদের একে একে হারিয়ে দিয়ে রেশম ব্যবসার একছত্র অধিপতি হয়েছে। তাদের জন্যই রেশম ব্যবসার চরম উন্নতি হয়েছে এবং তাদের জন্যই নিদারুণ পতন থেকেও কেউ রেশমকে

রক্ষা করতে পারে নাই। যারা লাভের লোভে রেশমী সুতোর ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে তারা মরেছে। যারা চোখ নাক কান খুলে চলেছে তারা সময় মতো ব্যবসা গুটিয়ে সরে যেতে পেরেছে।

লোকনাথ নন্দী ইতিমধ্যে তাঁর দেয় রেশম সরবরাহ করেছেন। পরের বছর তিনি মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে অংশীদারী ছেড়ে সোনাবাড়ীর কোম্পানীর গোমস্তা হিরানন্দ দাসের সঙ্গে অংশীদারী পাতলেন। কোম্পানী তাদের দর নিম্নতম দেখে তাদের সঙ্গে রেশমীদ্রব্য সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। তখন মিডলটন সাহেব কাশিমবাজারে রেসিডেণ্ট। দেখেন নাকের ডগা দিয়ে রেশম ব্যবসায়ীরা আনাগোনা করছে। মাল সরবরাহ করছে। দাম পাচ্ছে, লাভ করছে। লোভ হল রেসিডেণ্ট সাহেবের। কোম্পানীর কলকাতার কাউন্সিলকে এক চিঠি লিখে বসলেন। লিখলেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হোক। তিনি নিজে তাঁতীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সোজাসুজি মাল কিনবেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যবর্ত্তীতার প্রয়োজন হবে না। উত্তরে কাউন্সিল জানতে চাইলেন যে নগদ দামে মাল কেনার পর কমজোরি মালের জন্য কে দায়ী হবেন। তাঁতীরা এই দায়িত্ব নিতে রাজী হবে না। কাজেই মাল যদি খারাপ হয় তার দায়িত্ব রেসিডেণ্ট সাহেব নিতে কি রাজী আছেন? আরো লিখলেন যে ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দিলে কোম্পানীর বিশাল লগ্নির পূর্ণ দায়িত্ব পড়বে এক রেসিডেণ্টের ওপর। অর্থমূল্যে এই দায়িত্ব বেশ বৃহৎ এবং একবছরের অসফলতাতেই মিডলটন ফৌত হন ক্ষতি নাই কিন্তু কোম্পানী সেই লোকসানের সম্ভাবনাও বরদাস্ত করতে রাজী নন।[১০] চুক্তিমতো রেশম সরবরাহ করার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করা হল।

এই সময়কার ইংরেজ কোম্পানীর কাগজপত্রে তৎকালীন বাংলার রেশম-শিল্প সম্পর্কে এত খবর পাওয়া যায় যে সেটাই গবেষণার বিষয় হতে পারে। ইংরেজরা চাষার দাদন থেকে শুরু করে বিভিন্ন রেশম প্রস্তুতকারী কেন্দ্র সম্পর্কে বহু তথ্য লিখে রেখে গেছেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ বিদেশী কোম্পানীগুলির রেশমের চাহিদা থেকে মূল্য বৃদ্ধি। মম্বন্তরের পর সেই বৃদ্ধি লাফ মেরে বহু ধাপ উপরে উঠে গেল। প্রচণ্ড চাহিদার তাগিদে তার উর্দ্ধগতি হল দ্রুততর। ইংরেজরা অনেক উন্নতি করলেন রেশমের শিল্পে।

কাঠের গোটান যন্ত্রে হাতে করে ঘুরিয়ে রেশম সুতো গোটান হত। ফলে গতি ছিল শ্লথ, কাঠের চক্র ভেঙে গেলে অনেক সুতো লোকসান হত। তাছাড়া কাঠ কাঁচা থাকলে কাঠের রঙে রেশম নষ্ট হত। ইংরেজরা ধাতব চক্রের গুটান যন্ত্র (Reeling machine) নিয়ে এলেন। পায়ের চাপে চাকা ঘোরাবার ব্যবস্থা করলেন, হাত থাকল খালি। ইটালির কর্মী সব থেকে সস্তা বলে ইটালি থেকে কর্মী এল। বিশেষজ্ঞ ওয়াইস এলেন পোলাণ্ড থেকে। এইসব যন্ত্রপাতি ও লোকজন বিশেষজ্ঞদের জড়ো করা হল কাশিমবাজারের অনতিদূরে কুমারখালি গ্রামে। আধুনিক পদ্ধতীতে রেশম প্রস্তুতির সেটাই হল প্রধান কেন্দ্র।

কুমারখালিতেই প্রথম রেশম ফ্যাক্টরী বা ফিলেচার তৈরী হল। দুশো আটটি হাপর বা চুল্লীযুক্ত ফিলেচার তৈরী করতে খরচ হল ৯৯, ৪৬২-২-৯ টাকা। কিছুদিনের মধ্যেই আরো ফিলেচার তৈরী হল। কাশিমবাজার ফিলেচার তৈরী হল একশো চারটি হাপর নিয়ে খরচ পড়ল ৯৪, ০৬৭-১৫-৬ টাকা, একই মাপের বাউলিয়ার ফিলেচার তৈরীর খরচ পড়ল ৯০, ৭৬৮-০-৯ টাকা আর অসমাপ্ত রংপুরের রেশম ফিলেচারে খরচ হয়ে গেল ৫১, ৪৯২-৭-৬ টাকা।[১১] কিন্তু একসের রেশমও পাওয়া গেল না। কিছুদিন পরে কান্তবাবু তার ছেলে লোকনাথের নামে রংপুরের বাড়ী ঘর কিনে নিলেন। অন্য ফিলেচার গুলিতে কিছুদিন জোর কদমে কাজ চলল। তারপর কি হল সে কথায় আবার পরে আসা যাবে।

রেশমের কথা বলতে হলে কাঁচা রেশমের প্রধান কেন্দ্রগুলির কথা না বললে বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রেশম প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র ছিল কাশিমবাজার ঘিরে। যেমন কুমারখালি, জঙ্গীপুর ও বাউলিয়া। মাঝে মাঝে পদ্মাপার নামটাও পাওয়া যায়। সম্ভবত এটি পদ্মার পারে অবস্থিত বাউলিয়াকেই বোঝায়। কারণ এই দুইটি নাম কখন একসঙ্গে পাওয়া যায় না। সুদূর রংপুর যে রেশমের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল তা আগেও বলা হয়েছে। গুজরাটি বণিকগণ কিভাবে এই রংপুরের রেশমের একচেটিয়া ব্যবসা করতেন এবং তার ফলে রংপুর রেশম কিভাবে গুজরাটি রেশম নামে খ্যাত হল আগে একবার বলা হয়েছে। রংপুরের ওপর কান্তবাবুর প্রভাবই যে তাঁর ভাইপো বৈষ্ণবচরণকে গুজরাটি বণিকদের প্রধান সরবরাহকারক করে তুলেছিল সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রেশমের দাম কি ভাবে বৃদ্ধি হল দেখলেই বোঝা যাবে অর্থের প্রয়োজন কিভাবে বেড়ে গেল।[১২] সের প্রতি দর দেওয়া হল।

	১৭৬৫	১৭৬৯	১৭৭০	১৭৭১	১৭৭২
পদ্মাপার	৬-১৩-৯	৭-৯-০	৯-১৪-৩	১০-০-০	১০-০-০
কুমারখালি	৫-১১-৯	৬-৪-৭	৯-৯-৩	৯-১২-০	৯-১২-০
জঙ্গীপুর	×	১০-১৩-১	৯-১৪-০	১০-০-১০	১০-০-০
রংপুর	৫-১৩-৬	৭-১৫-৬	৯-৮-০	৯-৯-১০	৯-১০-০

কাঁচা রেশমের দর বৃদ্ধির ফলে রেশমের তৈরী সমস্ত জিনিষেরই দাম বৃদ্ধি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরেজরা এসময় রেশমের ব্যবসায় এতই লাভ করছেন যে ওজনে কম নিতেও তাদের একটুও আপত্তি হল না এবং প্রতি টাকায় চোদ্দ তোলা রেশম কিনতে রাজী হলেন। এমনকি রেশমের চাষাদের সঙ্গে পলু সরবরাহের চুক্তি করা হল রোকনপুরে এবং চুনাখালিতে। যশোর ও রাজশাহী থেকে পলু সংগ্রহের জন্য এক গাদা গোমস্তা রাখা হল। প্রচুর রেশম সংগ্রহের জন্য ইংরেজরা যা করতে লাগলেন তাকে স্বচ্ছন্দে রেশম-বিকার বলে অভিহিত করা চলে। অস্বীকার করা চলবে না অবশ্য যে এই সময় ইংরেজ কোম্পানী কেবল প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে নাই সেই দ্রব্যসামগ্রী বিভিন্ন দেশে বিক্রি করে প্রচণ্ড লাভ করেছিল। প্রায় সমস্ত ইংরেজ রাজপুরুষও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছেন এবং তাদের ব্যবসার সর্বপ্রধান দ্রব্যসম্ভার ছিল রেশম ও মণিমাণিক্য যার মধ্যে প্রধান ছিল হীরা। রেশমের ব্যবসায়ে প্রায় সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

কৃষ্ণকান্তবাবুর ব্যবসার খতিয়ান পাওয়া গেছে মাত্র ১১৮০ সালের বা ১৭৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দের। এই দুইশত নব্বই পাতার খতিয়ান পরীক্ষা করলে সেই সময়কার রেশম ব্যবসায় সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়। দেখা যায় যে কান্তবাবু যেমন একধারে রেশমের বড় ব্যবসায়ী হীরানন্দ বা ধরমচাঁদ করমচাঁদবাবুদের সঙ্গে যোগ রাখতেন তেমনি প্রচুর ছোট ছোট ব্যবসায়ীর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বস্তুত দেখা যাবে তাঁর বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা ছোট আর ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বড়। তার খতিয়ানে

ধরা পড়েছেন বহু অবাঙালী ও বাঙালী ব্যবসায়ী, চোদ্দজন ইংরেজ এবং সুবিখ্যাত আরমাণী ব্যবসায়ী খোজা খাওয়াক। সবশুদ্ধ প্রায় দেড়শত ব্যবসায়ীর খোঁজ পাওয়া যায় এই খতিয়ানে। কান্তবাবুর রেশম ব্যবসার ব্যবস্থা কি রকম সুসংবদ্ধ ছিল তার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

রেশম ব্যবসার প্রথম ধাপ হল কাঁচা রেশম সংগ্রহ। তার পরের ধাপ রেশমের তৈরী থান সংগ্রহ। সম্ভবত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগীতায় নামবার ইচ্ছা না থাকার জন্যেই কান্তবাবু দ্বিতীয় ধাপ থেকে তার কর্ম শুরু করতেন। রেশমের থান যে সব এলাকায় তৈরী হত সেখানে তাঁর দালালরা বসে থাকত। তারা দরদস্তুর করে খবর পাঠান মাত্র 'সর্দার'রা কান্তবাবুর কাছ থেকে টাকা ও লোকজন নিয়ে দালালদের কাছে পৌঁছতেন এবং কেনাকাটা সাঙ্গ করে টাকা দিয়ে, মাল নিয়ে সদলে ফিরে আসতেন। পথ ছিল বিপদসঙ্কুল তাই সর্দাররা দলবদ্ধ ভাবে যাওয়া আসা করতেন। ১১৮০ বা ইংরেজী ১৭৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশজন দালালের নাম লিপিবদ্ধ আছে। রাসোয়াতে ছিলেন পাঁচজন, সৈদাবাদ ও বীরভদ্রপুরে দুইজন করে দালাল ছিলেন। তাছাড়া মালদহ থেকে মধুপুর পর্য্যন্ত সমস্ত রেশম থান প্রস্তুতকারক জায়গায় একজন করে দালাল উপস্থিত থাকতেন। কোথায় কোথায় রেশমী থান প্রস্তুত হত তা এই তালিকা দেখলে বোঝা যায়। অন্তত এই সব জায়গা থেকেই যে কান্তবাবুর প্রয়োজন সরবরাহ করা হত তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জায়গাগুলি হল, রসোয়া, সৈদাবাদ, বীরভদ্রপুর, দয়ানগর, বিষ্ণুপুর, ব্রহ্মপুর, খাগড়া, কাশিমবাজার, কালিকাপুর, ঝাউখোলা, গাবতলা, পুরন্দরপুর, শিবডাঙ্গা, কাদাই, গোয়ালপাড়া, বাজোর-পাড়া, মধুপুর ও মালদহ। এই চব্বিশজন দালালের মধ্যে একজনের নাম পড়া যায় না বাকী তেইশ জনই উচ্চবর্ণের হিন্দু। চারজন নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ। 'রায়' পদবীধারী দু'জনেরও তৎকালীন নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণ হওয়া স্বাভাবিক। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দালালী বৃত্তিগ্রহণকারীদের মধ্যে ছয়জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। একজন পোদ্দার, একজন পাটোয়ারী ও একজন গুপ্তর দেখা পেলেও মনে হয় এরা সবাই বাঙালী। কেবল ব্রহ্মপুরের বৈষ্ণবদাস শাদি কোন্ দেশীয় বোঝা কঠিন। অনেক সর্দারও দালালী করতেন অর্থাৎ কেনাবেচার সঙ্গে অর্থ পৌছান ও জিনিষ সরবরাহের দায়িত্বও তারা গ্রহণ

করতেন। দেখা যাচ্ছে যে কাঠমা পদবী তখন চালু আছে এবং দয়ানগরের দায়িত্ব ন্যস্ত এক কাঠমার ওপর। ভুলে গেলে চলবে না দয়ানগরের গায়েই কাঠমা পাড়ার অবস্থিতি। 'খানসামা' পদবী হিসেবে তখন চালু হয়ে গিয়েছে। ব্যবসায়ী হিন্দু গর্বের সঙ্গেই লিখেছেন নিজের নাম, শিবু খানসামা।

রেশমের থান আসামাত্র চলে যেত। 'বন্দ্রহাগার'দের ঘরে। এই নাম এখন অপ্রচলিত। ফার্সী ভাষায় ওই কথার কোন মানে হয় না। সম্ভবত কোন ফার্সী কথা এমনই দেশীয় ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছে যে আসল নামের সঙ্গে এখন মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত। এরা সকলেই মুসলমান। এদের কাজ ছিল দর্জী-তাঁতীর। যত রেশমের থান এদের কাছে দেওয়া হত এরা তাই থেকে নানারকম রেশমী জিনিষ তৈরী করতেন। রুমাল বা জামা বা বন্ধনী বা শাড়ি বা আসবগী বা ওসবেঙ্গ বা অবেমিঙ্গ বা জামা তৈরী করতেন। এরাই ছিলেন কান্তবাবুর ব্যবসায়ের গুপ্তমন্ত্র। এদের হাতে তৈরী জিনিষই কান্তবাবু চড়া দামে বিক্রি করতেন। কখন শতকরা তিন শত গুণ বেশী দামেও কেনাবেচা হয়েছে কিন্তু কান্তবাবুর দর সর্বদাই সর্বনিম্ন থেকেছে। এই বন্দ্র-হাগাররা কাছাকাছি বাস করত। কোন সময়েই কাশিমবাজার থেকে তিন মাইলের বেশী দূরত্বে এরা থাকতেন না। বরঞ্চ দল বেঁধে কাশিমবাজারের কাছেই বসবাস করার রীতি ছিল। এদের বাস ছিল তাই কালিকাপুর, সৈদাবাদ, খাগড়া, শিবডাঙ্গা, গাবতলা ও চুনাখালিতে। ১১৮০ সালে কান্তবাবু ছত্রিশজন বন্দ্র হাগরের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তারা ২০,২৯৭ টা জিনিষ তৈরী করে দিয়েছিল। এদের মধ্যে শিবডাঙ্গার দল তৈরী করেছিল ১৩,৫৭৫, কালিকাপুরের দল ৪৪৬৩, চুনাখালির দল ১০৮৫, গাবতলার দল ৬৯৬, সৈদাবাদের দল ২৭৪ আর খাগড়ার দল ২০৪ খানি। দল বেঁধে কাজ করলেও প্রত্যেক বন্দ্রহাগরের সঙ্গে আলাদা হিসেব হত। যেমন সোমী বন্দ্রহাগরকে ১২৪৭ খণ্ড জিনিষ তৈরী করার জন্য ১১৭-৬-৬ টাকা দেওয়া হয়েছে, যেমন আয়েন খান বন্দ্রহাগরকে ৪৮২ খণ্ড জিনিষ তৈরীর জন্য ৪২-১২-০ টাকা দেওয়া হয়েছে। জিনিষপত্রের দাম দেওয়া হত কুড়িটাকার দরে। যেমন ৬১৪ খানা সরেস রুমালের দর হল দুই টাকা দশ আনা যার মানে হল ওই দরে কুড়ি খানা সরেস রুমাল পাওয়া যাবে। এক টাকা দরে ৬১৫ থান উদার দাম পড়ল ৩০-১২-০ টাকা বা

দশ টাকা দরে এক খণ্ড পামরীর দাম হল আট আনা। এইবার একটু কষ্ট করে পাতা উল্টোলে দেখা যাবে যে এই পামরী বন্ধনীর প্রতিটি নয় টাকা তিন আনা দরে লোকনাথ বিক্রী করেছেন। তবে প্রশ্ন থাকে অনেক। পামরী কি পামরী বন্ধনী না পামরী সরমাজ। এই দুই কাপড়ের মধ্যে তফাৎ কতটুকু? কোনটি সরেস এবং কোনটি নিরেস। বন্দ্রগাগরদের কাছ থেকে যেমন ভাবে পাওয়া যেত বিক্রির আগে সেখানে আর কিছু করবার থাকত কিনা তাও জানা যায় না। তবে বন্দ্রহাগররা যে অতি সস্তায় জিনিষ তৈরী করত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই তাদের নিয়মিত কাজ ও অর্থ দেবার প্রথা প্রচলিত করা হয়েছিল। প্রত্যেক বন্দ্রবাগর নির্দিষ্ট দিনে এসে অর্থ নিয়ে যেতেন। তখনই কাজ দেওয়া নেওয়া হত। এই বন্দ্রহাগররাই যে রেশম দ্রব্য ব্যবসায়ের মূলধন ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই এবং এদের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করেই রেশম ব্যবসার প্রসার ঘটেছিল। এইবার কাগজ কলম নিয়ে একটু অঙ্ক করলেই বোঝা যাবে, এই ভাবে ব্যবসা করলে লক্ষ্য টাকা লগ্নি করে সমাধিক টাকা মুনাফা করতে পারা অসম্ভব ছিল না। তবে কান্তবাবু অতি সাবধানী লোক ছিলেন। এক রকমের লোকের ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করলে যে বড় ব্যবসায় করা যায় না সেটা তাঁর থেকে আর কেউ বেশী জানত না। তাই তিনি যথা সময়ে জিনিষ পাবার জন্য এক দঙ্গল ছোট ব্যবসায়ীকেও সরবরাহকারী করেছিলেন।

কান্তবাবু যাদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন তাদের তিন ভাগ করা যাক আলোচনার সুবিধার জন্য। প্রথম ভাগে থাকবেন বাঙালী ব্যবসায়ীরা, দ্বিতীয় ভাগে থাকবেন অবাঙালী ভারতীয় ব্যবসায়ীকুল এবং তৃতীয় ভাগে থাকবেন চোদ্দজন ইওরোপীয় (সকলেই ইংরেজ) এবং একজন আর্মেনীয় বণিক।

দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ অবাঙালী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কথা প্রথমে বলা হচ্ছে। এদের সঙ্গে এক বছরে বা ১১৮০ সালে মোট কিছু বেশী সাতাশ হাজার টাকার ব্যবসা করা হয়েছে। প্রত্যেক খতিয়ানেই আগের বছরের জের দেখা যাচ্ছে কাজেই এদের সঙ্গে যে কান্তবাবুর একাধিক বছরের পাকা ব্যবসা চালু আছে সেটা বোঝা কষ্টসাধ্য নয়। গুজরাটি ব্যবসায়ীর দল স্বভাবতই দলে ভারী, কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবসায়ীও আছেন বলে মনে হয়। অবাঙালী ব্যবসায়ীদের কেবল পদবী দেখে বাসস্থান নির্দেশ করা

কঠিন। বাজাজ বা প্যাটেল বা শাহু আমরা জানি কিন্তু জয়পুরী, শেরপুরী ও রাধাপুরী নামধারী ব্যক্তিগণ বিহারের ওই সব নামের গ্রাম বা সহরের অধিবাসী হলেও তারা বিহারী কিনা বোঝা সহজ নয়। দাস ভাই নিঃসন্দেহে গুজরাটের লোক কিন্তু নরী বা হাওয়ানিরা কোথা থেকে এলেন। গোরা পদবী যদি গোউরা পদবীর বঙ্গীকরণ হয় তবে তো এদের আদিবাড়ী মহিশূরে নির্দেশ করে। সামাজিক ইতিহাসের এই গোলক ধাঁধায় আজকে জড়িয়ে না পড়াই ভাল। লক্ষ্য করার বিষয় যে বণিক নির্বাচনেও কান্তবাবু একই মত অবলম্বন করেছেন। কোন বণিকেরই অবস্থিতি কাশিমবাজার থেকে তিন মাইলের বেশী দূরত্বে নয়। যেমন মুর্শিদাবাদ বা লালবাগ বা মাদাপুরের কোন ব্যবসায়ীর নাম বা ঠিকানা কান্তবাবুর খতিয়ান বই এ পাওয়া যায় না। দেখা যাবে তিনি সর্বদাই এই নিয়ম পালন করেছেন। তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করতে হলে কাশিমবাজারে অবস্থান করতে হবে এটাই যেন একটা অলিখিত নির্দেশ। এদের সঙ্গে ব্যবসায়ের ধরন বোঝাবার জন্য দুইটি হিসাব তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমটি অল্প মূল্যের ব্যবসা এবং দ্বিতীয়টি বেশী মূল্যের ব্যবসা। বণিকদ্বয় গুজরাটি এবং সৈদাবাদ, মহাজনটুলি ও গুজরাটিটুলির বাসিন্দা।

রাধানাথ প্যাটেলের হিসাব

সাধারণ রুমাল	২৭১৩ টি	১ টাকা দরে*	হল ১৩৫-১০-৮ টাকা
পোষাকী থান	৯৫ ,,	১ ,, চার আনা দরে ,,	৫-১৫-৮ ,,
পামরী সরমাজ	১০৬ ,,	১ ,, আট ,, ,,	৭-১৫-৪ ,,
সরেস খাসা সরমাজ	২৩ ,,	চোদ্দ ,, ,,	১-০-০ ,,
খাসা	১১৬ ,,	চোদ্দ ,, ,,	৫-১-৩ ,,
চেলী	১ ,,	চার ,, ,,	০-৪-০ ,,
	৩০৫৪ টি		টাকা ১৫৫-১৩-১৫ গণ্ডা

*বিশেষ দ্রষ্টব্য : দর হল সর্বদা ২০টির কেবল চেলীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম

কৃষ্ণচন্দ্র দাস ভাইএর হিসাব

মাঝারি লম্বা রেশমের শাড়ি	২৩২টি ১০৬ টাকা ১১ আনা দরে হলে—		১২৩৫-০-০-০
ঐ ঐ পোষাকী সরেস	৯০ „ ১১৬ „	„	৫৬৯-৪-০-০
রেশমের সরেস রুমাল	১২৭ „ ১৬৫ „	„	১০৬৭-১২-০-০
রেশমের সরেস রুমাল	৬৭ „ ১৬০ „	„	৫৩৬-০-০-০
ঐ চোদ্দ হাতি নেকী			১৫-০-০-০
	৫২৫ টির মূল্য		৩৪০৩-০-০-০ টাকা

দুইটি হিসাবের ধরনও দুই রকম। একজন সাধারণ জিনিষের বণিক। অন্যজন সরেস জিনিষের বণিক। এখানেও বন্দ্রহাগারদের মতো দাদনী প্রথায় কেনা বেচা করা হত। অর্থাৎ প্রথমে অগ্রীম দেওয়া হত এবং পরে নিয়মিত অর্থ দেওয়া হত। সম্পূর্ণ মাল সরবরাহ হলে হিসাব ওয়াসিল করা হত। নূতন ব্যবসা সেই বণিকের সঙ্গে আবার শুরু করার আগে নিকাশ করে দেখে নেওয়া হত লেনদেনের কোথাও ভুলচুক হয়েছে কিনা। চুয়াল্লিশ জন ভারতীয় বণিকের সঙ্গে কান্তবাবু এই বছরে ব্যবসায় লিপ্ত হন।

বাঙালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কান্তবাবুর ব্যবসায়ের ধরণ ভিন্ন ছিল। বহু বণিকের সঙ্গে একই সঙ্গে ব্যবসা করা হত, প্রত্যেককে প্রায় একই জিনিষ সরবরাহের অনুরোধ করায় দরের তারতম্য প্রায়ই নজরে পড়ে। ভারতীয় ব্যবসায়ী সংখ্যায় যতই হোক দেখা যাচ্ছে চারজন প্রধান বণিকের সঙ্গেই বেশী ব্যবসা হত। যেমন ৫৭০০০ টাকা ব্যবসার মধ্যে এই চারজনের ব্যবসায়ের পরিমাণই ছিল ৫০,৮৫১ টাকা। বাঙালী বণিকদের সঙ্গে কিন্তু অন্য ভাবে ব্যবসা প্রচলিত ছিল। দেখা যাচ্ছে পঞ্চান্ন জন বণিকের মধ্যে দশজন মিলে তবে ২৯,০৫৭ টাকার ব্যবসা করেছেন। বাঙালী বণিকদের সঙ্গে এইবছর সম্পূর্ণ ব্যবসার পরিমাণ ৩৫,৮৫০ টাকা। আরো দ্রষ্টব্য হল চারজন ভারতীয় বণিকের মধ্যে কারু সঙ্গে ব্যবসা দশহাজার টাকার কম ছিল না, অথচ দশজন বাঙালী বণিকের মধ্যে কেউ ওই পরিমাণে ব্যবসা করেন নাই। বাঙালীদের মধ্যে সব থেকে বড় ব্যবসার পরিমাণ ৮১৫০ টাকা। ভারতীয় চারজন বড় ব্যবসায়ীর নাম হল রঘুনাথ গোরা, ১১,৭৯৩-১-২-২ টাকার ব্যবসায়ী, নন্দকিশোর জোকমল দাসভাই, ব্যবসায়ের পরিমাণ ১৩৪৪২-১০-০-০ টাকা,

ধরমচাঁদ করমচাঁদবাবু, ব্যবসায়ের পরিমাণ ১০,৫৫০-০-০-০ টাকা ও নাগিন দাসবাবু গুজরাটি, ব্যবসায়ের পরিমাণ ১০,২০৬-৯-০-০ টাকা। এই ৯৯ জন বণিকের মধ্যে লক্ষণীয় যে ৯৮ জনই ছিলেন হিন্দু। বলাবাহুল্য যে মুসলমান ব্যবসায়ীর সংখ্যা এই অঞ্চলে খুবই কম ছিল বলেই তাদের নাম পাওয়া যায় না। কান্তবাবুর খতিয়ানে একমাত্র মুসলমান বণিকের নাম নবাব মহম্মদ। এই ভদ্রলোকই সম্ভবত ইংরেজ কোম্পানীকে রেশম সরবরাহ করতে লোকনাথ নন্দীর অংশীদার হয়েছিলেন। বাঙালী ব্যবসায়ীদের তালিকায় তিনজন কলকাতার বণিকের নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন শিবনাথ আচার্য সাকিন মীর্জাপুর, কালিচরণ বাগচী সাকিন মীর্জাপুর এবং গড়পাড়ের গোপীচরণ সরকার।

ভারতীয় বা বাঙালী বণিকদের সঙ্গে কান্তবাবুর ব্যবসার লেনদেন বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। তাঁর বৃহৎ ব্যবসায়ী মনোভাবের এবং সুবন্দোবস্তের মধ্যে প্রত্যেকেরই যে একটা নির্দিষ্ট প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে দিয়ে সেই প্রয়োজন পরিপূরণ করতেন তা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু যখনই ইংরেজদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর হিসাব নিয়ে বসা যায় তখনই বিভ্রান্ত হতে হয়। সম্ভবত ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীগণ যারা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন কোন সময়েই চাইতেন না যে তারা কত টাকার ব্যবসা করছেন স্পষ্ট বোঝা যাক। তাই কান্তবাবুর খাতিয়ানও এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে একমাত্র তিনি এবং যার ব্যবসায় সেই ব্যক্তি ভিন্ন কোন তৃতীয় ব্যক্তির সেই হিসেব থেকে কিছু বোঝা কঠিন। এখানেও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সকলের হিসাব কঠিন নয়। যেমন হেস্টিংস সাহেবের হিসাব অতি স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। বেচার, মিডিলটন বা বারওয়েল সাহেবদেরও হিসাব সরল। বাকি দশজনের হিসাব কঠিন হবার কারণ তারা কেবল ব্যবসা করতেন না, বরঞ্চ সময়ে সময়ে ব্যবসায়ের ছুতো করে টাকা ধার করতেন এবং কিছুদিন পরে সেটা শোধ করতেন সুদশুদ্ধ। ধার দেওয়া নেওয়ার ঘটনা ব্যবসায়ের মধ্যে ঢুকে হিসাব নিকাশ দুর্বোধ্য করেছে। এবিষয়ে ফাইডেল সাহেবের খতিয়ানটি লক্ষণীয়। মনে হয় অন্যেরাও অর্থাৎ তার ইংরেজ সহকর্মীগণ তার নামের আড়ালে স্বর্ণ অর্থ ও রেশম নিয়ে নানা খেলা খেলেছেন। সর্বদাই বিরাট আয়ের ভারে তিনি সমাচ্ছন্ন অথচ ব্যয়ের ব্যাপারে বড়ই উদাসীন।

হেঙ্কম্যান সাহেবের ঘটনা বিপরীত কারণ সেখানে বিরাট ব্যয়ের পেছনে আয়ের কোন বন্দোবস্ত নাই। এদের মধ্যে আবার ডুকারেল সাহেবের হিসেব ঠিক ব্যবসায়ী হিসেবের মতো। দেখা যাচ্ছে তিনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রেশমের ব্যবসায়ে ফেঁসে আছেন। ডুকারেল ছিলেন পারশী-নবীশ, বসতে হত নবাব-দরবারে। পারশী কথাবার্তা সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করে দিতে হত রেসিডেণ্ট সাহেবকে। দেশী হালচালও তিনি ভাল বুঝতেন। সের দরে রেশমের 'চাহারাম' নামক সামগ্রী কিনে নিয়মিত তিন টাকা দরে বিক্রি করতেন। অবশ্য চাহারাম বস্তুটি কি জানবার কোন উপায় নাই।

এই সময়কার সাহেব অনেকেই যে হিন্দু বা মুসলমান সমাজের সঙ্গে দিব্যি মিশে গিয়েছিলেন তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা যে কেবল দেশী মহিলাকে বিয়ে করে তাকে স্ত্রীর পূর্ণ সম্মান দিতেন তাই নয় তাদের 'তাম্র-বর্ণের' পুত্রকন্যাদের ভাল চাকরী ও বিবাহ দিতে সচেষ্ট ছিলেন। সঙ্কর সন্তানদের অধিকাংশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতেন। কাশিমবাজারে অবস্থিত ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ অবকাশ সময়ে বা হিন্দু উৎসবে যোগ দেবার সময় দেশী পোষাক পরিধান করতেন। তাঁরা শ্রাদ্ধবাড়ী যেতেন এবং কীর্ত্তন শুনে প্যালা দিতেন। অনেকেই বাগান করেছিলেন। রটন সাহেবের বাগান ফলগাছের জন্য বিখ্যাত ছিল। এইসব বাগানে সাহেবরা সংকীর্ত্তন ডাকতেন এবং বৈষ্ণবদের ভাল মতো ফলারের বন্দোবস্ত করতেন। অতদূর না গেলেও অনেক সাহেবই বৈষ্ণব-বিদায়ে পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করতেন না। এই চোদ্দজন ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা ভারতীয় ও বাঙালী বণিকদের সঙ্গে মিলিত ব্যবসার থেকেও পরিমাণে বেশী ছিল। ১১৮০ সালে ৯৪,৮৬০-৭-৫ টাকার ব্যবসা কান্তবাবু করেছেন ইংরেজদের সঙ্গে।

কাশিমবাজারের ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে কান্তবাবুর ব্যবসার কথা বলতে গিয়ে ডাক্তার রেডনীর সম্পর্কে কিছু না বলা অন্যায় হবে। ডাক্তার রেডম্যান ছিলেন কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির ডাক্তার। দীর্ঘদিন তাকে কাশিমবাজারে থাকতে হয়। ফলে কান্তবাবুর সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। কান্তবাবু তার হয়ে বহু কাজ করে দিতেন। চিনির বস্তাটা ডাক্তার সাহেবের বাড়ী পৌঁছে দেওয়া বা ঘোড়ার খাবার একটা লোক মারফৎ আনিয়ে ডাক্তারবাবুর আস্তাবলে জমা করা বা ডাক্তারবাবু কলকাতায় যাবার সময়

তার নৌকা ভাড়া দিয়ে দেওয়া, বাক্স পেটরা তোলবার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। ডাক্তারবাবুও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একজোড়া চশমা এনে দিয়েছিলেন কান্তবাবুকে। লেখাপড়ার কাজে তাতে খুবই সুবিধা হত সন্দেহ নাই। অসুস্থ হলে কিন্তু কান্তবাবু কখন সাহেব ডাক্তার ডাকেন নাই। তখন কবিরাজ মহাশয় আসতেন। সবথেকে মজা হল যে কান্তবাবুর সমস্ত কাগজেই ডাক্তার সাহেবের নাম লেখা হয়েছে 'রেডনী'। ডাকাডাকির সময় উচ্চারণ ছোট হয়ে রেডম্যানের রেডনী হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। সেটাই হয়েছে। ডাক্তার রেডনীও কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায় করতেন এবং তার পরিমাণ খুব ছোট ছিল না। রেশমীজ্বরে ডাক্তার সাহেব কি রকম ভুগছিলেন তা হিসেব দেখলে বোঝা যায়।

২০ বৈশাখ ১১৮০ সাল। ডাক্তার রেডনীর হিসাব।

১৪ বাঁধের মাঝারি রেশমী রুমাল	১২০০ টা	১০৭ টাকা দরে হল	৬৪২০-০-০
ঐ বড় ঐ	১৮০০ টা	১১১ "	" ৯০৯০-০-০
পাঁচ রঙা চেলী	১৪১ টা	১১ " আট আনা "	১৬২১-৮-০
	৩১৪১ টা		১৭১৩১-৮-০ টাকা

ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে তুলনা করলে ডাক্তার রেডনীর সাহসের পরিমাণ বোঝা যায়। ইংরেজ ডাক্তারের কান্তবাবুর ওপর আস্থাও যে কতো প্রচুর পরিমাণে ছিল বুঝতে কষ্ট হয় না। ইংরেজরা এই সময় যে রেশম ব্যবসায়কে কতো প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন তা বোঝবার জন্য রপ্তানি মালের হিসাব নীচে দেওয়া হল। দেখা যাবে যে কাশিমবাজারের নাম কেবল মাথায় লেখা হত না পরিমাণেও সর্বদা প্রথম হত। এই হিসাব থেকে কোথায় রেশম তৈরী হত বা জমা হত তাও বোঝা যাবে।

জায়গার নাম	ডাটল জাহাজ পরিমাণ গাঁইট	ডাটল জাহাজ ওজন টন/হন্দর	ডাটল জাহাজ মূল্য টাকা	প্যাসিফিক জাহাজ পরিমাণ গাঁইট	প্যাসিফিক জাহাজ ওজন টন/হন্দর	প্যাসিফিক জাহাজ মূল্য টাকা	বুটে জাহাজ পরিমাণ গাঁইট	বুটে জাহাজ ওজন টন/হন্দর	বুটে জাহাজ মূল্য টাকা
১। কাশিমবাজার	১০৩	২৮-০	২,০৯,৪০০	১৩২	৪০-০	৪,০১,০০০	৩০২	৬৭-১০	৫,৬৮,২০০
২। ঢাকা	১৭২	৪০-০	৩,১৮,৮০০	—	—	—	৩৯	১০-০	৪৬,৪০০
৩। মালদহ	৮০	২০-০	৭০,০০০	৪৫	১১-৫	৪৭,০০০	৬১	১৫-১০	৪৫,০০০
৪। চট্টগ্রাম	৬৯	১৭-০	৩১,০০০	—	—	—	১৪২	৩৩-১০	৪৪,০০০
৫। লক্ষ্মীপুর	৩৩৩	৭৯-৫	২,১৪,৬০০	১৬৮	৪০-০	১,২৩,৭০০	—	—	—
৬। পাটনা	২০৮	৪২-০	৯১,০০০	—	—	—	২১১	৪২-০	৮১,৬০০
৭। ঘাটাল	২৫	৭-৫	৫০,৭০০	—	—	—	—	—	—
৮। সূতি রুমাল	১০০	১৬-০	৬৪,০০০	২০০	৩২-৫	১,১৪,২০০	১৫০	২৪-০	৯০,০০০
৯। গড়া	৯০	১৫-০	৩৬,৭০০	১০০	১৬-০	৩৮,০০০	৮০	১৩-১০	৩০,০০০
১০। আরঙ্গের মাল	৩২০	৭৭-৫	৩,৪৪,৬০০	৯৮	২৪-০	১,৯২,০০০	১২১	২৯-০	১,০১,০০০
১১। কাঁচা রেশম	—	—	—	১১১	২৯-৭	২,০৬,০০০	—	—	—
	১৫০০	৩৪১-১৫	১৪,২৪,৮০০	৯৫৭	১৯২-১৭	১১,২১,৯০০	১১০৬	২৩৫-০	১০,০৬,২০০

লক্ষণীয়, গাঁইট প্রতি দামে বিভিন্ন জায়গায় কতো ফারাক। এই তফাৎ থেকেই বোঝা যায় কোন জায়গার মাল দামী। একটা ছক করলে দেখা যাবে যে :

কাশিমবাজারের প্রতি গাঁইটের মূল্য			চলতি টাকা	১০৩৩·০০
ঢাকার	ঐ	ঐ	ঐ	১৮৫৩·৪৮
আরঙ্গের	ঐ	ঐ	ঐ	১০৭৬·৮৭
লক্ষীপুর	ঐ	ঐ	ঐ	৬৪৪·৪৪

(হিসাবের সুবিধার জন্য দশমিক ব্যবহার করা হয়েছে।)

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হবার আগে কিন্তু কাশিমবাজারের রেশম সরবরাহের চিত্রটি খুবই স্পষ্ট। কান্তবাবু, তাঁর ভাই নৃসিংহবাবু, ভাইপো বৈষ্ণবচরণবাবু ও পুত্র লোকনাথবাবু মিলে যে এই রেশমী চিত্রের নেপথ্যের অনেকখানি জুড়ে আছেন সেটা বুঝতে কিছু অসুবিধা হয় না। ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসাটাই দেখা যাক। ১৭৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকনাথ কাঁচা রেশম যোগান দেবার চুক্তি করেন যার মূল্য হল ৮,৬৬,০০০ টাকা। এছাড়া প্রাণকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে সমান অংশে রেশমের তৈরী দ্রব্যাদি সরবরাহ করেন যার মূল্য ৫,০৫,৬৩৬-৮-০ টাকা। অর্ধেক অংশীদারীর জন্য ধরা হল ২,৫২,৮১৮-৪-০ অর্থাৎ এই বছর লোকনাথের মোট সরবরাহের পরিমাণ হল ১১,১৮,৮১৮-৪-০ টাকা।[১৪]। এক বছরে এগার লক্ষ টাকার জিনিষ সরবরাহ করা যে সহজ কাজ নয় তা সকলেই স্বীকার করবেন। এই হিসাব সিক্কা টাকার। প্রচলিত টাকার মূল্য যে আরো বেড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

এদিকে কাঁচা রেশমের দাম বৃদ্ধিমুখী। বাউলিয়া বা পদ্মাপারে প্রতিসের কাঁচা রেশমের দাম চড়ে গেল সাড়ে এগার টাকা। কুমারখালি মাঝামাঝি সাড়ে নয় টাকা দশ আনার মধ্যে মূল্য রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু গোলমালে ফেলল গুজরাটিরা। তারা রংপুরের রেশম তৈরী বহুলাংশে বাড়িয়ে সাড়ে আট টাকায় এক সের কাঁচা রেশমের বিক্রি করতে লাগলেন। বৈষ্ণবচরণ গুজরাটিদের সহায়তায় প্রচুর পরিমাণে গুজরাটি রেশম কিনে রাখলেন লোকনাথের চুক্তিমতো কাঁচা রেশম সরবরাহ করবার জন্য। বছরের শেষে লোকনাথ বেশ লাভ রাখলেন। পরের বছর নিজেই মাল সরবরাহ করবার চুক্তি করলেন অংশীদার ছাড়াই।

১৭৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লোকনাথের ব্যবসার পরিমাণ সিক্কা টাকা ২,৯১,৯৬১-৪-০ অথবা চলতি টাকায় ৩,৩৮,৬৭৫-০-৯ টাকা মাত্র।[১৫] কিন্তু বছরটা ভাল নয়। কলকাতায় গবর্নর জেনারেল হেস্টিংসের সঙ্গে কাউন্সিলে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিসের ঝগড়া খুবই চরমে উঠেছে। তারা নানা রকমে চেষ্টা করেছেন হেস্টিংসকে অপদস্ত করতে, যত না পারছেন তত ক্রুদ্ধ হচ্ছেন। ধর্মযাজক ও ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় ফারমিংগার সাহেব চমৎকার লিখেছেন যে 'কঞ্চি দেখলেই সেটাকে বাঁশ মনে করে সংখ্যা গরিষ্ঠরা হাত বাড়াতেন, উদ্দেশ্য প্রহার করা'। কান্তবাবুর রাজস্ব ব্যবসায় নিয়ে কিছুদিন চলল। হেস্টিংস জানালেন যে কোন সম্পত্তিই তিনি তার বেনিয়ানকে দেন নাই। বরঞ্চ তার কাছে যোগদান করবার আগেই সেগুলি তার ছিল। কান্তবাবুর নুনের ব্যবসা ঘেটেঘুটে দেখা হল, যদি প্রমাণ করা যায় যে গবর্নর জেনারেল তার বেনিয়ানের প্রতি অহেতুক কৃপায় কিছু অন্যায় সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন তাহলে তখনই চিঠি ছুটবে ইংল্যাণ্ডের পরিচালক মণ্ডলীর সভায়, অনুরোধ করা হবে হেস্টিংসের অপসারণের। পারিপার্শ্বিকের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই সে বছর কাঁচা রেশম সরবরাহ করলেন ইংরেজ কোম্পানীকে বৈষ্ণবচরণ। স্বাক্ষর হল ৭২,০০০ টাকার দাদনী চুক্তি, ৯ টাকা সের দরে দুশো মণ রেশমের টানা সরবরাহের প্রস্তাব।[১৬] চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার পরই বৈষ্ণবচরণ বুঝতে পারলেন যে সে বছর তিনিই একমাত্র কাঁচা রেশম সরবরাহকারী। চেষ্টা করলেন চাপ দিয়ে দাম বাড়াবার। কিন্তু মিডলটন সাহেবের শ্যেন দৃষ্টিতে সেটা ঘটতে পারল না। বৈষ্ণবচরণ সোজাসুজি মাল সরবরাহ করলেন। চুপচাপ থাকার কারণ ছিল! কারণ সে বছর মোট দাদনী ২৯,২৩,৪৬৪-৯-১১ টাকার মধ্যে একা লোকনাথের দাদনের পরিমাণ ছিল ৯,১২, ৩৭২-২-৬ টাকা[১৭] অর্থাৎ শতকরা ৩২ ভাগ বা এক তৃতীয়াংশ। ওদিকে বৈষ্ণবচরণের বাবা নরসিংহবাবু জেমস ইরউইন সাহেবের নামে ৭,৮০,০০০ টাকার রেশম সরবরাহ করলেন।[১৮] কার নামে কে ব্যবসা করছিলেন বলা শক্ত। তবে লাভের আশা ছাড়া নরসিংহবাবু কেনই বা যাবেন। তাছাড়া তিনি তখন রোজার বারওয়েল সাহেবের বেনিয়ানগিরিতে ইস্তফা দেবার কথা ভাবছেন।

পরের বছর ১৭৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লোকনাথের ব্যবসা বৃদ্ধি পেল। পাঁচশো

মণ সরেস রেশম সরবরাহ করবার জন্য তার সের প্রতি দশটাকা দশ আনা দর সর্বনিম্ন হল। তাছাড়া দশ টাকা দু আনা দরে তিনশো মণ রেশম আর রেশমের তৈরী জিনিষ নিয়ে তিনি মোট ৫,৯৯,৩২৪ সিক্কা টাকার ব্যবসা পেলেন।[১৯] প্রচলিত টাকায় তার মূল্য হল ৬,৪৭,২৬৯ টাকা তের আনা। এই বছরের মোট ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল প্রচলিত টাকায় ২০,০০,৩০১ টাকা। সুতরাং লোকনাথ নন্দী এবছরও এক তৃতীয়াংশ সরবরাহ করলেন।[২০] কান্তবাবুর রেশম ব্যবসায়ে এইটাই উচ্চতম শিখর। কারণ সব দিক থেকেই তার রেশম ব্যবসার কাছাকাছি কেউ ছিল না। বৈষ্ণবচরণ গুজরাটি বণিক-দের প্রায় একচেটিয়া সরবরাহকারী, নৃসিংহবাবু গুজরাটি ও সাহেবদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে সাহায্যকারী। কাশিমবাজারের রেশম ব্যবসায় কান্তবাবুর প্রভুত্ব হল অনস্বীকার্য্য।

কিন্তু রং ফিকে হতে আরম্ভ করেছে। রেশম ব্যবসায়কে অত কাছে থেকে জেনেছিলেন বলেই সর্বপ্রথম কান্তবাবু বুঝতে পারলেন জোয়ারের দিন শেষ, ভাটার টান শুরু হয়েছে। কাঁচা রেশমের মধ্যে খারাপ রেশম দেওয়া প্রচলিত হয়েছে, লম্বা রেশমের ডগা কেটে সেগুলি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, কলার মাড দিয়ে লালচে রেশমকে সাদা করে দেওয়া হচ্ছে কিছুদিনের জন্য। লোকনাথ কাঁচা রেশম সরবরাহ করলেন না কেবল রেশম দ্রব্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। সেখানেও দর খুব উঁচু। এবছর লোকনাথ দিলেন মাত্র ২,৪৬,০৩১-৪-০ সিক্কা টাকার মাল। ব্যবসায়ী সাহেবরা কিন্তু তাল ধরতে পারেন নাই। তাই একাধিক সাহেব ব্যক্তিগত রেশম ব্যবসায়ে বেশ কিছু টাকা করবার লোভে আগিয়ে এলেন। দেশী লোকদের যতই দোষ থাক রেশমের ব্যবসাকে নষ্ট করার দায়িত্ব এই সাহেবগুলির কম নয়। তারা উঁচু দাম হেঁকে নীচু জিনিষ কিনলেন। ভেজাল দেবার উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। সাহেবরা ভেজালে আসলে তফাৎ করতে পারলেন না। নৃসিংহবাবুকে মাদুলি করে ইরউইন সাহেব তো আগে থেকেই বসে আছেন। এবার দেখা গেল ক্রেগী, ওয়েডেল, চ্যাপম্যান, টুচে ও ওয়ারশিপ সাহেবগণও তালিকায় বিদ্যমান।[২১]

সাহেবরা ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় কিন্তু বিলক্ষণ চটে গিয়েছিল। লম্বা লম্বা দরখাস্ত দিয়েছিল কোম্পানীকে। ইংরেজ কোম্পানীও ব্যস্ত হয়ে বসাল এক কমিশন। সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে গুজরাটি রেশম ব্যবসায়ী

গিরধর দাসের কর্মচারিকে ধরে মস্ত জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হল। তাকে দিয়ে বলান হয় যে আসলে রেশম কম উৎপাদন হওয়াতেই এইসব চুরি জোচ্চুরি হয়েছে। আর এই সব অপকীর্ত্তির জন্য প্রধাণত দায়ী হল পাইকাররা। তারাই অতিরিক্ত দাদন দিয়ে আগে ভাগে পলু কিনে রাখে। বস্তর থেকেও তারা চায় বাস্তব মূল্য। কাজেই ভাল রেশম নষ্ট করে অনেকটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর রেশম তৈরীর উৎসাহ দেয় এবং অর্থের জোরে হুকুম তামিল করায়।[২২] সদানন্দের কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে তো চক্রের খালি এক অর্ধ। চক্র পূর্ণ করতে হলে স্বীকার করতে হবে যে সাহেবদের লোভ এবং নিয়মিত দেশী ব্যবসায়ীদের ছেড়ে নিজেদের কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছাই রেশম ব্যবসায় নষ্ট হবার মূল কারণ।

কান্তবাবু মেঘ দেখেই ঝড়ের আভাষ পেয়েছিলেন। ১৭৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লোকনাথ সরবরাহ করলেন মাত্র ১,৭০,১১৮-৪-০ সিক্কা টাকার মাল[২৩] এবং পর বৎসর ১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে দিলেন মাত্র ১, ২৩, ৯৩০ সিক্কাটাকার জিনিষ।[২৪] কোন বছরই তিনি আর কাঁচা রেশম সরবরাহ করেন নাই। কাঁচা রেশমের বাজার দেশী পাইকার আর লোভী সাহেবরা মিলে সম্পূর্ণভাবে জালিয়ে দিয়ে গেল। এই অবস্থায় বুদ্ধিমান লোকের যা করা উচিত কান্তবাবু তাই করলেন। একশত বছরের থেকেও বেশী পুরাতন নিজেদের রেশম ব্যবসায়কে গুটিয়ে ফেললেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে স্রোতের বিরুদ্ধাচারণ করলে পরিশ্রমই হবে কিন্তু লাভ হবে না। কয়েক বছর আগে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে তাঁকে নুনের ব্যবসাও গোটাতে হয়েছে। এখন জমিদারী ব্যবসার পথই খোলা কাজেই তিনি সেই দিকে মনোযোগ দিলেন। তবে রেশম ব্যবসাকে কান্তবাবু কখনও পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ করেন নাই। বন্ধুবান্ধবদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য রেশম বা রেশমী দ্রব্য তিনি সর্বদাই সংগ্রহ করে দিয়েছেন তবে তাকে ঠিক নিয়মিত ব্যবসা বলা চলে না।

রেশমের ব্যবসার আর একদিক ছিল কান্তবাবুর। তিনি কলকাতায় রেশমের গাঁইট পাঠাতেন। সাধারণত নদী পথেই এই গাঁইটগুলি যেত। লোকনাথ ইংরেজ কোম্পানীর সরবরাহকারী বলে কখনই তার নামে কোন গাঁইট পাঠান হত না। এগুলি যেত কান্তবাবু, নরসিংহবাবু ও বৈষ্ণবচরণবাবুর নামে। কান্তবাবুর ১১৮০ সালের (১৭৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দের) খতিয়ানেও

কলকাতায় নৌকা করে রেশম পাঠানোর খবর পাওয়া যায়। কিন্তু এবিষয়ে অনেক খবর লেখা ছিল শুল্ক বিভাগের নথিপত্রে। বাংলা সুবার চার জায়গায় এইরকম বিভাগ ছিল, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনা। প্রত্যেক জায়গাতেই আলাদা নথি থাকার কথা। দুঃখের বিষয় এই নথিগুলি খণ্ডিত। এমনকি শুল্ক বিভাগের কাগজ যা লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে সযত্নে রক্ষিত আছে তাও সম্পূর্ণ নয়। মাত্র কয়েক বছরের খবর জানা যায় এবং কোন বছরেরই পূর্ণ খবর জানা যায় না। এইসব নথি থেকে দেখা যায় যে কান্তবাবু ১৭৭৫ থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ প্রায় নিয়মিত ভাবেই কলকাতায় রেশম পাঠিয়েছেন। আগেকার খবর জানার উপায় নাই কারণ কাগজ পাওয়া যায় নাই। প্রত্যেক নৌকার জন্য আলাদা ছাড়পত্র দেওয়া হত। তার নাম 'রওআনা'। প্রত্যেক রওয়ানায় নম্বর ও তারিখ থাকত। কি জিনিষ তার পরিমাণ কতো এবং তার জন্য কতটাকা শুল্ক ধার্য হয়েছে লেখা থাকত। রেশমী জিনিষ বলেই ছেড়ে দেওয়া হত না 'বন্ধনী রুমাল' বা 'বাফতা' বা 'বানকের রেশম' (কথাটা ইংরেজীতে খারাপ শোনায় না বটে কিন্তু যদি জানা থাকে যে বানক কথার মানেও রেশম তখন একটু অদ্ভুত লাগে।) বা কস্তা রেশম বলে উল্লেখ করা থাকত।[২৫]

বোঝা যায় যে নৌকাপথে কান্তবাবুর রেশম কম আসত না কলকাতায়। তবে কি পরিমাণে এসেছিল এবং কোন সময় থেকে এসেছিল সে বিষয়ে ওই খণ্ডিত খবরের বেশী কিছু জানবার উপায় নাই।

শুল্ক বিভাগের হিসাব দেখতে গিয়ে জানতে পারা গেল যে কান্তবাবু নানা প্রকারের খাদ্যদ্রব্য, চাল, ডাল, তামাক, চিনি প্রভৃতি জিনিষও নৌকা পথে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করতেন। তাঁর নৌকা চলাচলের গতিবিধি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় তার ব্যবসা পদ্ধতী কি পরিমাণ সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ছয় নৌকা নুন হিজলী থেকে গেল শীলহট্ট (আধুনিক শীলেট)। সেখানে নুন নামাল কমলালেবু তুলল। তিনটা নৌকা কমলালেবু নিয়ে সোজা কলকাতা চলে এল। অন্য তিন নৌকা পথে নানা জায়গায় কমলালেবু নামাল এবং সেইসব জায়গা থেকে বিভিন্ন সওদা তুলে নিল। দুইটি নৌকা এবার সোজা কলকাতা গেল কিন্তু একটি নৌকা বিভিন্ন জায়গায় মাল তুলে ও নামিয়ে ভিন্ন রকমের দ্রব্যাদি নিয়ে কলকাতায় ফিরল।

কান্তবাবু সর্বদাই নানা ব্যবসা করেছেন আবার সময় মতো সে সব ব্যবসা গুটিয়েও নিয়েছেন। রেশম ছাড়া সব ব্যবসাই করেছেন কলকাতায়। যেমন ১৭৭৪ থেকে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চুণ সরবরাহ করেছেন ইংরেজ কোম্পানীকে, ওই সময়েই তামার পাতও সরবরাহ করেছেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জমিয়ে বসলেন সুতি কাপড়ের ব্যবসা করতে। এক বছরেই ব্যবসা করে ফেললেন একুশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সিক্কাটাকার। এবার চন্দননগরের ফরাসী কোম্পানীর সঙ্গেই ব্যবসাটা ভাল জমল। ছয় লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকার কাপড় একা তারাই কিনলেন। এদিকে খবর এসে গেছে তাঁতীদের দুর্দিন। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে কলে তৈরী সস্তা কাপড় জাহাজে উঠেছে। বাংলার বাজার ছেয়ে যাবে বিদেশী কাপড়ে। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বন্ধ করলেন কান্তবাবু কাপড়ের ব্যবসা।[২৬]

কান্তবাবুর জীবনে ব্যবসা শুরু হয় কাশিমবাজারে, হাতেখড়ি রেশমের ব্যবসায়ে। প্রকৃতির বিধানে কান্তবাবুর শেষ ব্যবসায়ও হল কাশিমবাজারে এবং ব্যবসার দ্রব্য হল রেশম। তৈরী করলেন 'ফিলেটুর' অভিধানে যার বঙ্গীয় প্রতিশব্দ 'রেশমের সূত্র নিষ্কাশনশালা'। পলু কিনে রেশম তৈরীর কারখানার বুদ্ধিটা এসেছিল বৈষ্ণবচরণের মাথায়। কান্তবাবু আপত্তি করেন নাই। সম্ভবত ভেবেছিলেন যে সত্তর বছর বয়সে, তাঁর এখন ধর্মেকর্মে মনোযোগ দেওয়াই ভাল। বৈষ্ণবচরণের বয়স তখন ৪৩ বৎসর, সুতরাং কি রকম কাজকর্ম শিখেছে দেখাই যাক। কান্তবাবু গেলেন বৃন্দাবন, মথুরা, গাজীয়াবাদে বালিয়া, কাশী, অযোধ্যা। ফিরলেন কাটোয়াতে বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে। এখানেই না নবদ্বীপের গোরাচাঁদ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কাটোয়াতে এতই ভাল লাগল সেখান থেকে সোজা চলে এলেন নবদ্বীপ। দীর্ঘ পথশ্রমে শরীর বেশ খারাপ হল। তাড়াতাড়ি ফিরলেন কাশিমবাজার। কবিরাজ এসে মাথা নেড়ে বলে গেলেন জীবন সঙ্কট। রাজারাম কবিরাজ মহাশয়ের ওই কথাটাকে সবাই ভয় করত। তার মুখ দিয়ে সঙ্কট কথা উচ্চারিত হলে সঙ্কট হবেই। ১০ই অগাষ্ট ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ, কলকাতা থেকে চ্যাপম্যান সাহেব বিলেতে হেস্টিংসকে পত্র দিলেন, 'আপনার পুরাতন বেনিয়ান কান্তবাবু অসুস্থ। সম্ভবত আর বেশীদিন বাঁচবেন না।'[২৭]

এদিকে বৈষ্ণবচরণের রেশম ব্যবসা চালু হয়ে গেছে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি বিরাট 'ফিলেটুর, কান্তবাবুর নামে একটি শ্রীপুরে অন্যটি নবীপুরে। ২৪৮১ মণ রেশমের মধ্যে কান্তবাবুর তৈরী হল ৩৩০ মণ।[২৮] তিনি হলেন কুড়িজন রেশম প্রস্তুতকারকদের মধ্যে একজন। কান্তবাবুর পছন্দ হচ্ছিল না ঘটনাস্রোত। তারপর লাভ কই। বৈষ্ণবচরণ বোঝালেন লাভ আসছে। দুই বছরের মধ্যে আবার পট পরিবর্তন। নবীপুর ফিলেটুর রেণ্টুল সাহেবকে বিক্রি করে শ্রীপুরের ফিলেটুর বড় করা হল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে।[২৯] তাছাড়া বৈষ্ণবচরণ গ্রামাঞ্চলে একাধিক ছোট ছোট 'ফিলেটুর' তৈরী করলেন নিজের নামে। দেখা যাচ্ছে এই বছরে বৈষ্ণবচরণের চারটি রেশম সূতা তৈরীর কারখানা ছিল। পলু পাবার সুবিধার জন্যই যে এগুলিকে রেশম চাষের কেন্দ্রভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই ফিলেটুরগুলির স্থান বিচয়নগর, কুমারখালি থেকে দূরত্ব সতের মাইল; মীরপুর হল কুমারখালি থেকে ষোল মাইল দূরে এবং চামতিয়া হল মনসেটপুর থেকে চোদ্দ মাইল দূরে। মীরপুরের দ্বিতীয় ফিলেটুর কান্তবাবুর বিশ্বস্ত কর্মচারী রঘুনাথ গোরার নামে স্থাপিত হল। এই চারটি জায়গার রেশম উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বার্ষিক প্রায় পাঁচশত মণ। দুঃখের বিষয় তার অর্ধেক উৎপাদন করা সম্ভব হয় নাই। ইংরেজ কোম্পানীও এইসময় বহু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতিযোগী হয়ে ফিলেটুর রেশম তৈরী করছিলেন। দেখা গেল ব্যবসায়ীরা যে অর্থে যে পরিমাণ ভাল রেশম উৎপাদন করছেন ইংরেজ কোম্পানী তা পারছেন না। মূল্য যাচ্ছে বেশী উৎপাদন হচ্ছে কম। কোম্পানী তখন ফিলেটুরগুলি বিক্রি করে দিলেন কিন্তু তার আগে এই লোকসানের কারণ বোঝবার জন্যে এক কমিশন বসালেন। কমিশনের জবানবন্দীর নিরস ও বিরক্তিকর কথা পড়তে পড়তে ছাকনায় ধরা পড়ল এক পরিক্ষিৎ মণ্ডল (ইংরেজরা তার নাম নিয়ে যে কি ভয়াবহ বিপদে পড়েছিল তা কহতব্য নয়)। ইনি ছিলেন বৈষ্ণবচরণ নন্দীর গোমস্তা। জানা গেল যে বৈষ্ণবচরণকে প্রতি বছর পনের বা ষোল হাজার টাকার পলু কিনতে হত। পরিক্ষিৎ পলু কিনতেন সাধারণত কুমারখালির কাছে বক্সীপুর থেকে কিন্তু তার অধিকাংশ পলু আসত পদ্মার অপরপারে মনসেটপুরের কাছে পাইকপাড়া থেকে। আরো জানা গেল যে বৈষ্ণবচরণের রেশমী সূতো বিক্রী

হত গুজরাটি বণিক নীলমণি দাসের কাছে। তিনি এই সুতো সাধারণত পাঠাতেন বারাণসী ও মীর্জাপুরে। এই সুতো তৈরীর খরচ পড়ত সের প্রতি সোয়া আট টাকা। প্রতি সেরে পরিক্ষিৎ পেতেন দুই আনা করে পারিশ্রমিক। এছাড়া মাসিক মাহিনাও ধার্য ছিল। সাহেবরা জিজ্ঞাসা করলেন যে তাদের উৎপাদন মূল্য কখনই সাড়ে দশ টাকার কম হয় না কেন। উত্তর যা লিপিবদ্ধ আছে তা সাহেবদের খুশী করবার জন্ম বলা হয়েছে বলেই মনে হয়। উত্তর: 'ভাল রেশম তৈরী করতে দশ টাকাই পড়বে কিন্তু একটু খারাপ শ্রেণীর রেশম তৈরী করলেও একই দাম পাওয়া যায়।'[৩০]

জবানবন্দীগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে রেশম ব্যবসা নিম্নমুখী। ইংরেজ কোম্পানী, বৈষ্ণবচরণ এবং আরো আঠারো কুড়িজন ব্যক্তি একটি মৃত ঘোড়াকে চাবুক মেরে ছোটাবার চেষ্টা করছিলেন। চাবুক চালানোতে যে পরিশ্রম ব্যয় হল তাতে হয়তো তারা নিজেরাই ঘোড়ার মতো ছুটতে পারতেন। কান্তবাবু আর বৈষ্ণবচরণকে সময় ও অর্থ নষ্ট করতে দিলেন না। স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় প্রথমে রেশম তারপর পলু তারপর যন্ত্র ও বাড়ী বিক্রি করে বৈষ্ণবচরণকে নদীয়াতে একটি বৃহৎ জমিদারী কেনালেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের আগে কান্তবাবু যে ফিলেটুর রেশম উৎপাদনে সময় নষ্ট করেছেন তা শুধু কোম্পানীর কাগজেই লেখা থাকল। অন্য কেউ জানল না।

নৃসিংহ বা নরসিংহবাবু এবারে এক বিপদে পড়লেন। হেঞ্চমন সাহেব মারফৎ বিলেতে রেশম পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন কান্তবাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করে। মুর্শিদাবাদে এক উঠতি মহাজন ব্রজ পাণ্ডা, দুই সাহেব আর নরসিংহের কাছে হাতচিটা নিয়ে বারো বা তের লাখ টাকা খরচ করে ফেললেন। ব্যবসায় লোকসান হল। ব্রজ সর্বস্ব হারাল। সাহেব দু'জন বিভিন্ন পথে ভারতবর্ষ থেকে পালালেন। নরসিংহ উপায়ান্তর না দেখে বৃন্দাবনে পলায়ন করলেন কারণ বৃন্দাবন তখনও কোম্পানীর রাজত্বের বাইরে। কথামালার গল্পের মতো নরসিংহ অতি লোভে সব হারালেন, তার ছেলে জ্যাঠামশায়ের কথা শেষ সময়ে শুনে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করলেন আর কান্তবাবু রেশমের ব্যবসায় সময় মতো গুটিয়ে বেশী লোভ না করে সব থেকে বেশী লাভ করলেন। ছাব্বিশ বছর বয়স হতে হতেই লোকনাথের চোখের

সামনে যে সব ঘটনা ঘটল তাতে ব্যবসা করার ইচ্ছা যদি তার মন থেকে উবে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কান্তবাবু রেশম দিয়ে জীবনের শুরু করেছিলেন, রেশম থেকেই গড়ে তুলেছিলেন ভবিষ্যত বংশের ভিত্তি প্রস্তর, আবার রেশম দিয়েই জীবনের শেষ কর্তব্য সমাধা করলেন। সময় আবর্তিত হল। সূর্য পরিক্রমায় উপস্থিত ১২০০ সাল। ২৯শে পৌষ সংক্রান্তি, নবমী তিথি। মধ্য গগনে সূর্য উঠবার আগেই গঙ্গাতীরে পুত্র পরিজন বন্ধুবান্ধবদের কাঁদিয়ে পরপারে যাত্রা করলেন কান্তবাবু। একমাত্র পুত্র লোকনাথ মুখাগ্নি করলেন। দুই বিবাহিতা সধবা কন্যা গঙ্গামণি ও যমুনামণি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন। স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরী বিধবা সাজলেন। চিতাধূম দিকদিগন্ত আচ্ছন্ন করল। এক যুগান্ত হল। নূতন পৃথিবী নূতন সূর্যের আশায় প্রতিক্ষা করতে লাগল।

আট

রেশমের সুদিনের সময়েই কাশিমবাজারে সুতি কাপড়ের ব্যবসার উৎকর্ষ ঘটে। বলা হয়েছে আগেই যে কাশিমবাজারে অবস্থিত গুজরাটি বণিকরাই সর্বভারতীয় ব্যবসাকে চালাতেন। প্রতি বছর মির্জাপুর বারণসীতে দু'শো থেকে তিনশো মণ সিল্কের থান যেত। মির্জাপুর থেকে এই থান নাগপুরে গিয়ে জামা কাপড়ে রূপান্তরিত হয়ে চলে যেত মোগল, মারাঠা, বীজাপুর, নিজাম প্রভৃতি বিভিন্ন দরবারে। নাগপুর, ছত্তরপুরে ও পুনায় কিংখাপ ও গুলবাহার বা ব্রোকেড তৈরী করা হত। গুজরাটিরা সমুদ্রপথে সুরাটে পাঠাতেন কমবেশী ৬০ গাঁইট কাঁচা রেশম, প্রতি গাঁইটের ওজন ছিল পঁচিশ মণ। টাকার মূল্যেরও সুবিধা ছিল ১০০ টাকার বিনিময়ে বোম্বাই ও সুরাটে ১১৬ টাকা পাওয়া যেত।[১] এই সব ব্যবসার বিনিময়ে গুজরাটিরা কাশিমবাজারে নিয়ে আসতেন কার্পাস তুলো তাই থেকে তৈরী হত সুতি কাপড়। এদিকে ভাল রেশম উৎপাদনের আশায় ইংরেজ কোম্পানী একদল ইটালীয় কারিগরকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দেই কুমারখালিতে এনে রেখেছিলেন। এমন কি চীন থেকে রেশমকীট বা পলুর ডিম আনারও ব্যবস্থা হয়েছিল। রিলিং ব্যবস্থাও এট সময়ে প্রচলিত হল। পিতলের দাঁতযুক্ত রিলিং যন্ত্র দেশী চরখার থেকে জোরদার ছিল। কিন্তু রেশম ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে দেশীয় তাঁতীদেরও কাজে উৎকর্ষ দেখা গেল। তারা রিলিংচক্র ব্যবহার করে সুতো তৈরীতে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। তাই রেশমের পরই তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনে কাশিমবাজার বিখ্যাত হয়েছে। তাঁত শিল্প কাশিমবাজারের প্রাচীনতম ঐতিহ্য। বস্তুত তাঁত-শিল্পের উন্নত অবস্থার জন্যই রেশম শিল্পের অত উন্নতি আবার রেশম উৎপাদনের উন্নতিতেই তাঁত শিল্পের উৎকর্ষ বেড়ে যাওয়া সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না ওই বিরাট কাঠমো সংব তাঁতশিল্পের সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত। সুতি কাটা কাপড়ের ব্যবসা কাশিমবাজারে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দুইশত বছর এক নাগাড়ে চলেছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী ২,৯০,০২২ টাকা কেবল সুতি কাপড়ে লগ্নি করেন। কুমারখালি, বরানগর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৫,৬৬,৯০৮ টাকা লগ্নি করা হয়।[২] নানারকমের সুতি

কাপড়ের নাম পাওয়া যায় যেমন মলমল, তাঞ্জিব, আবরোঁ, আলাবলি, নয়নসুক, সরবতী, তেরিনদাম, সরকার আলি, জামদানী, হামাম, শীরবন্ধ ডুরিয়া ও বাদানখাস। সূক্ষ্ম কাপড় 'খাসা' নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া ছিল বাফতা, সান্নুস, গড়া। অমৃতি নামে একশ্রেণীর কাপড় তৈরী হত। সূতি মোটা থানা, যার ওপর রঙ্গিন ছাপা হত ইংরেজদের কাছে 'সিণ্টজ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। অপূর্ব ছাপা কাজের নিদর্শন বালুচরী সাড়ীতে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। পুরানকালের কাপড়ে রং ও নক্সার কাজ আজ বিস্ময় সৃষ্টি করে। ছাপার কাজে কাঠের তৈরী নক্সা ব্যবহৃত হত তারপর বিভিন্ন রং ধীরে ধীরে একে একে ছাপ দেওয়া হত। শিল্প কর্মের চমৎকার উদাহরণ এই সব নক্সায় বিদ্যমান। এই সমুদায় দ্রব্যসম্ভার বন্দর কাশিমবাজার থেকে বিদেশে রপ্তানি হত।

রাধাকৃষ্ণ নন্দীর হিসাব থেকে সূতি কাপড় সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়া যায়। 'গড়া' শব্দটা নিয়ে বেশ গোলমালের সম্ভাবনা কারণ সূতি ও রেশম দুই রকম দ্রব্যেই গড়া আছে। এক্ষেত্রে দামটা প্রণিধানযোগ্য। সূতি গড়ার দাম সর্বদাই রেশমী গড়ার থেকে কম। তাছাড়া 'ডুরিয়া' কথাটা নিয়েও ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি ডুরিয়া থান বিক্রি করা হয়েছে সাড়ে তের টাকায়।[৩] কাজেই দাম দেখে বুঝতে হবে এ ডুরিয়া রেশমের, সূতির নয়। তেমনি তিনটাকা থানের গড়া অবশ্যই সূতি-রেশম নয়। কান্তবাবু ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রচুর 'সিণ্টজ' সরবরাহ করেছিলেন আমরা অবগত আছি। ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই তাঁর রাজসভায় যেমন রেশমী রুমাল ও বন্ধনীকে প্রচার করেছিলেন তেমনি ইংল্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় মেরী 'সিণ্টজের' প্রচলন করেছিলেন তাঁর দরবারে। মোটা সূতি গড়ার ওপর রঙ্গিন ফুলকাটা ভারতীয় কাপড়ের পোষাক না পরলে তখন ইংল্যাণ্ডে আধুনিক পোষাকে সজ্জিত বলে গণ্য হওয়া যেত না।[৪] হেস্টিংস মাদ্রাজে এসেই রেশমের সঙ্গে সূতি কাপড়ের সম্ভার কাশিমবাজার থেকে কিনে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। কান্তবাবুর ১১৮০ সালের খতিয়ান থেকে কিছু সূতি বস্ত্রের দাম দেওয়া হল:

তের হাত গড়া	থান প্রতি	দেড় টাকা
ছত্রিশ হাত গড়া	ঐ	চার টাকা

দোসূতি	থান প্রতি	চার টাকা
মোমের জামা	প্রতিটি	দুই টাকা
পাহান	ঐ	তের আনা
চৌদ্দ হাত পোষাকী	থান প্রতি	সাড়ে সাত টাকা
ছাপা	ঐ	পাঁচ টাকা এগার গণ্ডা
মুগা-মটকা শাড়ী	প্রতিটি	তিন টাকা ছয় আনা
চৌদ্দ হাত মুগা-মটকা শাড়ী	ঐ	দুই টাকা পনের আনা
ষোল হাত মুগা-মটকা শাড়ী	ঐ	তিন টাকা ছয় আনা
চৌদ্দ হাত মেপী	ঐ	ছয় টাকা পনের আনা
ষোল হাত মুগা	ঐ	এক টাকা ছয় আনা
রঙিন কোরা শাড়ী	ঐ	সাত টাকা দশ আনা

এছাড়া চাহারাম, পাঞ্জিম, পূর্বা, বাধা, বাফতা প্রভৃতি কাপড়গুলি সের দরে বিক্রী করা হত। মুশকিল হল যে এই বস্তুগুলি কি রকমের ছিল জানবার কোন উপায় নাই। সের দরে বিক্রী হত বলে এইটুকু অনুমান করা যায় যে এগুলো সরেস বা খাসা শ্রেণীর কাপড়। প্রতি সেরের দাম ছয় আনা, এক টাকা থেকে তিন টাকা (চাহারাম) পর্য্যন্ত ধার্য্য ছিল। এছাড়া যেমন মাজনার দাম ছিল পাঁচ টাকা বারো আনায় কুড়িটি, তেমনি নাদান খাসার একটি থানেরই দাম ছিল তের টাকা।

চৌদ্দ বছর পর অর্থাৎ ১১৯৪ সালে, ইংরেজী ১৭৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কান্তবাবু যখন জোর কদমে সূতি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন দামের হিসেব তখন আর নাই। নির্দ্দিষ্ট মাপের থানেই অধিকাংশ কেনাবেচা চলছে। কেবল রেশম মিশ্রিত সূতি কাপড়ের জিনিষ আলাদা ভাবে প্রতিটির দরে বিক্রি হয়। একই ধরণের জিনিষের স্থান ভেদে কি রকম দামের তফাৎ হত নীচের তালিকায় বোঝা যাবে। দাম ভেদে মানের ভেদ সেকথা বলাই বাহুল্য। এই সময় কান্তবাবু নানা জায়গা থেকে মাল এনে কলকাতায় বসে বিক্রি করছেন। তাই নানা জায়গার উৎপাদনের দাম পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে যে সূতি কাপড় তৈরীর প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা, মালদহ, লক্ষ্মীপুর, ফরাসডাঙ্গা ও হরিপাল। বিভিন্ন রকমের 'খাসা'র মধ্যে সব থেকে দামী ছিল নদীয়ার খাসা তৈরী হত শান্তিপুরে। বাপ্তার মধ্যে লক্ষ্মীপুরী বাপ্তার দাম ছিল সব

থেকে বেশী। শান্তিপুরী ও পাটনাই নামের কাপড় ওই দুই জায়গায় তৈরী হত। ঢাকাই মলমল যেমন ছিল মানে তেমনি দামেও শ্রেষ্ঠ। মালদহ থেকে আসত কেবল গাঁইট গাঁইট সাড়ী। ইংরেজী ভাষা তখন বাংলায় ঢুকতে আরম্ভ করেছে তাই এগুলির পোষাকী নাম হল 'সাটিপ্যাকেট'। প্রচুর পরিমাণে কাটনিও বিক্রি হত।

দ্রব্য তালিকা

লক্ষ্মীপুরী খাসা	৪০ × ২ হাত	সিক্কা টাকা	৩-৮-০
কাগমারী খাসা	৪০ × ২ হাত	ঐ	৭-০-০
জগন্নাথপুর খাসা	৪০ × ২ হাত	ঐ	১৪-০-০
নদীয়া খাসা	৪০ × ২ হাত	ঐ	১৯-০-০
মুগদা খাসা	১০ × ২ হাত	ঐ	৩-৮-০
খাসা ছাপনাহ (ওসনাহ)	২০ × ২ হাত	ঐ	৬-৪-০
বীরভূম গড়া	৩৬ × ২ হাত	ঐ	২-০-০
নির্গী গড়া	৩৬ × ২ হাত	ঐ	৫-০-০
হামাম	২০ × ২ হাত	ঐ	৪-২-০
হরিয়ালী মলমল	৪০ × ২ হাত	ঐ	৭-৮-০
শান্তিপুরী মলমল	৪০ × ২ হাত	ঐ	৮-০-০
ঢাকাই মলমল	৪০ × ২ হাত	ঐ	১৪-০-০
পাটনাই মামদী	৪০ × ২ হাত	ঐ	৩-১২-০
হরিয়ালী আজতাই	২০ × ২ হাত	ঐ	৫-০-০

খুব বড় মাপের থানও বিক্রি হত যেমন ৭৬২ × ৭৮ হাত। পুরো মালের দাম পড়েছিল ৬৭৫১ সিক্কাটাকা। পরিমাণ না থাকার জন্য দর জানা যায় না। এছাড়া ছিল ধূতি, বলাই বাহুল্য। কয়েকটা নাম পাওয়া যায়, বর্ণনার অভাবে সেগুলি কি ধরণের কাপড় বোঝবার উপায় নাই, যেমন কর্পূর বসন, নীলাভাঙ্গা বা নীনাডাঙ্গা এবং বুটিদার। আন্দাজ করা যায় বটে কিন্তু চিন্তা কখনও স্পষ্ট হয় না যেমন হয় দাম পেলে। ফুলকাটা বা ফুলিকাট বা ফুনিকাট প্রতিটির দাম সোয়া সাতটাকা। সেজন্য মনে হয় যে রেশম মিশ্রিত সূতি কাপড়ের আওতায় এটি থাকা উচিত। রুমাল বলতে আজকাল যেমন

পকেট থেকে বের করা ছোট্ট চতুষ্কোণ কাপড়ের টুকরোটার কথা মনে আসে, আগেকার রুমাল কিন্তু তা ছিল না। রুমাল সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান হত কারণ কথাটার মানেই হল সবদিকে সমান। সাধারণত ৫ × ৫ হাত রুমালই প্রচলিত ছিল। যদিও অন্য মাপ হত না এটা মনে করা ভুল হবে। থানের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে ২০ × ২ হাতের কাপড়ের সঙ্গে রুমালের তুল্যমূল্য করা চলে। সাগুমালি রুমাল প্রতিটির দাম ছিল ছয়টাকা আর ঢাকাই সফেদ রুমালের প্রতিটির দাম ছিল পৌনে ছয়টাকা করে। শান্তিপুরী ২০ × ৩ হাত রেশম মিশ্রিত কাপড়ের দাম ছিল প্রতিটির তেরটাকা।

বাংলার জিনিষের দাম কিন্তু চিরকালই চালের মূল্য ধরে উঠেছে। চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করেছে বস্ত্রের দাম তারপর চাল ও বস্ত্র একত্রে অন্য সব কিছু জিনিষের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেছে। দুইশত বছর আগের এই সত্য আজও প্রচণ্ড ভাবেই জীবিত। যে সরকার চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করে অন্য মূল্য কমাবার চেষ্টা করেছেন তিনিই ব্যর্থ হয়েছেন। চালের মূল্য বাংলার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করেছে। সুতরাং অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর দাম জানা দরকার।[৫]
সময় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ॥

১।	শ্রেষ্ঠ (সরেস)	চাল	—	প্রতিমণ	১-৬-০	টাকা
২।	ঐ	ঘি	—	ঐ	১০-০-০	,,
৩।	ঐ	তামাক	—	ঐ	২-৬-০	,,
৪।		নুন	—	ঐ	১-৯-০	,,

বাংলার সূতি কাপড়ের বাজারও ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেশ তেজী ছিল বলা চলতে পারে। বাংলার তাঁতীরা জানতে পারে নাই যে সেখানেও ভাটার টান শুরু হয়েছে। ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কল সূতি কাপড় তৈরী করে সেগুলিকে এদেশে পাঠাবার জন্য তখন প্রস্তুত হচ্ছে। ইংরেজ কোম্পানী ভারতে প্রস্তুত তুলা নিয়ে যেতে লাগল। সেই কার্পাসেই প্রস্তুত কল বস্ত্র বিদেশের যন্ত্রে ফিরে এল দেশে বিলিতি কাপড় হয়ে। কার্পাসের অভাবে দেশীয় বস্ত্রশিল্প শুকিয়ে যেতে লাগল, উৎপাদন কমে যাওয়ায় দাম দিনে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হল। অন্যদিকে সস্তা বিলিতি কাপড়, গ্রহণ না করে

উপায় কি? তুলার দুর্ভিক্ষ ও সস্তা বিলিতি কাপড় বাংলার তন্তুশিল্পকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। বাংলার তাঁতের গৌরব পরিণত হয়েছে রূপকথায়। রূপকথার মতোই সত্য নির্দ্ধারণ না করে অলীক কল্পনায় ভরে গেছে বাংলার তন্তুশিল্পের ইতিহাস।

বাংলার তাঁতশিল্পের উৎকর্ষ যে উপন্যাস নয় সত্য ঘটনা একথা বোঝবার লোকের অভাব সর্বত্র এই বিংশশতাব্দীর আগত অষ্টমপাদে। তাই এই শিল্পকে জাগরিত করবার কোন চেষ্টাই স্বাধীন ভারতে হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রতীক করলেন যখন ক্ষুদ্র দেশী চরকাকে তখন তার পেছনে যে কি বিরাট অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল তা দৃষ্টি এড়িয়ে গেল কেবল তাঁর সমসাময়িকদের নয় উত্তরসুরীদেরও। গ্রামবাংলার তাঁতশিল্প উপেক্ষিতই থাকল, সহরাঞ্চলে করা হল ম্যাঞ্চেস্টারের অনুকরণ। বাংলার তাঁতী হয়ে গেল ভূমিহীন চাষী, হয়ে গেল দিনমজুর, হয়ে গেল ভিখারী। বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা রাজনৈতিক কর্তাদের একছত্র অধিকার হয়েছে সন্দেহ নাই। স্বাধীনতার ত্রিশবছর পরেও তাদের মূর্খতার সেই অভ্রংলিহ তুষারকিরিট হিমালয় এখনও নিত্য বর্ধমান। বাংলার তন্তুশিল্প আজও মৃত।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতীয় তুলায় উৎপাদিত বিলিতি বস্ত্র এদেশে আসতে শুরু করল। প্রথম বছর এল দশলক্ষ টাকার বস্ত্র ইংল্যাণ্ড থেকে। তারপর থেকে প্রতিবছর বস্ত্র আমদানী হতে লাগল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে হল ১৪ লক্ষটাকা, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ লক্ষটাকা, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪২ লক্ষটাকা, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭০ লক্ষটাকা, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ৪৬ লক্ষটাকা, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ৮৫ লক্ষটাকা, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ১ কোটি ১২ লক্ষটাকার কাপড় আমদানি হয়।[৬]

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে টাঁকশাল মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হল বটে, কিন্তু রেশম ব্যবসায়ের মাধ্যমে কাশিমবাজারের উন্নতি অব্যাহত থাকল। ১৭৯৩ পর্য্যন্ত ব্যবসার জগতে তার প্রাধান্য স্পষ্ট। বাংলার তাঁতি ইংরেজী মতে 'ওয়াইনডিং' শিখে নিল। জেনে নিল কি করে পুরাতন 'রিলিং' পদ্ধতীর উন্নতি করতে হয়। তার পারদর্শিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। বিদেশী মতে বাংলার কারিগরদের মতো রেশমের গতানুগতিক উৎপাদনে শিল্প সৃষ্টি করা আর কারুপক্ষে সম্ভব হয় নাই। পলাশির যুদ্ধের আগে

বাঙ্গালী তন্তুবায়ের যে বিশেষত্ব ছিল, পলাশির পঞ্চাশ বছর পরে তা একটুকুও ক্ষুন্ন হয় নাই বরঞ্চ বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে এটা কম শ্লাঘার কথা নয়। ইংরেজ অধীন তন্তুশিল্পকে কর্তার ইচ্ছামতো, রপ্তানীর তাগিদ ও প্রয়োজন মেনে চলতে হয়েছে। কিন্তু তা স্বত্বেও হাতের ছোঁওয়া আর রেশম বা তুলোর স্থতো মাধ্যমে অপরূপ শিল্প সৃষ্টি বার বার বিদেশীয়দের বিস্মিত করেছে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দকে কেন্দ্র করলে দেখা যাবে যে ইংরেজ অধীনেও তন্তুশিল্পের উন্নতি অব্যাহত। শুধু অব্যাহত নয় তার গতি প্রকৃতি ও বিস্তার প্রসারিত। যেন ইংরেজ আমলে অর্থচিন্তা না করেই দ্রুত শিল্পকীর্তিকে নূতন পথে চালনা করা চলে এবং তাতেই অধিকতর লাভের আশা। ইংরেজ অধীনে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। শুধু ছিল না সেই আকাশের অসীম উদারতা। শিল্প আর শিল্পী প্রয়োজনের বেতনভুক, মস্ত মাকড়শার মুনাফার মজুর। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু হতে না হতেই তাই তন্তুবায়ের অবনতি আশ্চর্য করে না। সর্বগ্রাসী লোভের বেদীতে বাংলার বয়নশিল্প চিরকালের মতো নিষ্পিষ্ট হল।

ঘরের বধূর ভূমিকা থেকে যেদিন তন্তুশিল্প দেহবিলাসিনীর রূপ গ্রহণ করেছে সেদিনই তার বিধিলিপিতে লিখিত হয়েছে যে যৌবনের অন্তর্ধানেই তার মৃত্যু হবে। এবার তাই হল। ইটালীর রেশম ইংল্যাণ্ডে বাংলার রেশমের থেকে সস্তা হল যদিও বাংলার রেশমের খরচ অনেক কম। নিপ্রণে রেশমের ও সুতির কাপড়ের উৎকর্ষতা নষ্ট হয়ে গেল সেই সঙ্গে নষ্ট হল বাংলার খাঁটি রেশমের সুনাম, সুতি স্থতো বয়নের মনোহারিত্ব। সাতপরৎ মলমলের কাপড়ে যে দেহ ঢাকা যেত না তা গল্প নয়, রেশমের সাড়ী পরিহিতা কন্যাকে যে বাদশাহ উলঙ্গ ভেবেছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে সেই প্রথম বাংলার রেশম শিল্পকর্মের পারদর্শিতা দেখবার সুযোগ পেলেন।

ধ্বংসের করাল ছায়া রেশম ও তন্তুশিল্পের ওপর যখন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নেমে এল তখন সকলেই এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। যাঁরা অনেক খোঁজখবর রাখতেন তারা মনে করেছিলেন যে নেপোলিয়ানের উন্নতি ও রাজ্যবিস্তার বাংলার রপ্তানির বাজারকে সাময়িক ভাবে বন্ধ করেছে। কিন্তু ঘটনা একেবারেই বিপরীত। নেপোলিয়ান ইটালী জয় করবার পর ইংল্যাণ্ডে ইতালীয় সিল্ক যাওয়া বন্ধ হলে বাংলার রেশমের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে তাই রেশমের বাজারে তেজী ভাব দেখা যায়।[৭] ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে হুকুম

এল যে কমপক্ষে আট হাজার গাঁইট রেশম যেন পরের বছর নিশ্চয় রপ্তানি করা হয়।[৮] ওই বছরের ১ জুন আরো জানান হয়েছে যে দুইলক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ কুড়ি লক্ষ টাকা কেবল রেশম শিল্পে লগ্নি করবার জন্য পাঠান হচ্ছে।[৯] ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে টাকার পরিমাণকে বাড়িয়ে ৪২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।[১০] ইতিমধ্যে কাঁচা রেশম থেকে ও ভারতীয় কার্পাস থেকে উৎপন্ন কাপড়ে ভারতের বাজার ছেয়ে গেছে। ছেয়ে গেছে আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষ সস্তা দামের ইতালীয় সিল্কে আর ম্যাঞ্চেস্টারের তৈরী সুতি কাপড়ে, ছেয়ে গেছে রঙ্গিন সস্তা ছাপা কাপড়ের থানে। তারপর এক ঘনঘোরঘটা লগ্নে বিগত যৌবন রক্ষিতার মতো ইংরেজ কোম্পানী টেনে আস্তাকুড়ে ফেলে দিল রেশম শিল্পকে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রেশমের কারবার ও ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হল।[১১] ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ নাভিশ্বাসের সময়। কাশিমবাজারে সে বছর ২০০০ মণ রেশমের সুতো তৈরী হল। কোরা কাপড় বিক্রি নেমে এল বছরে মাত্র দুই লক্ষটাকায়। মাঝে মাঝে পর্যটকেরা এসে যদিও রেশম ও সুতি দ্রব্যসম্ভার দেখে অবাক হয়েছেন, কিন্তু তখন রেশম ব্যবসা মৃত্যু পথযাত্রী। শুদ্ধমাত্র মুষ্টিমেয় দেশীয় লোকের কৃপায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় মরণোন্মুখ রেশম ও তন্তুশিল্প কুটিরশিল্প হয়ে লুকিয়ে থাকার প্রয়াস করার সুযোগ পেয়েছে মাত্র। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের স্ত্রী, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিলটন সাহেব এবং বাংলার দুই গবর্নর লর্ড কারমাইকেল ও লর্ড কার্জন রেশম শিল্প সম্পর্কে যে প্রশংসার বাণী রেখে গেছেন তা কাশিমবাজারের ঐতিহ্যপূর্ণ রেশম ও তন্তু ব্যবসার পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত করুণ বলে মনে হয়।

কাশিমবাজার যদি বন্দর না হত তাহলে সোরার ব্যবসার সুযোগ কখনই পাওয়া যেত না। কাশিমবাজারের অর্থনীতির উন্নতির আর এক কারণ সোরা। সোরা কখনই কাশিমবাজারে তৈরী হত না, পাটনা এবং তার নিকটস্থ অঞ্চল থেকে আসত। তখনকার দিনে বন্দুক ও কামানের গোলাগুলি তৈরী করার জন্য সোরা ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। পাটনা থেকে ছোট ছোট জাহাজে সোরা আসত কাশিমবাজারে। সেখানে সোরা ঢেলে দিয়ে সোরার জাহাজ পাটনা ফিরে যেত। বন্দর কাশিমবাজার থেকে বড় জাহাজে উঠত এই সোরা চলে যেত সোজা কলকাতা। সোরা কি রকম লাভের ছিল বুঝতে পারা যাবে যদি জানা থাকে যে ফ্রান্সিস সাইকস ১৭৬৫

খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের দরবারে রেসিডেন্ট থাকার সময় দুই বছরে কেবল সেলামী বাবদই বারো তের লক্ষটাকা রোজগার করেছিলেন। বারওয়েল ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠীর প্রধান হন। তিনি তার পিতাকে এক পত্রে লিখে জানান যে সোরার ব্যবসায় সেলামী বাবদ তার পঞ্চাশহাজার টাকা লাভ হয়েছে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজার নদী দিয়ে কলকাতায় সোরা আনার খরচ পড়ত মণ প্রতি ৩/৬ তিন আনা, কিন্তু গ্রীষ্মে কাশিমবাজার নদীতে জল কমে যেত এবং জায়গায় জায়গায় শুকিয়ে যেত তখন পদ্মা ও সুন্দরবন দিয়ে কলকাতায় সোরা আনার খরচ হত মণ প্রতি ছয় আনা। পাটনায় ইংরেজ কোম্পানীর প্রধানদের প্রায়ই কাশিমবাজারের কুঠীয়াল প্রধানকে সোরা জাহাজগুলিকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখতে হত।

এইসময় অনেক নূতন ব্যবসা শুরু হয়। হস্তিদন্ত শিল্প কি করে এখানে উপস্থিত হল বলা কঠিন। কারণ এই শিল্প সাধারণত যেখানে হস্তিদন্ত পাওয়া যায় সেখানেই স্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রাজধানীর মর্য্যাদা হস্তিদন্তের শিল্পকে প্রসারিত করেছে। আধুনিককালে ঠিক একই কারণে হস্তিহীন হস্তিনাপুরে বা দিল্লীতে হস্তিদন্ত শিল্পের চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের কথা যে দুই শতাব্দী অতীত হলেও হস্তিদন্ত শিল্প অপূর্ব কারু দক্ষতায় এখনও বিরাজমান। কাঠের কাজের শিল্পও খুবই উন্নতি করল। সুতি ও রেশমের কাপড়ের ওপর রঙিন ছাপ এই কাঠের নক্সার মাধ্যমেই দেওয়া হত। খুব চমকদার কাঠের রেলিং বা জালি কাজের বিশেষত্ব 'কাশ্মিরী' কাজ নামে চালু থাকলেও স্থানীয় শিল্পীদের বা কাঠের মিস্ত্রির হাতেই সম্পন্ন হত। কাঠের কাজের ঐতিহ্যও তাই ছোট নয়। যদিও লোকচক্ষুর সম্মুখে তার নিদর্শন, সবসময়ে দেখান সম্ভব হয় না। পুরাতন অভিজাত বাড়ীতে খুঁজলে এই শিল্প উৎকর্যতার কোন পর্য্যায়ে পৌছেছিল বোঝা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছর কাশিমবাজারের শিল্পকর্মের সুসময়। কারণ এই সময় সাহেবরা দেশের প্রভু। কেবল ক্ষমতা নয় অর্থবানও তাঁরা। যা কিছু পছন্দসই জিনিষ চড়া দামে কিনে হয় জমা করতেন নয় তো আরও উঁচু দামে আর কাউকে বিক্রি করতেন। এই সময় ধূলা-মুঠিও সোনামুঠিতে রূপান্তরিত হত। রূপার কাজের দক্ষতার যে নিদর্শনগুলি

আজও চোখে পড়ে তা দেখে মনে হয় এই শিল্প অত্যন্ত উন্নত ছিল। মুর্শিদাবাদী বিদরি কাজ, রূপার কাজের উৎকর্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। দুঃখের বিষয় মুর্শিদাবাদী বিদরি কাজের নিদর্শন খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের বিশেষত্ব ছিল রূপার চুমকির পাতাবাহার আর গায়ে কালোর পরিবর্তে ঘন সবুজ রং। কাগজ তৈরীর জন্য কাশিমবাজার সুনাম করেছিল ভাবতে অবাক লাগে। চুনাখালিতে প্রস্তুত হাতে-তৈরী কাগজ কলকাতাতেও প্রচুর বিক্রি হত। দীর্ঘদিন কাগজ প্রস্তুতকারকরা টিকে ছিলেন। তারা উপাধিও নিয়েছিলেন 'কাগজী'। বংশ পরম্পরায় তারা কাগজ তৈরী করার বিদ্যা বলে যেতেন। বিলিতি সস্তা কাগজের দাপটে মাত্র বিংশ শতাব্দীতে 'কাগজী'রা সাধারণ চাষীতে রূপান্তরিত হলেন। আজও 'কাগজী' চাষীদের মধ্যে সম্মানিত। কিছুই তখন বৃথা যেত না। বাতিল হওয়া রেশম দিয়ে তসর, মটকা, ছালের কাপড় তৈরী হোত।

পাটের খবর এসময় তেমন পাওয়া যায় না। আফিংএর চাষ রংপুর থেকে সরে গিয়ে ক্রমে বিহারে সীমাবদ্ধ হয়েছে। গুজরাটি রেশমের মতো বাংলার আফিং আলস্যপরায়ন গবেষকদের বোকা বানাচ্ছে। বাংলায় একদা তৈরী হত বলে বিহারের আফিংএর চাষ থেকে যে অহিফেন তৈরী হত তা 'বাংলার আফিং' এই শিরোনামায় জমা পড়ত। আধুনিককালে কেবল ছাপ দেখে চিনতে গিয়ে অনেকেই ভয়ানক ভুলের স্বর্গ তৈরী করেছেন। কিন্তু স্বর্গ তো, সেখান থেকে বিদায় নিতে ইচ্ছা হয় না। বাংলার কাতান বা দড়ি তৈরী শিল্প নানাজায়গায় ছড়িয়ে ছিল। নারকোলের দড়ি বিশেষ করে ছালের দড়ি তখন প্রচলিত ছিল। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে তখন কার্পাস তুলা আর ইক্ষুচাষ বিশেষ জনপ্রিয় এবং বিস্তারিত ছিল।[১২]

১৭৭৬ সালের কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দর দেওয়া হল।

ইট	১০০০ টার	দাম	৭-৮-০	টাকা
চুণ	১০০ মণের	দাম	৯০-০-০	,,
সুরকি	১০০ মণের	দাম	৭-৮-০	,,
কড়ি তৈরীর জন্য কাঠ	প্রতিটি		১৮-০-০	,,
খড়	প্রতি পণ		১২-০-০	,,
বাঁশ	১০০টা		১৪-০-০	,,
পাট	প্রতি মণ		২-৪-০	,,

ইংরেজ সাহেবরা কাশিমবাজারে ভাল থাকতেন। তাঁদের মতে এটি ছিল অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানীর এক কেরানী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কাশিমবাজারে বদলির আবেদন করেছেন।[১৩] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবসার পরেই স্বাস্থ্যের সুনাম কাশিমবাজারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য করা হত। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ওর্মেসাহেব কাশিম-বাজারের চমৎকার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার প্রসংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।[১৪] পলাশির যুদ্ধের পর যে সব ইংরেজ কলকাতা বা চন্দননগরে ছিলেন তাঁরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাশিমবাজারে অবস্থিত ২৫০ জন গোরা সিপাহির মধ্যে ২৪০ জনই সুস্থ ছিলেন।[১৫] কলকাতা কাউন্সিল ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থির করেন যে অধিক সংখ্যক গোরা সৈন্যদের কাশিমবাজারে রাখা হবে কারণ কলকাতার আবহাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যহানিকর।[১৬] ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কেবল গোরা সৈন্য নয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহু গণ্যমান্য কর্মচারী কাশিমবাজারে অবস্থান করতেন। এরা ছাড়া ছিলেন বহু ইও-রোপীয় ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী। কেবল বৃটিশ বা ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী ছাড়া ছিলেন ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার ও আর্মেনিয়ান খোজা ব্যবসায়ীগণ। সুবিখ্যাত সুইস ব্যবসায়ী ফুরসার্ডকে ১১৯৪ সালের (১৭৮৭-৮৮) খতিয়ানে পাওয়া যায়। কাশিমবাজারে যে বেশ বড় রকমের ইওরোপীয় বসতি ছিল তা বোঝবার প্রধান উপায় ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ও আর্মেনিয়দের পৃথক সমাধিক্ষেত্র। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কাগজে হঠাৎ উঠে এসেছে কিছু সাধারণ ইংরেজ, সংখ্যায় বাইশজন, যারা স্থায়ীভাবে কাশিমবাজারে বসবাস করতেন। এরা কেউ জিনিষপত্র বিক্রি করতেন, কেউ মদের দোকানের মালিক, কেউ মাংস বিক্রেতা, কেউ হাতি বিশেষজ্ঞ, কেউ বাড়ী তৈরীর কনট্রাকটর। এই বাইশজনের মধ্যে একজন স্বাস্থ্যচর্চাকর, তিনজন নবাবের অশ্বশকটের প্রধান চালক এবং চারজন দরজি ছিলেন। দরজির দোকান দুইটি ছিল, প্রত্যেক দোকানে দুইজন বিলাতি দরজি এবং তাদের সহকারীগণ থাকতেন।[১৭] সুবিখ্যাত স্থপতি টমাস লায়ন অসুস্থ হবার পর দীর্ঘদিন কাশিমবাজারে অবস্থান করেন।[১৮] লায়ন কলকাতার প্রথম ত্রিতল গৃহ নির্মান করেন বারওয়েল সাহেবের সম্পত্তির ওপর। পরিকল্পনা থেকে গৃহ-নির্মান সবই লায়ন সাহেবের নির্দেশে হয়। বর্তমানে এই বাড়ী রাইটাস

বিল্ডিং নামে পরিচিত। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেও কাশিমবাজারের প্রশংসা অব্যাহত। কাপ্টেন হ্যামিল্টন কাশিমবাজারকে বলেছেন অতি স্বাস্থ্যকর জায়গা। তিনি তার উর্বর জমি এবং কর্মক্ষম ও পরিশ্রমী অধিবাসীদের প্রশংসা করে গেছেন। কিন্তু ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতি শেরউড কাশিমবাজারকে 'অত্যন্ত গরম ও স্যাঁতস্যেঁতে, দেমো আলসেমিতে পূর্ণ', বলে লিখেছেন। তাঁর মতে গোটা দেশটা, 'মদ চোলাই করা পাত্রের মতো গরম'। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ভিতরবঙ্গের একটি বড় ব্যবসায়ী সহর' বলে গণ্য হলেও তখন তার পূর্ব গৌরব লুপ্ত প্রায়।[১৯]

উত্থান পতন, সংগঠন সংযোজনের অপরূপ ইতিহাস কাশিমবাজারে দেখা যায়। বাংলার শিল্পের প্রাধাণ্যের মূলে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপন্নকারীদের নৈপুণ্য ও হাতের কাজের সৌকর্য। সস্তা আমদানি এই শিল্প নিপূণতাকে চিরকালের মতো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। বাংলার শিল্পকে যারা পৃথিবীর বাজারে সুপরিচিত করেছিল সেই কারিগর শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হল। বেঁচে যারা থাকলেন দু' চারজন তাঁরা বংশপরম্পরায় কুটির শিল্পের মতো ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেই রেশমের বুনন, সেই বালুচরী ছাপ ও সুতার কাজ, সেই হস্তিদন্ত, শোলা বা কাঁসা পিতলের সুরুচিপূর্ণ শিল্পকর্মের নমুনা, ভুলে যাওয়া স্মৃতির মতো বর্তমান কালের সামনে তুলে ধরলেন। পুরাতন যুগের শিল্পের পরিপাট্য বা রঙের মাধুর্য্য বা বুননের ঐতিহ্য কিছুই এই শিল্পকর্মের মধ্যে থাকল না তবু বর্তমান কাল তাই দেখেই মোহিত হল। ছায়াকে বুকে তুলে নিয়ে কায়ার প্রতি অনাদরের প্রায়শ্চিত্ত করল।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পৃথিবী পালটে গেছে। ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও জার্মান সকলেই একে একে ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীকুল রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে লড়াই করতে নামে নাই বলেই না ব্যবসায়ী হয়ে নানা জায়গায় জমিয়ে বসেছে। কলকাতা ও সৈদাবাদ দুটোই তাদের বড় ঘাটি। ইংরেজ জমিয়ে বসেছে কলকাতায়, গড়ে তুলেছে ভূগর্ভস্থিত আজব এক দুর্গ। আইন শৃঙ্খলা নূতন ভাবে প্রবর্তিত হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানী জানিয়ে দিয়েছে যে আইনের সাম্রাজ্য তারা তৈরী করবেন। আইন মেনে চললে, তার আওতার মধ্যে থাকলে যে কোন ব্যক্তি সাধ্যমতো অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও ফারসী আইন জানা মৌলবীকে

নিয়ে বিচার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যেখানে দেশী আইন পাওয়া যায় না সেখানে সাগরপারের বিলাতি আইন অনুসারে বিচার হয়। সংস্কৃত চর্চা শুরু হয়েছে নূতন করে। কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনা করে প্রাচ্যচর্চার কেন্দ্রভূমি রূপে তাকে গড়ে তুললেন বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোনস। হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হল। আবিষ্কৃত হলেন মহাকবি কালিদাস। উইলিয়ম জোনস কৃত অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হলেন আর এক খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ যিনি নিজের নামকরণ করেছিলেন 'শ্রীম্যাক্সমুলর ভট্ট'। গড়ে উঠল মক্তব ও মাদ্রাসা। গড়ে উঠল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, দেশীয় বিদ্যার্জনের প্রধান কেন্দ্র। ঐ কলেজের শিক্ষক হয়ে যে পণ্ডিতপ্রবরদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তারা হলেন গোলকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি, মোহন প্রসাদ ঠাকুর, হরপ্রসাদ রায় ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন।[২০]

ইংরেজ রাজত্ব প্রসারের সঙ্গে আইনের রাজত্ব ও বিদ্যাচর্চার প্রসার হওয়ায়, দেশীয় লোকেদের চরিত্রগত পরিবর্তন হতে থাকল। প্রথম পরিবর্তন লক্ষণীয় হল বটে কলকাতায় কিন্তু ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলায় এই নূতন হাওয়া দেখা গেল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তন করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রেভেনিউ ফারমিং করে বা রাজস্ব ব্যবসায়ে যারা বুৎপত্তি লাভ করেছেন তারাই হলেন নূতন জমিদার শ্রেণী। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে মন্দা পড়তে জগৎশেঠ বংশও জমিদারে রূপান্তরিত হলেন। বসার জায়গা বা সম্মানে তখনও তাঁর স্থান বাংলার নবাবের পরেই, কিন্তু এরা তখন খেলার নবাব, খেলার শেঠ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জগৎশেঠ ইন্দ্রচাঁদকে বাড়ীর গহনা বিক্রি করতে দেখে যত না আশ্চর্য্য হতে হয় তার থেকেও আশ্চর্য্য লাগে ইংরেজ কোম্পানীর কাছ থেকে ১২০০ টাকা করে মাসহারা গ্রহণ করাতে।[২১] ব্যবসায়ী বাংলার সঙ্গে জগৎশেঠ-বংশের পতনের ইতিহাস জড়িত হয়ে এই শেঠ বংশের ক্রমাবলুপ্তিকে এক ব্যাথাবিধুর কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছে।

নয়

কাশিমবাজারের জমিদাররূপে পরিচিত হলেন কৃষ্ণকান্ত নন্দীর একমাত্র পুত্র মহারাজা লোকনাথ বাহাদুর। জমিদারী-ব্যবসা চালনা করাই তার মূল লক্ষ্য। তিনিই যে একদা চার বছর বয়সে লবণ ব্যবসায়ী, সাত বছর বয়সে রেশম ব্যবসায়ী ও এগার বছর বয়সে রাজস্ব ব্যবসায়ী হয়েছিলেন তা দেশের ভিন্নতর পরিস্থিতিতে ভুলে যেতে হল। জমিদারী পরিচালনা করা সহজ কাজ ছিল না, কারণ কেবলমাত্র রাজস্ব নির্ধারণ করে আদায় করা নয়, সেই আদায়ী টাকা নিয়ে আসা এবং সরকারী খালসা তহবিলে সময় মতো টাকা জমা করতে হত। নিয়মিত সূর্যাস্ত আইনে বহু জমিদারী বরবাদ হয়ে যেত। দুর্বলের স্থান ছিল না, সবল এবং কর্মোক্ষম জমিদারগণই উন্নতি করতে পারতেন। মহারাজা লোকনাথ সার্থক জমিদার ছিলেন। নিলামে ওঠা জমিদারী কিনে তিনি নিজের আয় ও পরিধি বৃদ্ধি করলেন। খাজনা আদায় ও রাজস্ব জমা দেবার ব্যবস্থাও তাঁর চমৎকার ছিল। প্রত্যন্ত জমিদারী থেকে খবর এল যে আদায়ের সময় উপস্থিত! সঙ্গে সঙ্গে সদর থেকে সেপাইশাস্ত্রী নিয়ে নায়েব যাত্রা শুরু করতেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নৌকাযোগে কলকাতায় যেতেন। সেখানে বৃহৎ কোন ব্যবসায়ীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হত যে তিনি রাজস্ব খাতে দেয় অর্থ দেবেন এবং সমপরিমাণ অর্থ তাকে দেওয়া হবে সেই জমিদারীর নিকটবর্তী তাঁর যে কোন ব্যবসার কেন্দ্রে। এই ব্যবস্থা চালু থাকায় এবং তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হওয়ায় লোকনাথ সর্বদা সময়ে রাজস্ব জমা দিয়েছেন। তার আদায়ীকৃত খাজনা কখনও পথে হৃত হয় নাই। ব্যবসায়ীর সঙ্গে লেনদেন চালু থাকায়, কি পরিমাণ অর্থ পথে আসছে তাও জানা সহজ ছিল না। ফলে তার আদায়কারীদের ওপর হামলাবাজী বা ডাকাতির কোন ঘটনা হয় নাই। কান্তবাবু কলকাতায় সুতি কাপড়ের যে বিরাট ব্যবসা কয়েক বছর করেছিলেন তারই সূত্র ধরে বড়বাজারের শেঠ ব্যবসায়ীরা সর্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। খ্যাতনামা বস্ত্র ব্যবসায়ী বিষ্ণুচরণ শীল ও তার পুত্র নীলাম্বরের সঙ্গেও লোকনাথের সম্পর্ক ঘনিষ্ট ছিল।

আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় শীর্ষস্থানীয় হলেও মহারাজা লোকনাথের ব্যক্তিগত জীবন খুবই দুঃখের। পিতার মৃত্যুর ছয় বছরের মধ্যে বাড়ী

একেবারে শূণ্য হয়ে গেল। প্রথমে মারা গেলেন দত্তকপুত্র বালক গোলকনাথ, তারপর গোলকনাথের পার্থিব পিতা বৈষ্ণবচরণ। পুত্র ও পৌত্রের শোক সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধ নৃসিংহচরণ বৃন্দাবন থেকে ছুটে এলেন। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হল। মারা গেলেন পিতৃব্যপুত্র গুরুচরণ এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দচরণ। মারা গেলেন কনিষ্ঠ পিতৃব্য গোকুলচাঁদ যাঁর ওপর কলকাতার কাজের ভার ছিল। কাশিমবাজারে কোন মহামারীর প্রকোপ হয়েছে উপলব্ধি করে তিনি কলকাতা ছেড়ে আসতে চান নাই। সেখানেই তার মৃত্যু হল। এইসব বিপদের মধ্যে লোকনাথের দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকতে, আধুনিক কালের অবাক লাগবে। কিন্তু শুভকাজ বিপদকে আটকে রাখতে পারল না। লোকনাথের মাতা অনঙ্গমঞ্জরী দেবী পরলোক-গমন করলেন। সংসারে থাকলেন লোকনাথ তাঁর দুই স্ত্রী আর দুজন নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র।

ব্যক্তি জীবনের এই দুঃখ তাঁকে কতটা দুর্বল করেছিল কয়েক বছর পরে বোঝা গেল। তিনি পিতার যোগ্য পুত্রের মতো বিপদের মাঝেই যেন পরিপূর্ণভাবে জেগে উঠলেন। সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে নিয়োগ করলেন জমিদারীর উন্নতির জন্য। মুর্শিদাবাদে ছিল কান্তনগর, লোকনাথ এবার দিনাজপুরে 'কান্তনগর পরগণা'র পত্তন করলেন। নদীয়াতে সৃষ্টি করলেন দুইটি পরগণা যাদের নাম হল পরগণা লোকনাথনগর আর পরগণা লোকনাথপুর। নদীয়ার মহারাজা ঈশ্বরচ· ৩২ আষাঢ় ১২০৮ উখরা জেলা তাকে বিক্রি করে দিলেন। সেটিও লোকনাথপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত করা হল।

বন্দরের কর্মব্যস্ততা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল যদিও যাতায়াতের পথ হিসাবে তার প্রয়োজন স্বীকৃত। নদীপথই তখন সব থেকে দ্রুতগতি। ঘোড়া ও নদী দুইটি যারা ব্যবহার করতেন তারাই সব থেকে কম সময়ে স্থানান্তরে যেতে পারতেন। লোকনাথের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি লক্ষণীয়। জগৎ-শেঠ অভয়চাঁদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব সর্বজন বিদিত। বিষ্ণুপুরের রাজা গরুর নারায়ণকে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হল। বিবাদিত সম্পত্তি থেকে বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁর অধিকার ত্যাগ করলেন। কলকাতায় একাধিক সম্পত্তি খরিদ করে লোকনাথ সেখানেও এক পুরাদস্তুর সেরেস্তা বসালেন।

ইংরেজী শিক্ষিত কোম্পানীর কর্মে নিরত কর্মচারীকে বেশী মাহিনায় সংগ্রহ করে তাকে সেরেস্তা চালাবার ভার দিলেন।[১]

১২০৯ সালে (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে) লোকনাথ ক্ষমতার শিখরে। ধনেজনে তাঁর সংসার পূর্ণ। কেবল একটি ভয় মৃত্যুর এবং একটি অভাব বংশধরের। লোকনাথ গোব্রাহ্মণের সেবায় দিন অতিবাহিত করতেন। দানধ্যান, পালা-পার্বন, হোমদক্ষিণা এবং ধার্মিক ক্রিয়াকলাপে তার খ্যাতি সুদূর প্রসারিত ছিল। অবশেষে ঈশ্বর করুনা করলেন, ১২০৯ সালের ২০শে ভাদ্র তাঁর একমাত্র পুত্র হরিনাথের জন্ম হল।[২] হরিনাথের অন্নপ্রাশনের উৎসবের বিবরণ বালুরঘাটের মাহল্লা মণ্ডলের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়।

'তার ঘরে পুত্র হৈল রাজা হরিনাথ
ভুবন জিনিঞা হৈল রূপের ব্যাখ্যাত ॥
পুত্র ঘরে হৈল রাজা খয়রাত করএ।
অথিত অভ্যাগত জতো আইসেন তথাএ ॥
অন্নদান বস্ত্রদান করেন বিস্তর।
রজত কাঞ্চন দিল ইদান অপার ॥
জতেক খয়রাত করে কি কহিব তার।
অথিত অভ্যাগত আসে হাজার হাজার ॥'[৩]

এই ঘটনার পর মহারাণা লোকনাথ লোকান্তরিত হলেন ১২মে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে। মাত্র দেড় বছর বয়স্ক শিশু হরিনাথ হলেন উত্তরাধিকারী।

কাশিমবাজার ফ্যাক্টরীর হিসাবের বইগুলি বন্দর কাশিমবাজারের পতনের সব থেকে বড় সাক্ষী। পর পর সাজিয়ে পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বহরমপুরকে সৈন্য সহর (canto.ment) রূপে তৈরী করার জন্য ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই করা হচ্ছিল। যে ভাবে জরিপের কাজ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয়েছে তাতে এই নূতন পরিকল্পিত সহর স্থাপনা যে বেশ পুরাতন চিন্তা বুঝতে কষ্ট হয় না। বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টের নক্সা তৈরী যখন হয়ে গেল তখনও কিন্তু কোম্পানী একখানি ইঁটও পোড়ায় নি। এই নক্সায় দেখান হল কোথায় সৈন্যরা থাকবে, কোথায় কুচকওয়াজ করবে, কোথায় তাদের জন্য বাজার স্থাপিত হবে। খেলার মাঠ থেকে কবরখানা পর্য্যন্ত সবই পরিকল্পনায় ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিকল্পনা বদলে গেল।

স্থির হল যে কেবল ক্যান্টনমেন্ট নয় তার সঙ্গে এটিকে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান সহর হিসাবে তৈরী করা হোক। তদনুযায়ী কোর্ট, কাছারি, কলেজ, পানশালা এবং রাজপুরুষদের বাসস্থান প্রভৃতিকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করা হল। আশ্চর্যের কথা যে পরবর্তীকালে বহরমপুরে সব কিছুই কিন্তু এই পরিকল্পনার নক্সা অনুযায়ী হয়েছে। গোরাদের জন্য বাজার, গোরা সৈন্যরা চলে যাবার পরও গোরাবাজার নামেই চলে আসছে। পাশেই রুটিমহলে মুসলমান প্রধান্য ইতিহাসের ছাত্রের কাছে একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট বন্দর কাশিমবাজারের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। কাশিমবাজারের বরাদ্দ মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বহরমপুরে উন্নতির জন্য খরচ করবার হুকুম হল সেই ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে।[৪] বহরমপুরে যেমন ধীরে ধীরে এক জঙ্গী সহরে রূপান্তরিত হল, বন্দর কাশিমবাজার থেকে ইওরোপীয় অধিবাসীগণ তেমনি ধীরে ধীরে বহরমপুরে সরে এলেন। সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী ফার্গুসন সাহেব জমি কিনে বাড়ী করলেন, বাড়ী করলেন বারটন সাহেব। আরো অনেকেই তাদের অনুসরণ করলেন।

ইংরেজদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। আইনের সাম্রাজ্যবাদ স্থাপিত হল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিজামৎ-বংশের হিঙ্গুসাহেব খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হলেন। এনসাইন নর্টন নামে এক ইংরেজ কাটোয়াতে এক হিন্দু রমণীর মৃত্যুর কারণ বিবেচিত হওয়ায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল।[৫] আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় কোম্পানী বাহাদুর তাঁদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন।

কাশিমবাজারে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন করলেন কান্তবাবুর পৌত্র রাজা হরিনাথ রায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। নিজে ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলেই বিদ্যা বিস্তারে তিনি অগ্রণী হলেন। কাশী থেকে কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে কাশিমবাজারে নিয়ে এসে তাঁর পরিচালনায় অনেকগুলি চতুষ্পাঠী স্থাপন করলেন। কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ন্যায় ও স্মৃতি উভয় বিষয়েই শিক্ষাদান করতেন। নদীয়ায় ন্যায় পাঠ করার ফলে ন্যায়পঞ্চাননের পরিচালনায় চতুষ্পাঠীগুলি সর্বদা ছাত্র পরিপূর্ণ থাকত। দেশের নানা জায়গা থেকে বিদ্যার্থীগণ কাশিমবাজারে সমবেত হতেন।[৬] ব্রাহ্মণগণ সাধারণত বামুন-গাছিতে অবস্থান করতেন। ফলে এখানে ক্রমে বৈষ্ণব ও শৈব ব্রাহ্মণগণ

দুইভাগে বিভক্ত হলেন। ব্যাসপুর শৈব আরাধনার ও চর্চ্চার কেন্দ্র হয়ে উঠল। ব্যাসপুরের শিবমন্দির তৎকালীন যুগের মন্দির শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হল এই শিবমন্দির। শিল্পকর্মে দেখা গেল উল্টান পদ্মের মতো শিখরকে ধরে আছে তরঙ্গায়িত কারনিস। প্রবেশ পথ এক বাংলা চালা সদৃশ্য। উচ্চতা ভূমি থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফিট, মোট চৌদ্দ ফিট দশ ইঞ্চি ঘন বর্গ চৌক ভিত্তি।[৭] হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য চিন্তার অপরূপ সমন্বয় প্রকাশ হয়েছে এই মন্দিরে। মসজিদের শিখর গড়তে শিখে হিন্দু স্থপতিগণ মন্দির শিল্পের নূতন দিক নিদর্শন করলেন। তারই এক চমৎকার প্রকাশ দেখা যায় ব্যাসপুরের মন্দিরে। শুধু এই একটাই নয়। একাধিক মন্দিরে দেখা যায় এই রূপকল্প। শুধু নদীয়া-মুর্শিদাবাদেই কমপক্ষে আট দশটি মন্দির এই রীতিতে গড়া। কিন্তু সকলের মধ্যে ব্যাসপুর মন্দির শ্রেষ্ঠ। তার গায়ের কারুকার্য্য অনন্য। পোড়ামাটির মূর্তিগুলিকে চমৎকার মুন্সিয়ানায় মন্দিরগাত্রে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

ইংরেজ শাসনের আর এক দান শিক্ষা বিস্তার। কেবল হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও সংস্কৃত চর্চ্চা নয় ফারসী চর্চ্চাও জোর কদমে চলতে লাগল। মক্তব ও মাদ্রাসা নূতন সরকারের পৃষ্টপোষকতা লাভ করল। শিক্ষা বিস্তারে রাজা হরিনাথের বিশেষ মনোযোগ ছিল। তিনি পুত্র কৃষ্ণনাথকে সংস্কৃত, ইংরেজী ও ফারসীতে সুদক্ষ করবার জন্য যেমন ইংরেজ শিক্ষক রেখেছিলেন তেমনি সে যুগের অন্যতম পণ্ডিত দিগম্বর মিত্রকে কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষক করেছিলেন। কলকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর কুড়িহাজার টাকা দান উল্লেখযোগ্য।[৮] এই জেলায় প্রথম স্কুল স্থাপনার গৌরবও রাজা হরিনাথ দাবী করতে পারেন। সমস্ত ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করেও তিনি স্কুল আরম্ভ করতে পারলেন না। মাত্র ত্রিশবছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর সৈদাবাদে ইংরেজী শিক্ষার এই বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। মুর্শিদাবাদের এটি প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয়। বিদ্যোৎসাহী রাজা হরিনাথ ঈশ্বরপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথের বদান্যতার কথা সংবাদপত্রে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হয়েছে। স্টুয়ার্ট সাহেব এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।[৯] কিছুদিনের মধ্যেই কৃষ্ণনাথ 'মুর্শিদাবাদ নিউজ' নামে ইংরেজী ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। রাজরোষে সেটি

বন্ধ হলে 'মুর্শিদাবাদ সংবাদপত্রী' নামে বাংলায় দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।[১০]

ব্যবসায়ী কাশিমবাজার ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দেও জীবন্ত ছিল। তখনও রেশম ও সূতি কাপড়, সোরা, চিনি ও নীলের ব্যবসায় চলছে। চাল যা উৎপন্ন হয় তা নদীপথে বিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিহার থেকে আনা হয় বিভিন্ন রকমের ডাল। স্থলপথেও চাল উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে রপ্তানি হতে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদে তখনও প্রচুর পরিমানে ধান, নীল, সরষে, তিসি, মটরের ডাল ও তুঁত উৎপন্ন হচ্ছে। নীল চাষ কায়েমী হয়েছে জঙ্গিপুরে ও কান্দিগঞ্জে। উৎপন্ন নীলের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫০০ ও ২০০০ মণ। জঙ্গিপুর ঘাটে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে টোল আদায়ের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশহাজার টাকা। সেটা ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধি পেয়ে হল দেড় লক্ষ টাকা।[১১]

এ সবই ছিল মৃত্যুর আগেকার শেষ ঝলক। তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রামের ঘটনা আবার অভিনীত হল। অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীতে জল কমে যায় খরার দাবদাহে। তখন নৌকা চলাচল বিঘ্নিত হয়। পারাপারের ঘাটে তাই জিনিষপত্র এই সময়ে নামান এবং তোলা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এই জায়গা 'ঘাটবন্দর' নামে পরিচিত হতে থাকে। বন্দরের নদী যত ক্ষীণকায় হয়ে যায় ঘাটবন্দরের প্রয়োজন নদীর উৎফুল্ল গতিপথে ততই বেশী করে উপলব্ধি হয়।

কাশিমবাজার বন্দর শহরের অবনতির জন্য প্রকৃতিও যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। যে নদীর বাঁক কাশিমবাজারের উন্নতির প্রধান সহায় বন্দর কাশিমবাজার সৃষ্টির কারণ, সেই বাঁক থেকে নদী গেল সরে। সপ্তগ্রাম যেমন কুৎসিৎ গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে, গৌড়ের প্রাধান্য, শান্তিপুরের সৌন্দর্য্য যেমন অবলুপ্ত হয়েছে, তেমনি নদীর চঞ্চলা গতি কাশিমবাজারের পতনেও সহায়ক হল। স্বীকার করতে হবে যে নদীর গতিতেই ধ্বংসের নিশানা ছিল। প্রায় ৯০ ডিগ্রীর বাঁক নিয়ে দক্ষিণমুখী নদী যখন দক্ষিণপূর্ব প্রবাহে অশ্বক্ষুর মুখে প্রবেশ করত তখনই রাশি রাশি পলিমাটি বাঁকের মুখে জমা করত। ক্রমে বর্ষার উত্তাল তরঙ্গে বয়ে আনা পলিমাটির পাহাড় ভেদ করে শীতের ক্ষীণ শক্তি নদীর গতি ক্ষীণতর হয়ে এল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে

বার্নিয়ার ও টেভার্নিয়ার স্মৃতি সহরে পৌছবার পর, বার্নিয়ার জলপথের অসুবিধার জন্ত স্থলপথে কাশিমবাজারে উপনীত হন। টেভার্নিয়ার এই বাঁকটিকে ক্ষুদ্র খাল বলে অভিহিত করেছেন। হেজেস ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মহুলা পর্য্যন্ত এসে স্থলপথে কাশিমবাজারে আসেন। হলওয়েল পলাশির যুদ্ধের পর জলাভাবে বড় বজরা ছেড়ে একটা ছোট নৌকায় চেপে বন্দরে নামেন।[১২] বর্ষায় বন্যা ও শীতে জলাভাব ক্রমে নিয়মিত রূপ নিল। কুঠী রক্ষার জন্ত বর্ষাকালে ইংরেজ ও ফরাসী কুঠীয়ালদের নানা উপায় অবলম্বন করতে হত। পাড় বাঁধা, বাঁশের বেড়া দেওয়া, চাটাইএর ওপর মাটি লেপে জল আটকাবার চেষ্টা প্রভৃতি নানারকমের মজাদার প্রক্রিয়ার খবর ইংরেজ ও ফরাসী মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজের মধ্যে পাওয়া যায়। কলিকাতা গেজেটে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ সেপ্টেম্বর কাশিমবাজারে এক বন্যা প্লাবনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। সমস্ত সহর সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়। জল সরে যাবার পর ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী প্লেগের আক্রমণ হয়। দুই বছর পরে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজার নদীতে এক সাইক্লোনের কথা কলিকাতা গেজেটে উল্লেখিত হয়েছে। এই ঝড়ে মেজর ডান ও তাঁর স্ত্রী জলে ডুবে মারা যান। এবারও জলে বসত অঞ্চল প্লাবিত হয়।[১৩] ফলে বহু বাড়ী পড়ে যায় এবং অধিবাসীরা পলায়ন করে। বন্যার শেষে এক মড়কের উল্লেখও করা হয়েছে।[১৪] স্বভাবতই জঙ্গলের বৃদ্ধি হয়েছে, জনবসতি ক্ষীণ হয়ে গেছে। বন্য জন্তুর উপদ্রব সৃষ্টি হয়েছে। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ভেলেস্লিয়া লিখেছেন যে কাশিমবাজারে বাঘের উপদ্রবে অস্থির হয়ে প্রতি বাঘ বধের জন্ত কোম্পানী দশটাকা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেন।[১৫]

বন্দর কাশিমবাজারের মৃত্যুর জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পূর্ত বিভাগ সম্পূর্ণ দায়ী। তাঁরা নদীর নাব্যতা বজায় রাখবার জন্য যেমন কোন চেষ্টা করেন নাই তেমনি পলিমাটির শ্বাস রুদ্ধতার প্রয়াসকে বাধা দেন নাই। বস্তুত বাঁকের মুখ থেকে পলিমাটি সরাবার জন্য একটি কপর্দকও তাদের ব্যয় করতে দেখা যায় না। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের পরিকল্পনা হল অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীর প্রবেশ ও বহির্গমনের পথ দুটি যোগ করে দেবার। এই কীর্তির পরেও যখন ভাগীরথী যথেষ্ট জলপূর্ণ হল না তখন এল আর এক পরিকল্পনা। পদ্মা যেখানে ভাগীরথীর থেকে পৃথক পথে প্রবাহিত সেইখানে শুরু হল খননকার্য। পদ্মার

থেকে কিছু জল ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত করা হল। ফল হল চমৎকার। পলিমাটির জঞ্জাল মুক্ত নবীন নদী আনন্দ প্রবাহে ছুটে চলে। তার গতি পশ্চিমদিকে চলে যায়। যে নদী মুর্শিদাবাদ সহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল তা সরে গেল তার পশ্চিম প্রত্যন্তে। ভেঙ্গে পড়ল কতো নবাবী প্রাসাদ, সিরাজদ্দৌল্লার সাধের হীরাঝিল, মোরাদবাগের প্রমোদগৃহ, রমনার হরিণ বাগান। নূতন পথ কেটে চলল নদী। ভেঙে পড়ল জগৎশেঠের টাঁকশাল, মহিমাপুরের বিরাট প্রাসাদ, রায়দুর্লভের মন্ত্রণাগৃহ, রাজা রাজবল্লভের বসত বাড়ী, মহারাজা মোহনলাল কাশ্মিরীর প্রমোদকুঞ্জ। ফরাসী কুঠীর ওপর দিয়ে হল নূতন নদীর গতিপথ। ফরাসী কবরখানায় শায়িত মৃতেরা ভাগীরথীর স্পর্শে মুক্তি পেল। নূতন যুগে নদী যুগধর্ম মেনে চলল। কাশিমবাজার নদী আর কাশিমবাজার দিয়ে প্রবাহিত হল না। অশ্বক্ষুরের আকৃতির মধ্যে আবদ্ধ জল এক বিরাট জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়ে দহের রূপ নিল। তারপর 'কাটিগঙ্গা' নামে আখ্যায়িত হল। একশত বছর ঘুরতে না ঘুরতে সকলে ভুলে গেল এখানেই ছিল গঙ্গার উত্তরবাহিনী আর এক প্রবাহ। এখানেই হয়েছিল কাশীধাম সৃষ্টির এক ব্যর্থ প্রয়াস। বাঁকের মুখে বা অশ্বক্ষুরাকৃতি নদীর বর্হিগমন মুখে পূর্তবিভাগ 'স্লুয়িসগেট' বসিয়ে প্রতি বর্ষায় কাটিগঙ্গাকে সঞ্জীবিত করতেন। বৃদ্ধাকে নবযৌবন দেবার চেষ্টায় কিছুদিনের মধ্যেই ক্লান্তি এসে গেল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গতিপরিবর্তন সম্পুর্ণ হল। কাশিমবাজার নদী ভাগীরথী নামে পদ্মা থেকে জলঙ্গী পর্য্যন্ত প্রায় সোজাসুজি প্রবাহিত হল। সরে গেল নদী পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, সরে গেল মহারাজা লোক-নাথের শক্তিপুরের গঙ্গাদর্শনের নিকুঞ্জ থেকে, সরে গেল অগ্রদ্বীপের পূর্বদিক থেকে। দ্বীপত্ব হারিয়ে অগ্রদ্বীপ যুক্ত হয়ে গেল ভূখণ্ডের সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই তার অগ্রত্বও বিলীন হয়ে গেল। নদীর খামখেয়ালীপনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বহু ভৌগলিক নিদর্শন অন্তর্হিত হল।

বন্দর কাশিমবাজারকে পুনর্জীবিত করবার শেষ চেষ্টা করলেন কান্তবাবু প্রপৌত্র রাজা কৃষ্ণনাথ রায়। কাশিমবাজার ও লণ্ডনের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ চালাবার পরিকল্পনা ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন প্রচারিত হল।[১৬] বন্দোবস্তও হল সুন্দর। কারিগররা গড়ে তুলল জাহাজ তৈরীর এক আশ্চর্য্য বিরাট কারখানা। সৈদাবাদে গুরগিণ খাঁর যে বাগান তার ভাই খোজা পিক্রস্ খুলল

করে নিয়েছিলেন তারপর দেনার দায়ে যে বাগান কলকাতার শেরিফ নীলামে বিক্রি করেন সেখানেই, সেই অভিশপ্ত বাগানে জাহাজ তৈরী শুরু হল বটে কিন্তু শেষ হল না। পরিকল্পনা ছিল অদৃষ্টদগ্ধ। কৃষ্ণনাথ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর কলকাতায় আত্মঘাতী হলেন।[১৭]

বন্দর কাশিমবাজার লুপ্ত হল। ধ্বংস হয়ে গেল 'অগণ্য অট্টালিকা পরিপূর্ণ কাশিমবাজার'। যে সহর বিদেশী পর্যটকদের অবাক করে দিত যেখানে 'ইহার পরস্পর সংলগ্ন গগনস্পর্শী অট্টালিকারাজির জন্য রাজপথে সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারিত না, দুই তিন ক্রোশব্যাপিনী সৌধমালার অগ্রভাগ দিয়া লোকে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিত, তাহা এক্ষণে আরবের উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়'।[১৮] শুধু তাই নয়, 'এক্ষণে ইহার অধিকাংশ বাস্তবাটি জনশূন্য হইয়া ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই সব উৎসাদিত গৃহের ইষ্টকাদি মশলা লইয়া অনেকে অপরাপর স্থানে গৃহনির্মাণ করিতেছে।'[১৯] একদা কাশিমবাজারের উপনগরী সৈদাবাদ, ফরাসডাঙ্গা, কালিকাপুর, বামুনগাছা, ভাটপাড়া ও চূণাখালি ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন গ্রাম বা এলাকায় পরিণত হয়েছে। হাটশ্রীপুরের স্থান আজ কেউ নির্দেশ করতে পারে না। বিরাট এক রহস্যের মতো কাশিমবাজার থেকে মুর্শিদাবাদ যাবার মস্ত চওড়া পাথরে রাস্তাটা এখনও বেঁচে আছে কিন্তু মহাজনটুলি ও গুজরাটিটুলির সেই সদা চঞ্চল বাণিজ্য কেন্দ্রের কোন চিহ্ন নাই। সোরাখানা বাগান নামটি এখনও শোনা যায় কিন্তু সেখানে এক চূর্ণ সোরা কণিকার দর্শন মিলবে না। ইংরেজ কোম্পানী তাদের কাশিমবাজারের সমুদয় সম্পত্তি বাড়ীঘর, জমি, দুর্গ, প্রাসাদ প্রকরণ পরিখা সমস্ত ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিক্রি করে দিলেন।[২০] কিন্তু কোথায় সে দুর্গ বা কুঠী, কোথায় রেশমের কারখানার বিরাট ফ্যাক্টরি, কোথায় রেশম ভেজাবার ভাটি? মহাপরাক্রান্ত ইংরেজ কোম্পানীর সব চিহ্ন লুপ্ত। মহাফেজখানার নক্সায় এবং দলিল দস্তাবেজ থেকেই একমাত্র জানা যাবে কাশিমবাজারে ইংরেজদের ইতিহাস। ততোধিক অবস্থা ওলন্দাজ কোম্পানীর। কালের করাল ছায়া তাদের পদচিহ্নও মুছে দিয়েছে। বর্গীর হাঙ্গামার সময় যে মধুগড় পুষ্করিণীতে ব্যবসায়ীরা তাঁদের ধন-সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন, আজ তা প্রায় জলহীন এক পঙ্কপল্বল আর কাশিম-বাজার এক প্রয়োজনহীন সৌন্দর্যহীন বিস্মৃত গণ্ডগ্রাম। মানুষের অহঙ্কার কালের গতির কাছে যে কতো তুচ্ছ কাশিমবাজার তার এক অভিশপ্ত উদাহরণ।

দশ

ট্রেনটা এসে কাশিমবাজার রেলস্টেশনে থামল। প্রত্নত্বাত্তিক তারাপদ সাঁতরা নামলেন। স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই কাঁধ থেকে ঝোলা ঝুলছে, হাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩৭৪ সালের সংস্করণ। বর্ষণক্লান্ত মেঘলা দিন বাতাসে কোমলতা বুলিয়েছে। কাশিমবাজার দেখতে এসেছেন প্রত্নত্বাত্তিক। হাঁটতে হাঁটতে প্রথমেই পৌঁছলেন বন্দর অঞ্চলে। একটা উঁচু মাটির ঢিপি দেখে তার ওপরে উঠে দাঁড়ালেন। এখানেই ছিল জাহাজে নামা ওঠা করবার উঁচু মঞ্চ। তৈরী হবার সময় ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ। বন্যার ভয়ে নদীর জলের সাধারণ সীমা থেকে ষাট ফুট উঁচু করে এই স্থানটি তৈরী হয়। দুই পাশে চারশ ফুট লম্বা ভাল ইঁটের পাকা দেয়াল তুলে বাঁধান হয়েছিল নদীর পাড়, যাতে মঞ্চটি খুব মজবুত হয়। দুই পাশের চওড়া সুন্দর সোপানশ্রেণী বহু লোকের প্রশংসার বাণী শুনেছে। সমস্ত কাজ সমাধা করতে তখন খরচ হয়েছিল তিন হাজার টাকা। এই ব্যয়ের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানী দেন মাত্র দুইশো পঞ্চাশ টাকা। বাকি খরচ কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীকুল বহন করেন।[১] এই মঞ্চ ছিল বহু ঘটনার সাক্ষী। উইলিয়াম আঙ্গে কুঠীর অধ্যক্ষ হয়ে প্রথম এই মঞ্চে উত্তরণ করেন। তারপর থেকে কুঠীর নূতন প্রধান এই মঞ্চে পদার্পণ করলেই ভেরী নিনাদে তার আগমন বিঘোষিত হত। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে আর এক অধ্যক্ষ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে এইখান দিয়েই ফিরে যান। মাত্র তিন বছর পরে আর এক কুঠীপ্রধান রাতের অন্ধকারে তস্করের মতো পলায়ন করেন দিনেমার সহর শ্রীরামপুরে, সেখান থেকে পলাতক হন। তাঁর বিরুদ্ধে তখন সমন জারী হচ্ছিল। ধরা পড়ে গিয়েছিল তার যাবতীয় অপকীর্তি। এই মঞ্চ গল্প বলতে শুরু করলে শেষ হবে না। এখানেই দাঁড়িয়েছিলেন কলকাতার যুদ্ধের পরাজিত নায়ক হলওয়েল। ফিরে যাবার পথে লিখেছিলেন সতীদাহের কাহিনী। সেই ঘাট আজও সতীদাহ ঘাট নামেই খ্যাত হয়ে আছে। বিজয়ী ক্লাইভের গর্বিত পদক্ষেপ এই মঞ্চে ধ্বনিত হয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর দীর্ঘ বসবাসে সম্ভবত এই মঞ্চটিকে সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন। আরঙ্গে আরঙ্গে ঘুরে কোম্পানীর রেশমের ব্যবসা তাঁকে কম দিন চালাতে হয় নাই। সেই বলদর্পী কুচক্রী ওয়াটস যিনি বিপদের দিন নবাব সিরাজদৌল্লার হাতীর

পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে রোদন করেছিলেন তারপর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতার যুদ্ধে জয়ী হবার পর, সিরাজদৌল্লা দরবারে দাঁড়িয়ে অভদ্র ও কুৎসিৎ চিৎকারে তরুণ নবাবের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছেন, তাঁকেও এই মঞ্চ দিয়ে বহুবার ওঠা নামা করতে হয়েছিল।

তারপরও কতো লোক এসেছে গিয়েছে। নবাব দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি ক্রাফটন, চতুর ফ্রান্সিস সাইকস, হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাটসন। পরবর্তী যুগের আর এক গবর্নর জেনারেল স্যার জন শোরও কোম্পানীর চাকুরীতে দীর্ঘ দিন কাশিমবাজারের বাসিন্দা। রিচার্ড বারওয়েলও তাই। তাঁকে কাউন্সিলর হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তার থেকে উঁচু পদ তাঁর ভাগ্যে আর জোটে নাই। আজ এই মঞ্চ স্মৃতিপটে লুপ্ত। মাটির ঢিপি নানা আষাঢ়ে কাহিনী সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

আশ্চর্য্য লুণ্ঠনপ্রিয়তা। বন্দর বা বাঁধা ঘাটের এক টুকরো ইঁটও নাই। বন্দরের গৃহগুলি সেদিনও দেখা যেত। আজ তাদের চিহ্নমাত্র নাই। ইংরেজ কোম্পানীর সব স্মৃতি লুপ্ত। এমনকি সেই সুবিখ্যাত নেমিনাথের মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত। সেবাইতগণ বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করামাত্র লুণ্ঠনকারীদের হাতে মন্দির নিগৃহীত। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রায় সব মন্দিরগুলিরই চরম দুরবস্থা। একমাত্র লালগোলারাজের দয়ায় ব্যাসপুর রক্ষা পেয়েছে। অশ্লীল ও অসংযত লোভের হাত থেকে ইওরোপীয়গণের সমাধি ক্ষেত্রগুলিও রক্ষা পায় নাই। সমাধি প্রস্তর খুলে নিয়ে বহুলোকে ব্যক্তিগত কাজে লাগিয়েছে। সরকারী অবহেলায় লুণ্ঠন সহজ হয়েছে। গাছের ডাল পড়ে, গাছ গজানোতে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু সমাধি ভগ্ন। দিনে এগুলি গবাদি পশুর চারণস্থল, রাত্রে দুষ্কৃতকারীদের আস্তানা ও সন্ধ্যায় অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের অতি উৎকৃষ্ট রঙ্গমঞ্চ। ইংরেজদের সমাধিস্থলে বর্তমানে সতেরটি সমাধি বর্তমান যদিও মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে মোট আঠারটি সমাধির কথা লেখা আছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথম স্ত্রী ও কন্যার সুন্দর সমাধিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কেবল ফলকটি বর্তমান। বাকি ষোলটির মধ্যে পাঁচটি সমাধি পনের থেকে কুড়ি ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। দুটিতে সমাধি ফলকের চিহ্ন নাই অন্য তিনটির তলায় শায়িত আছেন চার্লস ক্রমলাইন, জন পীক ও লাইয়ন প্রেগার। সর্বসমেত মাত্র আটটি সমাধির ফলক এখনও আছে। কালানুক্রমিক ভাবে ইংরেজী ভাষায় লিখিত হল।

1. Mrs Mary Hastings and her daughter Elizabeth—
11 July 1759
2. Male infant of Captain John and Rose Grant, born and buried on— 19 November 1775
3. Mrs Eliza Hartle 9 October 1782
4. Eliza, wife of Major Edward Clark and Edward Ives (erected by their beloved children)—
8 April 1760 and 19 August 1783
5. Thomas Dugald Campbell, Esqr, who departed the life in Rangamati, aged 32 years,— 6 October 1784
6. Charles Cromeline, Esqr, aged 81 years—
23 December 1788
7. John Peack, Esquire, Late Senior merchant, aged 31 years (erected by his truely afflicted widow)—
24 August 1790
8. Mr. Lyon Prager, Diamond Merchant and Inspector of Indigo and drugs, aged 47 years. 12 May 1793

কতকগুলি কারুকার্যখোচিত সমাধি আছে। মাঝখানের বড় স্তম্ভটির কারুকার্য অপূর্ব। অনেকে এটি জোসেফ বার্দ্যু (Joseph Bardieu) র সমাধি বলে সন্দেহ করেন। ডেভিড অ্যান্সট্রাথার (David Anstrathar) ও ও সারা ম্যাটক (Sarah Mattock) এর সমাধিদ্বয়ের কথা নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। রায় মহাশয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যখন পরিদর্শন করেন তখন সম্ভবত ফলক দু'টি ছিল। ডেভিড অ্যান্সট্রাথার একদা কশিমবাজার তথা কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে সুপরিচিত সুবিখ্যাত ফেলিসিটি হলের (Felicity Hall) স্রষ্টা কর্তা। এই বাড়ীতে কোম্পানীর কর্মচারীদের জমায়েত হবার আসর ছিল এবং নাচ গান, পান ভোজন ও হৈ হল্লার এক চমৎকার আয়োজন হত। বস্তুত সহর কলকাতা ছাড়া এমন সময়ক্ষেপের বন্দোবস্ত আর কোথাও ছিল না। কোম্পানীর কোন কোন কর্মচারী এই গৃহটিকে মরুভূমির মধ্যে একমাত্র ওয়েসিস বলে বর্ণনা

করেছেন। অতি যত্নে কোম্পানীর কোন কর্মচারী শিল্পী এঁকেছিলেন এই বাড়ীটির ছবি তারই প্রতিচ্ছবি এখনও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে দেখা যায়। এই বৃহৎ সুন্দর বাড়ীটি নিঃসন্দেহে এক সময় কাশিমবাজারের মধ্যমণি ছিল। ছবিতেও বাড়ীটির সৌন্দর্য্য, বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। নিখিলনাথ রায় সারা ম্যাটক সম্পর্কেও লিখেছেন, বিশেষ তিনি সুবিখ্যাত রাজনৈতিক হ্যামডেনের (Hampden) নাতনী কি না আলোচনা করা হয়েছে। অ্যান্সট্রাথার ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ও ম্যাটক ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাধিস্থ হন। এছাড়া নিখিলনাথের বইএ মালদহ কুঠীর অধ্যক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী গ্রে ও মেরী চার্লস এডামস ও পুত্র কন্যাগণের সমাধির কথা বর্ণিত হয়েছে। সমাধি প্রস্তরের তারিখ যথাক্রমে ১৭৩৭ ও ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে।

ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্রে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন গ্যাসট্রেল সতেরটি সমাধি দেখেছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নিখিলনাথ রায় বাইশটি সমাধি বেদীর কথা লিখেছেন। বর্তমানেও ২২টি সমাধি আছে। ক্যাপ্টেন গ্যাসট্রেল সম্ভবত জঙ্গল ও তাদের বড় ঘাসের ভিড়ে পাঁচটি সমাধি দেখতে পান নাই। কারণ কোন সমাধি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালের নয়। বর্তমানে মাত্র পাঁচটি সমাধি ফলক আছে।

1. Daniel van der Muyl, 16 May 1721
2. Matthias Arnoldus Brahe 20 August 1772 and Johanna Petronela van Sorgen, Abraham Matinus Brahe boin on...1741, death on 17th BRE. A. 1772
3. Tamerus Canter Visscher, died in Calicapor, 31 January 1778 (highest tomb)
4. Gregonius Herklots van Middelburg, Secunde der Bengalsche Directic, 14 Feb, 1787
5. Johan Gantvoort van Aaften, 20 October 1792

আর্মেনীয় সমাধিক্ষেত্রে মাত্র একটি সমাধির ফলক পড়া যায়। দীর্ঘদিন অনাদরে ও অবহেলায় পড়ে থাকার পর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার আর্মানী সমাজ এটি সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেছেন। বিরাট সুন্দর গীর্জাটিকেও সংস্কার করা হয়েছে। যার ফলক পড়া যায় তিনি হলেন কলকাতার আর্মেনিয়ান

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা : Manatsakan Sambat Vardom. মৃত্যুর তারিখ ১৩ অক্টোবর ১৮২৭ ॥

সব দেখা হলে প্রত্নতাত্তিক হেঁটে চললেন রাজবাড়ীর দিকে। কান্তবাবুর আদি বাসস্থান ঘিরে বিরাট চৌহদ্দি গড়ে উঠেছে। গোলাবাড়ী, খাসবাড়ী, রাসবাড়ী, চূণগুদাম, গোলাপবাগান, খেলার বাগান, সব্জীবাগান, ছুতারখানা, শেলেখানা, কামারখানা, পীলখানা, তোষাখানা, ফরাসখানা, ভাণ্ডারখানা, আস্তাবল, গো-শালা, গাড়ীখানা, অতিথি নিবাস, চিড়িয়াখানা, কেরাণীখানা প্রভৃতি বিগত দুইশত বছরের স্মৃতিকে আলোড়িত করে। বর্তমানকাল কলকাতায় টেনে নিয়ে গেছে বাড়ীর বাসিন্দাদের। ঢুকতেই সামনে দেখা যায় চৈৎসিংহের দালান। অষ্টাদশ শতাব্দীর বালিপাথরে অপূর্ব কারুকার্য। খিলান ও স্তম্ভে এলাহাবাদী শিল্পকর্মের নিদর্শন। ফুল ও লতাপাতার জীবন্ত পাথুরে পরিচয় হিন্দু মুসলমান শিল্পধারার সমন্বয়ের জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বিরাট প্রশস্ত দালান থামে থামে সুপরিকল্পিত। কান্তবাবু চৈৎসিংহের কাশীর প্রাসাদ থেকে এটি সংগ্রহ করেন। ডানিয়েল সাহেবের চিত্রে এটিকে কাশীর প্রাসাদে দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী যেতে সময় লাগল দুইচার মিনিট। মহারাণী স্বর্ণময়ীর তৈরী চণ্ডীমণ্ডপ ও বিরাট নাটমন্দির। এইখানেই বাৎসরিক দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় তখন সমস্ত স্থানটি এক সুষমায় পূর্ণ হয়ে যায়। হোমের ধূমে আর চণ্ডীপাঠের মন্ত্রে, দুর্গানাম জপকের শুচিতায় আর সহস্রধারা স্নানের সমারোহে অভাবনীয় আবহাওয়া বিরাজ করে। মহাষ্টমী ও নবমীর বাতাসের পরিবর্তন একশত অষ্টোত্তর প্রজ্বলিত দীপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দোতলার ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সময় হল। শ্রীখোলের সঙ্গে বেজে উঠল কাঁসর ঘণ্টা। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ঠাকুর এ বাড়ীতে প্রায় দুইশত বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বংশের সকলেই ঠাকুরের সেবায় নিজেদের নিযুক্ত রেখেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমন এক রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক ঘটনা।

সময় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ। চৈৎসিংহ তখন কাশীরাজ। ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে রাজস্ব দেওয়া নিয়ে তাঁর গোলমাল চরম অবস্থা ধারণ করেছে। অবশেষে মিটমাটের সূত্র বার করবার জন্য গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস

তাঁর দেওয়ান কান্তবাবুকে কাশীতে প্রেরণ করলেন। কাশীরাজ্য বা বারাণসী তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দখলে এক প্রত্যন্ত প্রদেশ। কান্তবাবু নিয়মিত চৈৎসিংহের উকিল মির্জা আবদুল্লা বেগের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৪ অগাষ্ট ১৭৮১ হেস্টিংস স্বয়ং বারাণসী পৌছলেন। সকলে বুঝতে পারলেন যে এবার একটা হেস্তনেস্ত কিছু হবে। হেস্টিংস চুণার দুর্গে অবস্থান করতে লাগলেন। আলোচনা চলতে লাগল। হেস্টিংস সন্দেহ করলেন যে রাজা কেবলমাত্র সময়ক্ষেপ করার জন্যই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আসলে তিনি এই সময়ের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করছেন যাতে কোম্পানীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামতে তাঁর অসুবিধা না হয়। কান্তবাবুর কাছে অবশ্য রাজার এই মতলব প্রতিভাত হয় নাই। তিনি মনে ভাবছিলেন যে আর কিছুদিন আলোচনা চললে, রাজা কতকগুলি সর্তসাপেক্ষে বাকি রাজস্ব দিয়ে দেবেন।

হেস্টিংস রাজাকে সময় দিতে রাজী হলেন না। উইলিয়াম মার্কহামকে আদেশ করলেন অচিরাৎ রাজাকে বন্দী করা হোক। ১৫ অগাষ্ট এই হুকুম জারী হল। নিজ প্রাসাদে চৈৎ সিংহ বন্দী হলেন। মেজর পপহাম একদল সৈন্যকে রাজার প্রাসাদে স্থাপন করলেন। চৈৎসিংহ হেস্টিংসকে চিঠি লিখে জানালেন বিদ্রোহের কোন ইচ্ছা তার নাই। কান্তবাবুকে চিঠি লিখলেন যে তিনি এসে যেন আলোচনা চালিয়ে যান। তদনুযায়ী কান্তবাবু শিবালয় ঘাটের প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। পরদিন হেস্টিংস স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন যে নদীর অপর পার থেকে দলে দলে লোক এসে রাজাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। বহু ইংরেজ সৈন্যকে তারা হত্যা করেছে। হত হয়েছেন সৈন্যবাহিনীর তিন নায়ক লেফটানেণ্ট স্টকার, লেফটানেণ্ট স্কট ও লেফটানেণ্ট সাইমস্। পরিবারের সমস্ত মহিলাদের নিয়ে রাজা পলাতক হয়েছেন আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেছেন কান্তবাবুকে। সেই সঙ্গে অপহরণ করেছেন মার্কহামের এক প্রিয় মৌলভীকে আর জহরৎ ব্যবসায়ী বার্নেট সাহেবকে। ১৬ অগাষ্টের এই হত্যাকাণ্ডে ইংরেজ পক্ষে একশতর বেশী লোক হত হয়।

যুদ্ধ বাধল। ইংরেজ সৈন্য একই সঙ্গে রামনগর ও লতিফপুরে রাজার ঘাটি আক্রমণ করল। রামনগরে ইংরেজ পরাজিত হল। লতিফপুরে চৈৎসিংহ মৌলভীকে বধ করলেন। বার্নেটকে বাঁদর নাচ নাচতে বাধ্য করলেন।

তারপর ২৫ অগাষ্ট কান্তবাবু ও বার্নেটকে নিয়ে দূর্ভেদ্য বিজয়গড় দুর্গে পৌছে গেলেন। পলায়নের সময় বৈষ্ণব কান্তবাবুকে চৈতসিংহ তাঁর মাতা পান্নার কাছে রেখেছিলেন। কারণ পান্না ছিলেন বৈষ্ণব। মেজর পপহামের নেতৃত্বে ইংরেজবাহিনী রামনগর ও লতিফপুরে রাজার বাহিনীকে পরাজিত করল। রাজার পতিহতা দুর্গের পতন হলে, চৈৎসিংহ কান্তবাবু আর বার্নেট সাহেবকে মুক্তি দিলেন। তাঁরা ২২ সেপ্টেম্বর লতিফপুরে পৌছলেন। কান্তবাবু ২৪ সেপ্টেম্বর চুনার দুর্গে হেস্টিংসের সঙ্গে দেখা করলেন। ইংরেজবাহিনী বিজয়গড় অবরোধ করতে যাত্রা করলেন। হেস্টিংস বারাণসীর সর্বময় অধিকর্তা হলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর চৈৎসিংহকে পদচ্যুত করে তাঁর ভাগিনেয় মহীপনারায়ণকে বারাণসীর রাজা ঘোষণা করা হল। পপহাম জানালেন যে চৈৎসিংহ তার ভাই সুজনসিংহ সমভিব্যহারে বিজয়গড় ত্যাগ করেছেন ২৯ সেপ্টেম্বর। তাঁর গন্তব্য প্রথমে অগোরী দুর্গ ও সেখান থেকে কোম্পানীর এলাকার বাইরে বুন্দেলখণ্ড। সঙ্গে তার আছে দুই হাজার অশ্বারোহী ও চারহাজার পদাতিক সৈন্য। ২৫ অক্টোবর পপহাম বিজয়গড় অবরোধ শুরু করে জানালেন এই দুর্গ কেবল স্ত্রীলোক ও শিশুপূর্ণ, যুদ্ধ করবার কোন লোক এখানে নাই। তা স্বত্বেও পাহাড়ের ৮৬ ফুট উঁচুতে বিজয়গড় দুর্গ অত্যন্ত দুর্গম। ওপর থেকে বাধা দেওয়া অত্যন্ত সহজ। অতি অল্প লোকে দীর্ঘদিন এই দুর্গ রক্ষা করা যায়। পপহাম তার কামানগুলি থেকে দু'চারটে গোলা ছুড়ে দেখলেন দুর্গপ্রাকার অত্যন্ত মজবুত। গোলা বর্ষনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার কোন সম্ভাবনা নাই। পপহাম আরো সংবাদ দিলেন যে রাজার ধনরত্ন যা তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নি, সবই এই দুর্গে রক্ষিত আছে। পপহাম চৈৎসিংহের মাতা রাণী পান্নার কাছে এই দুর্গ সমর্পণ করার প্রস্তাব পাঠালেন। উত্তরে রাণী হেস্টিংসকে লিখে পাঠালেন যে একমাত্র তাঁর দেওয়ান কান্তবাবু উপস্থিত থাকলে তবেই তাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন নচেৎ নয়।

হেস্টিংসের আদেশে বৃদ্ধ কান্তবাবু বিজয়গড়ে উপনীত হলেন। ২২ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বরের মধ্যে হেস্টিংস ও পপহামের মধ্যে যে পত্রালাপ হয়েছে সেগুলি নিবিষ্ট চিত্তে পড়লে পরবর্তী ঘটনার জন্য উভয় ব্যক্তিকেই দায়ী করতে হয়। ২২ অক্টোবরে হেস্টিংস লিখিত পত্র বহু জায়গায় বহুবার পঠিত হয়েছে। এমনকি হেস্টিংসের বিচার বা সুবিখ্যাত 'ইমপীচমেণ্টে'র

সময়ও আলোচিত হয়। এই পত্রে হেস্টিংস যা লিখেছিলেন পপহামের কাছে তার মানে হয়েছিল যে এই দুর্গ জয় করতে পারলে দুর্গ লুঠের সম্পদ সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে বিতরিত হবে। হেস্টিংস অবশ্য অস্বীকার করেছেন যে তাঁর পত্রের ওই মানে নিতান্তই কষ্টকল্পিত। তখন গুজব চলছিল যে দুর্গের মধ্যের কেবল সোনার টাকার মূল্যই দুই কোটি। তার ওপর আছে মণিমাণিক্য ও রাণীদের ব্যক্তিগত সম্পদ। কাজেই পপহাম সাহেব যে দুর্গ প্রাকারের তলায় 'মাইন' ফাটাবার বন্দোবস্ত করলেন তার পিছনে বিরাট লুব্ধতার জোরাল যুক্তি ছিল। তিনি তাই কান্তবাবুর বিজয়গড়ে উপস্থিতি পছন্দ করেন নাই, পছন্দ করেন নাই ব্যক্তিগত সম্পদ নিয়ে মহিলাদের দুর্গ ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তাব। পছন্দ হয় নাই রাণীর সঙ্গে কান্তবাবুর আলোচনা। স্ত্রীলোক ও শিশুপূর্ণ এই দুর্গে রাণীর সঙ্গে কান্তবাবুর আলোচনা চলাকালীন বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রাকার ধ্বংস করে পপহাম তার সৈনিক জীবনের কাপুরুষোত্তম ও কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করলেন।[২]

পরবর্তীকালে কান্তবাবু হেস্টিংসকে বিজয়গড়ের ঘটনার এক দীর্ঘ বিবরণ দাখিল করেন। এই বিবরণ থেকেই বিজয়গড়ের জঘণ্য অপকর্ম আমাদের গোচরে এসেছে। হেস্টিংসের সৌভাগ্য যে 'ইমপীচমেণ্টে'র সময় বার্ক সাহেব এই বিবরণের খবর জানতে পারেন নাই। পারলে, চৈৎসিংহের ঘটনায় হেস্টিংস কখনই নির্দোষ প্রতিপন্ন হতে পারতেন না। এই চোদ্দ পাতার বিবরণ লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত আছে।[৩] এই ঘটনার সেই দলিলখানিই মূল সূত্র।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর রাণী পান্নার চিঠি পেলেন কৃষ্ণকান্ত নন্দী তাতে লেখা ছিল যে আপনি উপস্থিত থাকলে তবেই আমরা ভরসা পাব যে আমাদের সম্মান ও নিরাপত্তা আত্মসমর্পণের পর রক্ষিত হবে। সেই পত্র কান্তবাবু হেস্টিংসকে দেখালেন। তদনুযায়ী হেস্টিংস মেজর পপহামকে পত্র দিয়ে আদেশ জানালেন এবং কান্তবাবুকে বিজয়গড়ে প্রেরণ করলেন। হেস্টিংস জানিয়ে দিলেন যে রাণীদের ব্যক্তিগত সম্পদ নিয়ে যেতে যেন বাধা না দেওয়া হয়। কান্তবাবু ৯ নভেম্বর রাত্রি দশটায় বিজয়গড়ে পৌঁছে হেস্টিংসের পত্র পপহামকে দিলেন। পরের দিন রাণীর প্রতিনিধিরা নেমে এলেন এবং সন্ধিপত্র আলোচনায় বসলেন। পপহাম ১১ নভেম্বের পর্যন্ত রাণীকে দুর্গ

খালি করে দেবার সময় দিলেন এবং লোকজন, পাল্কী, হাতী ও উট রাণীদের এবং তাদের লোকজন এবং জিনিষপত্র বহন করবার জন্য সংগ্রহ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আরো জানান হল যে রাণীদের পাল্কী তল্লাসী হবে না কিন্তু রাণীর লোকজনের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ দেখলে তল্লাসী করা হবে। আলোচনার পর কান্তবাবু পাহাড়ের ওপরে উঠে দুর্গে গেলেন এবং রাণী পান্নাকে এই সব সর্তগুলি বুঝিয়ে দিয়ে এলেন। কান্তবাবুর বিবরণী থেকে দেখা যায় যে পপহাম একটি সর্তও পালন করেন নি। তার মনপ্রাণ পড়ে ছিল কি করে কান্তবাবুকে না জানিয়ে দুর্গ প্রাকারে মাইন ফাটিয়ে নিজের বীরত্ব জাহির করবেন সেই ভাবনায়। রাণী কিন্তু সর্ত অনুযায়ী কাজ করেছেন। ১০ নভেম্বর রাত্রে তিনি দুর্গ শীর্ষে কোম্পানীর পতাকা ওড়াতে দিলেন। আনন্দে পপহাম হেস্টিংসকে লিখলেন: 'আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়গড় দুর্গ আমাদের দখলে এসেছে।'

অবশেষে ১১ নভেম্বরের প্রভাত এল। সেদিন ছিল রবিবার। অনেক রাত্রে কান্তবাবু দুর্গথেকে নেমে তাঁর তাঁবুতে নিদ্রিত। ভোর হতে না হতেই পপহামের লোকজন পশ্চিম প্রাকারে 'মাইন' ফাটিয়ে দলে দলে দুর্গের মধ্যে ঢুকে লুঠতরাজ বলাৎকার শুরু করে দিল। ওদিকে সামনের দরজায় রাণীদের নিয়ে যাবার জন্যে পাল্কী অপেক্ষা করছে। এই বিশ্বাস-ঘাতকতার বোধহয় কোন তুলনা নেই। সকালে উঠে দুর্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হতে কান্তবাবু জানতে পারলেন দুর্গে কিছু গোলমাল হয়েছে। দুপুর একটার সময় পপহাম তাকে দুর্গে যাবার অনুমতি দিলেন কিন্তু প্রথম দ্বারের কাছে যে গোরা সৈন্য মোতায়েন ছিল সে জানাল যে ছাড়পত্র ছাড়া দুর্গ ঢুকবার অনুমতি বাতিল হয়ে গেছে। আবার পপহামের কাছে আসতে হল। পপহাম ছাড়পত্র দিলেন না কেবল তার একজন পিয়নকে সঙ্গে দিলেন। প্রথম দুর্গ দরজা পার হবার কিছুক্ষণের মধ্যে যে দৃশ্য কান্তবাবু দেখলেন তাতে তিনি শিহরিত হলেন। যথেচ্ছ লুঠতরাজ বলাৎকার চলেছে। স্ত্রীলোকের চিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। পুরুষদের জামাকাপড় পাগড়ি খুলে নিয়ে কাউকে হত্যা করা হচ্ছে কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দাসী থেকে রাণী পর্যান্ত কেউ এই নরপশুদের অশূচি আকাঙ্ক্ষা থেকে নিস্তার পাচ্ছে না, বালিকা থেকে বৃদ্ধা ধর্ষিতা হচ্ছে। নরকেও সম্ভবত এই দৃশ্য দেখতে

হয় না। বাধা দিতে গেলেন কান্তবাবু। গোরা সৈন্য বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মুখ ভেঙে দিতে এল। পিওন তাকে সরিয়ে নিয়ে রাণী পান্নাকে রক্ষার কথা স্মরণ করাল। উভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে সেই বিভৎস পরিবেশের মধ্যে দিয়ে রাণী পান্নার চত্তরে প্রবেশ করলেন। পথে যেতে দেখতে হল স্বর্গীয় রাজা বলবন্ত সিংহের তৃতীয় স্ত্রী বিষণ কাউর যাঁর রূপের খ্যাতি সমস্ত উত্তর-ভারতে জ্ঞাত ছিল, যাঁর জন্যে রাণী পান্না বিশেষ করে বারবার তাঁদের 'সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষা'র কথা প্রত্যেক চিঠিতে ও সন্ধিপত্রে উল্লেখ করেছেন, একাধিক গোরাসৈন্য কর্তৃক ধর্ষিতা হচ্ছেন।

রাণী পান্না এই শৈব রাজকুলে একমাত্র বৈষ্ণব। ছত্তরপুর থেকে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের শীলা মূর্তি স্থানান্তরিত করে তিনি বিজয়গড়ে স্থাপনা করেছিলেন। কান্তবাবুকে তিনি এই শীলামূর্তি তুলে নিতে আদেশ করলেন। গোরা সৈন্যরা তখন মন্দিরে মন্দিরে ঢুকে দেববিগ্রহ ধ্বংস করে ক্ষমতার মদমত্ততা প্রমাণ করছে। মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করলেন কান্তবাবু তারপর বুকে তুলে নিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ শীলা এবং তার চতুপার্শ্বস্থ হিন্দু ধর্মের প্রতীক চিহ্নগুলি।

পপহামও ভাবতে পারেন নাই ঘটনা এতদূর যাবে তাই কান্তবাবু এবার রাণীদের জন্য যা যা চাইলেন সব কিছু দিতে রাজী হলেন। কান্তবাবু আরো চাইলেন সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন স্কটকে ও একদল সৈন্যবাহিনী। তাঁকে তাই দেওয়া হল। কান্তবাবু রাণীদের নীচে নামিয়ে এনে তাঁবুতে স্থাপনা করলেন। তারপর যথেষ্ট পাল্কী প্রভৃতি সংগৃহীত হলে ১৪ নভেম্বর কান্তবাবু রাণীদের নিয়ে ক্যাপ্টেন স্কট ও সৈন্যদল সমভিব্যহারে বারাণসী যাত্রা করলেন। প্রায় যাত্রা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহীপনারায়ণকে পত্র দিলেন যে রাণীদের জন্য বারাণসীতে যেন একটি বাড়ী ও রান্না করবার সরঞ্জাম প্রস্তুত থাকে।[৪] ১৮ নভেম্বর এই বাড়ীতে রাণীদের পৌঁছে দিয়ে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে কান্তবাবু ও ক্যাপ্টেন স্কট সোজা হেস্টিংসের কাছে গিয়ে সেই বীভৎস ঘটনা বিবৃত করেন। যার ফলে হেস্টিংস সমস্ত লুণ্ঠিত সামগ্রী ও অর্থ একত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। শতকরা পনের ভাগ রাণীদের সম্পত্তি হিসাবে তাঁদের প্রত্যার্পণ করা হয়। যে সব সৈনিক বা সৈন্যাধ্যক্ষ অর্থ ফেরত দিতে রাজী হলেন না তাদের বিরুদ্ধে আইন সঙ্গত

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। হেস্টিংস এবং তার স্ত্রীর জন্য পপহাম যে উপহার পাঠালেন তা গভীর ঘৃণায় ফেরত দেওয়া হল। এই ভাবে বিজয়গড় ঘটনার প্রায়শ্চিত্ত করায় হেস্টিংস কেবল কলঙ্কমুক্ত হলেন না, পরবর্ত্তীকালে যখন তাঁর কীর্তিকলাপের পার্লামেণ্টে বিচার হল তখনও বেকসুর খালাস পেলেন।[৫]

কান্তবাবু এই শীলামূর্তি নিয়ে নৌকায় চাপলেন। পৌষ মাস গত হল। ঠাকুরের ভোগ খালি খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা। এই ভাবে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউ প্রতিষ্ঠিত হলেন তার গৃহে। তাঁর সেবা পূজার জন্য সম্পত্তি নির্দিষ্ট করা হল। কান্তবাবু উইলে লিখলেন তাঁর উত্তরাধিকারগণ হবেন লক্ষ্মীনারায়ণের সেবক। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কান্তবাবুর বংশ প্রভূত উন্নতি লাভ করে এবং শ্রীশ্রীদেবঠাকুরের সম্পত্তিও বহুগুণে বৃদ্ধি হয়। বন্দর কাশিমবাজারের মৃত্যু হলে কাশিমবাজারের নাম কান্তবাবুর বংশধরদের ঘিরেই জীবিত আছে। তাঁদের মধ্যেই রক্ষিত হয়েছে বাংলাদেশের দুইশত বছরের জীবন্ত ইতিহাস। সাক্ষী ওই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শীলামূর্তি। প্রত্নতাত্ত্বিক চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে বাঙালী মন্দির শিল্পীর দক্ষতার শেষ স্ফুরণ হয়। সে স্ফুরণের নিদর্শন এই মন্দির। পঙ্খের বিস্ময়-কর কারুকার্য। একখণ্ড মখমলের ওপর একটি শঙ্খ, মনে হয় সত্য, আসলে পঙ্খের শিল্পকলায় উৎকীর্ণ। মসৃণ থামেও পঙ্খের কাজ। বিদেশী প্রভাবে ক্ষয়িত হবার আগে বাঙালী শিল্পী যেন তাঁদের কীর্তির শেষ উদাহরণ এই মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে ছড়িয়ে রেখে গেছেন। ধীরে ধীরে নতজানু হয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রণাম করলেন।

১৫ই শ্রাবণ ১৩৮৪ ॥

৩১শে জুলাই ১৯৭৭ ॥

সূত্র নির্দেশ

এক

বন্দর কাশিমবাজার নামে বর্তমান প্রবন্ধটি লেখকের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩৭৪ সালের সংখ্যায় (পাতা ৮৯-১৩৮) প্রকাশিত ওই নামীয় প্রবন্ধের এবং Journal l' Institut de Chandernagor পত্রিকার ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভল্যুমে (পাতা ৮৫-১০১) প্রকাশিত 'Cossimbazar —The Queen that was' প্রবন্ধের পরিশীলিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা থাকলে মৎ প্রণীত 'Life and Times of Cantoo Boboo' দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত সমুদয় সূত্র ওই জীবনী লেখবার সময় সংগৃহীত।

১। এই ছবিটি বর্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ডানিয়েল কক্ষে রক্ষিত আছে।

দুই

১। Robert Orme, The History of Military Transactions of the British Nation in Indostan.

২। (ক) নিখিল নাথ রায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

(খ) Wilson's Annals, Vol I.

৩। Jadunath Sarkar, 'Old Murshidabad' Krishnath College Centenary Volume : 1853-1953, pp. 131-136 (Nov. 53)

৪। Niccolo Manucci, Storia do Mogor Vol I, II & III (first Ed. 1907. Reprint 1965)

৫। Sushil Chowdhury, The Rise and Decline of Hoogly. Bengal Past and Present Vol 86. Part I No 161.

৬। P. J. Marshall, East Indian Fortunes (p 51-105) (Oxford Univ. Press 1976)

৭। James Renell, Memoir of a Map of Hindoston. C xiii (1793)

৮। Philip Woodruff, Men Who Ruled India, V l. p. 70
(1953)

৯। Sushil Chaudhury. op. Cit.

১০। Niccolo Manucci, op. Cit. Vol II pp 88-89.

১১। Jadunath Sarkar, op. Cit.

১২। Narendra Krishna Sinha, The Economic History of Bengal Vol. I. p 52 (1956)

১৩। Alfred Martineau, Dupleix et l' Inde Francaise, Voll
(Paris 1920).

১৪। Jadunath Sarkar op. Cit.

১৫। O' Malley, Murshidabad Gazeteer.

১৬। Narendra Krishna Sinha, Op. Cit.

১৭। Ibid.

১৮। Tavernier and Bernier, Collections of Travels.
Vol II p. 57 (1684).

১৯। C.R. Wilson, Old Fort William of Bengal
Vol I p 51-52 (1906)

২০। Ibid.

২১। Revolt of Shobha Singh. Bengal Past of Present Vol. 89. No 167 pp 53-73.

২২। A. Karim, Murshid Quli Khan and his Times
(Dacca 1963)

২৩। J. H. Little, House of Jagat Seth. Ed Dr. N. K. Sinha
(1967)

২৪। C. R. Wilson—The Early Annals Bengal
(Surman Embassy) Vol II Part II

২৫। P. J. Marshall—op. Cit. pp. 5—10.

২৬। Bengal Consultations of 18 June, 1 July, 18 July,
1717.

২৭। J. H. Little—op Cit.

২৮। Ibid.

২৯। Kishori Chand Mitter—The Territorial Aristocracy of Bengal, The Cossimbazar Raj ; Calcutta Review, Article v Vol 57 p 90 (1873)

৩০। Somendra Chandra Nandy—Life & Times of Cantoo Baboo (Krisna Kanta Nandy) The Banian of Warren Hastings. Period Covered : 1742-1804 (1978).

তিন

১। Jadunath Sarkar Ed. History of Bengal. Vol II See Alivardi Khan in Index.

২। Ibid

৩। Ibid

৪। Ibid

৫। Sukumar Bhattacharya—East India Company & Economy of Bengal. 1704-1740 p 60-64.

৬। J. H. Little, op. Cit. pp 81-85.

৭। Ibid.

৮। Sukumar Bhattacharya, op. Cit. p 146-147.

৯। Public Record Office. A/T/70/1205/A 59 Customs House Accounts.

১০। Consultations of 10 March 1737

১১। Cossimbazar Factory Records of 31 January 1739.

১২। Sukumar Bhattacharya, op. Cit. p 176 (James Taylor Topography of Dacca, p 172).

১৩। Cossimbazar Factory Records—Charges General for December 1739.

১৪। Sukumar Bhattacharya, op. Cit. p. 197 & 205

১৫। Bengal Public Consultations of 9th September, 19th October, 19th November & 14th December 1730.

১৬। Ibid. of 12th January, 2nd Aug, 9th Sept, IIth August & 22 November 1731.

১৭। Ibid. of 24 May. 1731.

১৮। Cossimbazar Consultations of July 1737.

১৯। Bengal Public Consultations of 22nd July 1734, 22 December 1735, 24 January, 2nd February 16th April 1736 & 26th February 1737.

২০। Cossimbazar Consultations of 19th December 1740, 20th January, 7th Feb, 19th Feb, 3rd & 19th March 1741.

২১। নিখিল নাথ রায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, একাদশ পরিচ্ছদ।

২২। Seir-ul-Mutaqherin—Haji Mustafa tr. (Syed Golam Hussein Khan) Vol I

২৩। J. N. Sarkar Ed. History of Bengal Vol II (Dacca)

২৪। Cossimbazar Consultations of 3rd March 1741

২৫। Ibid. of 27th March 1741

চার

১। S. C. Nandy, Rani Bhawani of Nator, Bengal Past & Present, Vol xc III, Serial No 175, Jan-Apr 1974

২। ভারতচন্দ্র রায়—অন্নদামঙ্গল, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ।

৩। Kissorichand Mitter, Territorial Aristocracy of Bengal, Kassimbazar (Cossimbazar) Raj, Calcutta Review Vol 57.

৪। C. R. Wilson, Ed, Old Fort William, Vol I, p 100

৫। Ibid p 154

৬। Ibid p 156

৭। Ibid p 166

৮। Ibid p 170

৯। Ibid p 181

১০। G. S. Sardesai, A New History of the Marathas, Vol II, p 221-221

১১। J. H. Little, House of Jagat Seth

১২। J. H. Little, op. Cit, p 122

১৩। J. N. Sarkar, Ed. History of Bengal, Vol II, p 457-461

১৪। J. H. Little, op Cit, p 128-134

১৫। J. H. Little, op Cit, p 127

১৬। J. N. Sarkar, Ed, op Cit, p 459-467

১৭। K. K. Dutt, Early Career of Siraj-ud-daulah ; Bengal Past and Present Vol. 86. Part II, No. 162 July-Dec 1967

১৮। J. N. Sarkar, op Cit, p 471

১৯। IOR Bengal Journal and Ledgers, Ledger of 1742-43, Vol 33

২০। IOR, Bengal Public Consltn. of 10 February 1743, p 75-76

২১। IOR, Cossimbazar Consuitations of 15 March 1743, 4 March, 15 March & 26 March 1744

২২। Ibid. of 15 March 1745.

২৩। Ibid. of 15 August 1745

২৪। Ibid. of 31 March 1753

২৫। Keith Feiling, Warren Hastings (1950), p 17-25

পাঁচ

১। সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ, দ্বিতীয় খণ্ড (ইংরেজী অনুবাদ) ১৭ পাতা।

২। সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, সিরাজদ্দৌল্লার মহিষী, ইতিহাস। ৫ খণ্ড, ২ সংখ্যা, ১১৯-১৩০ পাতা।

৩। (ক) Calcutta Review 1892 p 204

(খ) Bengal Revenue Miscl Consultation, Range 51, Vol 20 of 21 July 1788, p. 978-980

৪। Seir-ul-Mutaqherin p 61, Part II p 614

৫। K. K. Datta, Early Career of Sirajuddowlah, Bengal Past & Present 1967, July-Dec. Vol 162, p 142-146

৬। S. C. Hill Ed. Bengal in 1756-57, A French Report of the Seige of Cossimbazar p 220-224

৭। Ibid. Vol III, Law's Memoirs, p 162-190

৮। Jadunath Sarkar Ed, History of Bengal, Vol II (Dacca) Chapter XXV

৯। সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, সিরাজদ্দৌল্লা সাহিত্যে ইতিহাসে। ৪ খণ্ড, ১ সংখ্যা, বৈশাখ শ্রাবণ ১৩৭৬।

১০। J. H. Little, House of Jagat Seth Ed. N. K. Sinha

১১। Further Report from the Committee of Secrecy appointed to enquire into East India Company (1773) p 16-17

১২। IOR, Cossimbazar Consultations of 10 December 1755 p 37

১৩। Ibid. of 30 March, 10, 14, 21, 24, & 26 April, 12 & 20 May 1755 p 48-73

১৪। Ibid. of 24 & 30 August 1757, p 1-3

১৫। Proceedings of the Board of Trade (Series II Vol III) of 7 Jan. 31 Jan, 13 Feb, & 24 Feb 1774

ছয়

১। J. N. Sarkar Ed, History of Bengal Vol II p 498

২। National Archives, New Delhi, Persian Correspondence, letter to Clive of 18 May 1765

৩। S. C. Hill Ed, Bengal in 1756-57 'Law's Memoirs.'

৪। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ১৮৮ পাতা।

৫। Keith Feiling, Warren Hastings, p 27

৬। V. B. Kulkarni, British Statesman in India, pp 28-29

৭। Cossimbazar Consultions of 23 Dec 1757, 3 & 6 March & 20 May 1758. p 8-10 & 103

৮। British Museum, Hastings Papers, ADD MSS 29096, ff 160-162

৯। Vansittart, A Narrative of Transactions in Bengal 1760-64, Vol I, p 216-219

১০। Ibid. p 243-247

১১। (ক) Ibid Vol, II p 43—160.

(খ) রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ ২০১-২০৪ পাতা

১২। IOR. Bengal Journal, and Ledgers, Ledger of 1775-76

১৩। Philp Woodruff, Men Who Ruled India, Vol I, p 112

১৪। Ibid. Chap II

১৫। N. K. Sinha, Economic History of Bengal, Vol I, p 18.

১৬। Ibid p 19-20

১৭। Ibid

১৮। Ibid, p 20-55, 178-182 & chs II, & VIII

১৯। Ibid. ch. IV

২০। Proceedings of the Bord of Trade 2 Sept 1788.

২১। Ole Feldback, Indian Trade under Danish flag 1772-1808, p 25-26.

২১। N. K. Sinha, Economic History of Bengal, Vol I, Appendix A.

২৩। Anne Basil, Armenian Settlement in India (1969).

২৪। K. K. Dutt, K. N. College Centenary Volume 1853-1953, p 215

O' Malley, Mursidabd Gazeteer.

২৫। N. K. Sinha, Op Cit, Vol I, p 100-102.

২৬। Ibid.

সাত

১। N. K. Sinha, Economoic History of India' Vol 1, p 100-101.

২। Proceendigs of the Committee of Circuit at Krisnagar and Kasimbazar of 4 September 1772, p 201.

৩। Ibid. of 25 August 1772, p 170-171.

৪। Proceedings of the Committee of Commerce of 8 February 1772, p 385-386.

৫। Ibid. of 18 March 1772, p 449.

৬। Ibid. of 5 March 1772, p 410-415.

৭। Bengal Journals & Ledgers, Account of August 1781 in the Journal.

৮। Proceedings of the Committee of Circuit at Krisnanagar & Kasimbazar of 25th August 1772, p 170-171.

৯। Proceeding of the Controlling Committee of Commerce of 25th September 1772, p 532-535.

১০। Ibid, of 20th October 1773, p 801-802 ; & 20th November 1773, p 833-836.

১১। Ibid, of 20th October & 20th November 1773. pp 797-798, 833-836.

১২। Committee of Circuit at Krisnagar and Kasimbazar, Vol I, II III of 25th August 1772 p 172, compared with the list in letter to Court of llth April 1785.

১৩। Proceedings of the Board of Trade of 29th November 1774, p 23.

১৪। Proceedings of the Board of Trade (Commercial) of 3rd and 28th March 1775, pp 416, 551-555.

১৫। Ibid. of 14th April 1775, p 660.

১৬। Appendices to the Proceedings of the Board of Trade of 10th March 1775, pp 6-9.

১৭। Ibid. of 18th April 1775, pp 83-84.

১৮। Proceedings of the Bord of Trade (Commercial) of 25th July 1775, pp 1208-1215.

১৯। Ibid. of 6th February 1776, pp 2425-2431

২০। Ibid. of 26th March 1776, p 2699.

২১। Ibid. of 22nd March 1777, p 547. and Appendices of 12th Sept, 28th Oct. & 22ndDecember 1777, pp 223-233.

২২। N. K. Sinha, The Economic Histry of Bengal, Vol I pp. 99-102.

২৩। Appendices to the Proceedings of the Board of Trade of 23rd February 1779, p 91,

২৪। Ibid, of 31st March 1780, p 99,

২৫। IOR, Bengal Miscl, Revenue Proceedings, Appendix Customs, Range 98 Vols 18 to 20, of 30th Decemer, 1775 to 20th August 1777.

২৬। এ বিষয়ে যাহারা জানিতে চাহেন তাহারা মৎপ্রণীত-The Life and Times of Cantoo Babooo (Krisna Kanta Nandy) পুস্তকখানি পাঠ করিবেন।

২৭। British Museum, Hastings Papers, Add Mss, 29172, ff 293-294,

২৮। Appendices to the Board of Trade (Commercial·) of 2nd October 1787,

২৯। Proceedings of the Board of Trade of 24th December 1789, p 395,

৩০। Ibid, of 13th March 1789.

আট

১। N, K, Sinha, op Cit pp 100-116.

২। Ibid, pp 166-185,

৩। IOR, Bengal Journal & Ledgers, Journal of 1745, p 46,

৪। IOR, MSS Letter Books No VIII, p 275,

৫। Appendices to the Proceedings of the Board of Trade of 8 May 1776, p 153,

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা : প্রথম ভাগ, পাতা ১৫৯।

৭। N, K, Sinha, Ed History of Bengal 1757-1905, p 203.

৮। General Letters Vol II : 1765-1853, 8 April 1808.

৯। Ibid, 1 June 1808.

১০। Ibid, 3 June 1814.

১১। N, K, Sinha, Ed, op Cit p 119.

১২। Appendices to the Proceedings of the Board of Trade of 26th March 1776, p 88

১৩। নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পাতা ২৫৯

১৪। S, Bhattacharjee, E, I, Company & the Economy of Bengal, p 201,

১৫। Robert Orme, A History of Military Transactions of the British Nation in Indostan (1803),

১৬। নিখিলনাথ রায় একই পুস্তক, পাতা ২৫৮-২৫৯

১৭। Procedings of the Provincial Council of Revenue at Murshidabad of 20 July 1778, p 494,

১৮। William Hickey, Memories Vol IV (1790-1809) 2nd Ed, p 217,

১৯। Jadunath Sarkar, Old Murshidabad, Krishnath College Centenary Vol 1853-1953, p 131-135,

২০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

২১। J, H, Little, House of Jagat Seth,

নয়

১। Somendra Chandra Nandy, Life & Times of Cantoo Baboo, Vol II, Chapter VII,

২। Ibid,

৩। মাহুল্লা মণ্ডল, কান্তনামা, ১২৫০ সাল সম্পাদনা, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ঢাকা সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী ৮নং (১৯২৭)।

৪। Letter Copybook of the Resident at the Durber, Mursidabad, No 23, p 145,

৫। General Letters, Vol III : 1793-1858 (1840),

৬। Calcutta Review Vol 57, 1873

রাজকৃষ্ণ রায়, কাশিমবাজার রাজবংশের বিবরণ (১২৮২),

৭। David J Mccutchion, Late Mediaeval Temples of Bengal (1972), p 57

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭ পাতা।

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৩ পাতা।

১০। The Statesman, 7 October 1976, Echoes in Time, III.

১১। Jadunath Sarkar, Oid Murshidabad, Krishnath College Centenary Volume : 1853-1953 pp 131-135

১২। নিখিল নাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী (১৩২৪) ১১ পাতা and Calcutta Review April 1892 & Holwell, India Tracts p 269

১৩। Calcutta Review Vol 57, 1873

১৪। শ্যামধন মুখোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১৮৬৪)।

১৫। নিখিল নাথ রায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ২৫৯ পাতা।

১৬। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৬৯ পাতা।

১৭। The Indian Decisions, Vol II Supreme Court Reports, Bengal, T. A. Venkasawmy Row, Sreemutty Ranee Surnomoyee Dossie VS East India Company, p 126-150

১৮। নিখিল নাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ১২ পাতা।

১৯। রাজকৃষ্ণ রায়, কাশিমবাজার রাজবংশের বিবরণ (১২৮২) ৫ পাতা।

২০। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের কথা (১৩৩৯)

দশ

১। C. R. Wilson, Old Fort William, Vol I (1906), p 104, 6 Dec 1718

২। Somendra Chandra Nandy Ed, Narrative of Krishna Kanta Nandy on Bijaygarh, Bengal Past and Present, (a) July-Dec 1970, p 293-304 and (b) July-Dec 1971 pp 217-223

৩। British Museum, Hastings Papers, Add Mss 29205, ff 113-121

৪। Calendar of Persian Records Vol vi, p 109, c 1.13 pp 39-40 No. 52

৫। Somendra Chandra Nandy, Life and Times of Cantoo Baboo, Vol II Chapter iv, The Narrative of Bijaygarh.

পরিশিষ্ট—১

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্ত্রীলোক

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্ত্রীলোকের বিশেষ সম্মান ছিল না। হিন্দু-মুসলমান কোন সমাজেই এঁদের স্থান খুব উঁচুতে রাখা হয় নাই। গৃহে তাঁদের প্রয়োজন স্বীকার করা হলেও গৃহনৈপুণ্যই তাঁদের মূল্য দিত। বহির্জগতে স্ত্রীলোক ছিলেন পণ্য সামগ্রীর মতো। সুন্দরী স্ত্রীলোক উপহার দেওয়া ছিল সেকালের অন্যতম রীতি। বাংলার বিলাসী সুবাদারদের বিরাট হারেমের খবর যেমন জানা যায় তেমনি বাজীরাওকে মস্তানী নামে নৃত্য গীত যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিনী এক অপরূপ সুন্দরী উপহারের খবরও ইতিহাস হয়ে গেছে। মঁসিয়ে লা লিখেছেন যে, গুপ্তচরবৃত্তির জন্য সকলেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাকে স্ত্রীলোক উপঢৌকন দিতেন। নবাব মীরকাশিম সুবাদার হয়ে নবাব মীরজাফরের হারেমের স্ত্রীলোকদের ধনরত্ন অর্থ ও সম্পত্তি অপহরণ করে তাঁদের পথে বিতারণ করলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ অতি শীঘ্র বিভিন্ন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির আশ্রয়ে উঠে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে বিষোদগারী যন্ত্রে রূপান্তরিত হলেন। স্ত্রীলোক অপহরণ করে উপভোগ করা অথবা চড়া দামে অন্যত্র বিক্রয় করার ব্যবস্থা তখন থেকেই চলে আসছে। যে সব ঘটনা এখন আর দেখা যায় না তার মধ্যে প্রধান হল সখী-সংবাদ। তখনকার এক প্রচলিত প্রথা ছিল বর বধূকে বিবাহ করে নিয়ে যাবার সময় স্ত্রীর সখীদেরও সঙ্গে করে নিয়ে নিজ গৃহে চলে যেতেন। এই সখীদের অনেকেই ক্রমে উপপত্নীতে রূপান্তরিত হতেন, কখন কেউ কেউ অবশ্য তৃতীয়, চতুর্থ বা অষ্টম স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছেন।

গৃহে মানী ব্যক্তির মাতারা খুবই সম্মানিত হতেন। মাতাদের মধ্যে তাই নিজ পুত্রকে ক্ষমতায় বসাবার চেষ্টা দেখা যেত। এই কার্য করার জন্য তাঁরা অনেক সময়েই খুব হীন ব্যক্তি ও হীন পন্থার উপর নির্ভর করতেন। যার ফলে পুত্র ক্ষমতায় এলেও মাতাকে সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। বাজীরাও মাতা রাধাবাঈ অত্যন্ত সম্মানিতা ছিলেন, পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিত সিংহের মাতৃহত্যার জনশ্রুতি সত্য হবার সম্ভাবনা, সুবিখ্যাত

অহল্যবাঈ হোলকারকে দীর্ঘদিন একমাত্র পুত্রকে হত্যার কলঙ্ক বহন করতে হয়েছিল।

সুন্দরী রমণীর মূল্য কম ছিল না। সিরাজ-উদ-দৌল্লা ফৈজীকে দিল্লী থেকে এক লক্ষ তঙ্কায় কিনে এনেছিলেন। মোহনলাল কি মূল্যে তাঁর ভগিনী বিক্রয় করেছিলেন না জানলেও মূল্যের হিসাব পাওয়া তৎকালীন ইতিহাস পাঠে কঠিন বলে মনে হয় না। মূল্য ছিল কিন্তু সম্মান ছিল না। তাই বাদশাহের স্ত্রীলোকদের সাধারণ সৈন্যের হাতে উপদ্রুতা হতে দেখে অবাক হতে হয়। এখানে জাতিভেদ ছিল না। বৃদ্ধ বাদশাহ মহম্মদ শাহ বা তরুণ সুবাদার নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লা বা তাঁর মাসতুতো-খুড়তুতো ভাই শওকৎ জঙ্গ বা বীর যোদ্ধা মলহর রাও হোলকারের পুত্র ও বংশধর খাণ্ডেরাও হোলকার বা রাজপুত-কুলতিলক জয়পুরের মহারাজা ঈশ্বরী সিংহের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। সকলেই সমান মদ্যপ, উশৃঙ্খল ও ব্যভিচারী। ক্ষমতাশীল ভদ্রসন্তানগণ যেখানে জঘন্যতম কামচারিতার্থতাকে জীবনের ব্রত করেছেন সেখানে সাধারণ সৈন্যের কাছে ভদ্রতা আশা করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বর্গী বা বাগিরদের কথা বলা হয়েছে, মুসলমান সৈন্যগণ, কি আফগান রোহেলা পাঠান বা মোগল কোন বিষয়েই তাদের থেকে হীন ছিল না। জাঠরা যখন দিল্লী অধিকার করল তখন স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের নূতন নরক সৃষ্টি হল। এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বহু মহিলা কূয়োতে ঝাঁপ দিয়ে বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করেন। এমন কি নাগা সন্ন্যাসীদের নেতা নরেন্দ্র গিরি ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জাঠদের সঙ্গে যখন দিল্লী লুণ্ঠন করলেন তখন সন্ন্যাসী সৈন্যগণের সঙ্গে সাধারণ সৈন্যের প্রভেদ দিল্লীর স্ত্রীলোকগণ বুঝতে পারেন নাই। এলাহাবাদ সুবার অধিকর্তা সুজা-উদ-দৌল্লার শ্যালকের গৃহ লুণ্ঠিত হবার সময় স্ত্রীলোকগণ যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছেন।

মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে স্বয়ং বাদশাহ যখন তাঁর হারেমের স্ত্রীলোক-দের ফেলে পলায়ন করলেন, বিজয়ী মারাঠা সৈন্যদের হাতে তাঁদের লাঞ্ছনার অবশেষ থাকে নাই। উজিরের পরাজয়ের পর বিজয়ী নাজিব খান স্বয়ং রোহেলা সৈন্যদের নিয়ে উজিরের একাধিক স্ত্রী, অনূঢ়া কন্যা ও বৃদ্ধা মাতাকে ধর্ষণ করেন। বয়সের বা ব্যক্তিত্বের কোন সম্মান করা হয় নাই। সম্মান করা হয় নাই উচ্চ মর্যাদার বা পদের যার ফলে বাদশাহী সৈন্য বিদ্রোহ করলে

১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহের প্রধানা বেগমকে ভিস্তির ছদ্মবেশে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে হীন ভিস্তিপল্লীতে লুকিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। সারহিন্দ দখল করে আফগানরা যাদের ওপর অত্যাচার করল, মারাঠা ও শিখরা আফগানদের বিতারণ করবার সময় আবার তাদের উপদ্রুত করল। পক্ষপাতীত্বের দোষে অবশ্য এরা কেউ অপরাধী নয়। বিভিন্ন সময়ে আফগান ও মারাঠারা একই উজিরের স্ত্রীলোকদের উপভোগ করে তাদের নিরাবরণ করে রেখে চলে গেলেন যাতে তাঁরা অন্য পক্ষ দ্বারা নির্বিচারে ভোগ্য হন। (উপরের ঘটনাবলী আচার্য যদুনাথ সরকারের মোগল সাম্রাজ্যে পতন অবলম্বনে লিখিত।)

স্ত্রীলোকদের সম্মানের আসন দেবার শিক্ষা বহুকষ্টে আমাদের আয়ত্তে এসেছে। বর্তমান কালের ইতিহাস দেখলে এ সত্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

পরিশিষ্ট—২

বাংলায় মোগল শাসন ব্যবস্থা

বাদশাহ আকবরের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সমগ্র রাজ্য বিভিন্ন সুবায় বিভক্ত ছিল। প্রতি সুবায় একজন সুবাদার নিযুক্ত হতেন। বাংলা সুবার অন্তর্গত ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও শীলহাট। এই সুবাদারের ওপর নিয়মিত রাজস্ব বাদশাহকে দেবার দায়িত্ব ছিল। সাধারণ নিয়ম ছিল যে, বাইশটি সরকার বা রাজস্ব বিভাগ নিয়ে এক একটি সুবা হবে। প্রতি সুবা চাকলায় বিভক্ত হবে। প্রতি সরকার পরগণায় বিভক্ত ছিল. প্রতি পরগণা ভাগ করা ছিল টাপ্পা বা তালুকে, তালুক বিভক্ত হত গ্রামে। আবার অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে হতে পারত একটি মহাল। কয়েকটি মহাল ও অনেকগুলি গ্রাম (বাইশটা হবার কথা) নিয়ে হত তালুক। এইভাবে সিঁড়ি উঠতে উঠতে একেবারে সুবায় পৌছান যেত। সুবার শাসনকর্তা ছিলেন সুবাদার, সরকারের শাসন ছিল ফৌজদারের হাতে। পরগণার অধিকারীকে বলা হত চৌধুরী আর তালুকের ভার থাকত তালুকদারের হাতে। রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ফৌজদার থেকেই অন্য রকম ছিল। ওয়া-হেদদারের কাছে সময়ে খাজনা না পৌছলেই তিনি সুবাদারকে সংবাদ দিতেন। সুবাদার ফৌজদারকে দিয়ে অপরাধী ধরে এনে 'বৈকুণ্ঠ' বা অন্য কোন শাস্তিমূলক আটক ব্যবস্থায় তাকে সাজা দিতেন। সুবাদার বা ফৌজদার ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তাঁদের কাজের জন্য বাদশাহের কাছে জবাবদিহি করতে হত। অন্যেরা ছিলেন জনসাধারণ, সুবাদার তথা বাদশাহ তাঁদের নির্বাচন করতেন। ঠিকমত কাজ করলে অর্থাৎ রাজস্ব নিয়মিত দিলে, সেই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ঠিকমত করলে এবং সুবাদারের প্রয়োজন ও আদেশ মতো যুদ্ধের সময় ঠিকমত সৈন্য সংগ্রহ করে দিলে জামিন্দার বা ওয়াহেদদার বা চৌধুরীকে কায়েমী করা হত অন্যথায় তাঁকে সরিয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে সেই পদ দেওয়া হত। বলা বাহুল্য কেবল শাসন ও রাজস্বের সুবন্দোবস্তে এই পদগুলিতে কায়েমী হওয়া সহজ ছিল না। পদাধিকারের আগে যেমন মোগল কর্মচারীকে খুসী করতে হত, পদ

পাবার পরও তাঁদের ক্রমান্বয়ে খুসী রাখতে হত। মোগল বাদশাহদের পতনের ধাপে ধাপে এই উৎকোচ গ্রহণ কদর্যরূপে বৃদ্ধি পেয়ে এক মহামারীর মতো দেশের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে। কাজী থেকে সুরু করে নিম্নতম সরকারী তকমাধারী বাদশাহী কর্মচারী অনাচারের বন্যা ডাকিয়েছিলেন বলেই ইংরেজ কোম্পানী এদেশে সহজে রাজত্ব স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে।

বাংলা সুবা তেরটি চাকলায় বিভক্ত ছিল, বালাসোর বন্দর, হিজলী, মুর্শিদাবাদ (এর মধ্যে বীরভূম ও বিষ্ণুপুর অন্তর্গত ছিল), বর্দ্ধমান (এর মধ্যেও বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের অংশবিশেষ অন্তর্গত ছিল), হুগলী বা সাতগাঁও, ভূষণা, যশোর, আকবরনগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, কুড়িবাড়ী, জাহাঙ্গীর-নগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট (আসাম) ও ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)। প্রতি চাকলার শাসনভার ন্যস্ত ছিল ফৌজদারের ওপর। কর ধার্যকরণ এবং আদায় তাঁর অন্যতম ক্ষমতা ছিল। এই কর ছিল সরকারী কর ও জামিন্দারী জমার ওপরে ফৌজদারী আবোয়াব।

জমিদারদের পক্ষে রাজস্ব আদায়কারীর নাম ছিল এতমমদার বা এতমৎ-দার। তাঁরা সরকারী কর্মচারী না হলেও যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এঁরা কৃষক বা রায়তদের কাছ থেকে সরাসরি খাজনা আদায় করতেন। জমিদাররা অনেক সময় মহাল বা তালুক বাৎসরিক অর্থের বিনিময়ে ইজারা দিতেন। যাঁরা এই সম্পত্তিগুলি নিতেন তাঁদের ইজারাদার বলা হত। ইজারাদারদের নিজস্ব কর্মচারী, পিওন ও উকিল রাখতে হত। তাঁরাও রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। তবে এক মহালে জমিদার ও ইজারাদারের আদায় করার কোন প্রয়োজন ছিল না। বরঞ্চ তা করলে লাঠালাঠি হতে পারত। জমিদারদের বৃহৎ বন্দোবস্ত রাখতে হত। তাঁর কর্মচারীদের বলা হত দেওয়ান, রায়রায়ান, কারকুন, কেরাণী, উকিল, জমাদার, সিপাহী, পাইক, বরকন্দাজ, চোপদার, হরকরা, সোঁটাবরদার ইত্যাদি। নিজ জমিদারীতে পুলবন্দী বা সাঁকো মেরামত এবং খালবন্দী বা খাল মেরামত যেমন তাঁদের দায়িত্ব ছিল তেমনি তাঁদের নিজ নিজ এলাকা দিয়ে প্রবাহিত নদীনালাকে বালি ও কর্দমমুক্ত রাখাও তাঁদের দায়িত্ব ছিল।

মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনে বাংলার সমৃদ্ধি রূপকথার গল্পের মতো। তাঁর মৃত্যু থেকে পলাশীর যুদ্ধ মাত্র ত্রিশ বৎসর কালের ঘটনা। তারপর আবার

ইংরেজ কোম্পানীর শাসনে বাংলার ব্যবসায়ী দিগন্ত পৃথিবীর দিকে দিকে প্রসারিত, চীন থেকে আমেরিকা পর্যন্ত বাংলার দ্রব্য সম্ভারের গতি অনিয়ন্ত্রিত। তারপর শাসন ব্যবস্থার অপকর্ষে বাংলার হাহাকার। সুজলা সুফলা নন্দন কানন, শৃগাল ও শকুনীর বিচরণ ভূমিতে পরিণত। মোগল শাসনের অন্তিমকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার এই হল একমাটি চিত্র।

APPENDIX - 3

Chief Factors of Cossimbazar and Residents at Murshidabad.

Year :	Factor :	Assistant :
1640	The factory was probably established	
1654	Stephens (died in Cossimbazar)	
1658	John Kean	Job Charnok
1680	Job Charnok	Robert Hedges
1683	Robert Hedges (officiating)	
1686	Job Charnok's flight by night	
1701	Nathaniel Halsey	
1707	William Bugden	Chambers
1711	Robert Hedges	
1715	Samuel Feak	John Dean
1716	William Ange	
1720	John Dean	
1723	Henry Frankland	
1727	Edward Stephenson	
1730	John Stackhouse	
1733	Hugh Barker	
1736	Thomas Braddyll	John Halsey
1740	Richard Eyre	Charles Adams
1741	Francis Russell	-do-
1743	John Forester	
1744	John Halsey	
1744	John Forester	
1746	Wadham Brooke	
1749	Edward Eyles	

1751	Willam Fytche	
1752	William Watts	Mathew Collet
1757	Warren Hastings (officiating)	Francis Sykes
1759	Warren Hastings	-do-

After Plassey

	Chief	Resident
1757	Warren Hastings	Scrafton
1759	Warren Hastings	Warren Hastings
1763	Stanley Batson	-do-
1765	A. W. Senior	Francis Sykes
1765 (22 July)	Francis Sykes	-do-
1769	William Aldersey	Richard Barwell
1770	Robert Palk (officiating)	Richard Becher
1771	Samuel Middleton	Samuel Middleton
1774 (31 Oct.)	J, Rider (officiating)	-do-
1774 (9 Dec.)	William Aldersey	Charles Goring
1776 (1 Mar.)	Thomas Lane	
,,	William Bym Martin	
1779	Robert Palk	
1783	Simeon Droz	
1787	J. I. Keighly	John D'Oyley (1785)
1787	The chiefship was abolishedwith Keighly. The office is now called Resident.	
1787	Thomas Harris.	
1788	Thomas Brown (officiating)	
1789	C. R. Crommelin (died in office)	
1789	Thomas Brown	

(The list is not complete)